বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
৮৭/৪

সখা

প্রমদাচরণ সেন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

চতুর্থ ভাগ।

১৮৮৬।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী, এম, এ, কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

"THE CHILD IS FATHER OF THE MAN."

কলিকাতা
২ নং বেনেটোলা লেন, "সখা" কার্য্যালয় হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা ২ নং বেনেটোলা লেন, "সখা"-যন্ত্রে,
শ্রীললিতমোহন দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সূচী-পত্র।

বিষয়	লেখক বা লেখিকার নাম	পত্রাঙ্ক।
৺অক্ষয়কুমার দত্ত। ...	সীতানাথ নন্দী বি, এ, ...	৯৪
অতলস্পর্শ ...	ভুবনমোহন রায় ...	১৩৯
অবাধ্যতার প্রতিফল ...	কুমারী স্নেহলতা দেবী ...	৫৬
আখ্যানমালা ...	অন্নদাচরণ সেন ...	২১
আবদারে ছেলে (সচিত্র পদ্য) ...	সম্পাদক ...	১০
আশ্চর্য্য কর্ত্তব্যপরায়ণতা ...	ললিতমোহন দাস ...	৪৭
উকিলের পরামর্শ ...	আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ...	৫৪
উভয় সঙ্কট (সচিত্র পদ্য) ...	বিহারীলাল গুহ ...	১৮৬
কর্ত্তব্য পরায়ণ পুত্র ...	কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু ...	১৬১
কলের জাহাজ (সচিত্র) ...	আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ...	৮১, ১০০
কুকুরের চাতুরী ...	সম্পাদক ...	১৫
কেমন ছবি এঁকেছি (সচিত্র) ...	ভুবনমোহন রায় ...	২৯
গরিলা (সচিত্র) ...	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, বি, এ, ...	৭৪, ৮৩
গ্লটন্ (সচিত্র) ...	উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী বি, এ, ...	১৮৮
গুরুদরবার (সচিত্র) ...	সম্পাদক ...	৪৪
চতুর্থ বর্ষ ...	ঐ ...	১
চন্দ্রমুখীর সাজা ...	ঐ ...	২৫
চীনের গল্প (সচিত্র) ...	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ, ...	১০
চোর বিড়াল (পদ্য) ...	শ্রীমতী মাঃ ...	২৮
জানোয়ারের বুদ্ধি ...	সম্পাদক ...	১৭৬, ১৭৭
জোয়ার ভাঁটা (সচিত্র) ...	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, ...	৩৮, ৫৯
জোসেফ ম্যাট্‌সিনি (সচিত্র) ...	সম্পাদক ...	৩১, ৪৯
ঢাকাই মস্‌লিন (সচিত্র) ...	দেবেন্দ্রনাথ ধর ...	১২৪, ১৩৪, ১৪৮
দাপশিখা ...	উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী বি, এ, ...	১৮২
দুটী বোন (সচিত্র) ...	নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	৫১
ধাঁধা ...		১৬, ৩২, ৪৮, ৮০, ৯৫, ১১২ ১৪৪, ১৭৬
ধ্রুবোপাখ্যান ...	শ্রীমতী কিরণশশী চট্টোপাধ্যায় ...	১৫২
নাক ও চোকের বিবাদ (পদ্য) ...	বিপিনবিহারী সেন ...	১৪
নানা প্রসঙ্গ (সচিত্র) ...	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ,	৭১, ৮৬, ১০৩, ১৭১

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
১৪৬
৪

সূচীপত্র।

নারার বীরত্ব	...	ললিতমোহন দাস	... ৬৯
পরেশ ও তাহার পিতা	...	আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এ,	... ১৭৮
পরলোকগত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	...	সম্পাদক	... ১৪৫
পূর্ণিমা ও অমাবস্যা (সচিত্র)	...	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ,	... ১৭
প্রকাশের পরিবর্ত্তন	...	শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী	... ১৮৪
✓প্রকৃত ঘটনা	...	জনৈক বঙ্গ মহিলা	... ১১৮
প্রবাল কীট (সচিত্র)	...	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ,	... ৬৫
প্রবাল দ্বীপ (সচিত্র)	...	ঐ	... ৯৭
পৃথিবীর গোলত্ব (সচিত্র)	...	ঐ	... ১১৩
ফুলের সাজি	...	ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়	৭৮, ৯১ ১১০, ১২০, ১৫০, ১৭৩
বনলতা	...	ভুবনমোহন রায়	... ১৯০
বর্ষশেষ	...	ঐ	... ১৯২
বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর	...	সম্পাদক	... ৬
বেলুন (সচিত্র)	...	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ,	... ২৩, ৪১, ৭৩
✓ভাই বোন্ (পদ্য)	...	শ্রীমতী মাঃ	... ১৩৩
ভিখারিণী মেয়ে (পদ্য)		ঐ	... ৮৫
ভোঁদড় (সচিত্র)	...	উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী বি, এ,	... ৬২
ভোলানাথের বাঁধা (সচিত্র পদ্য)	...	চিরঞ্জীব শর্ম্মা	... ১১৯
মন পরীক্ষা	...	অন্নদাচরণ সেন	... ৩২
মশা (সচিত্র)	...	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ,	... ১৫৯
মহাত্মা নেল্‌সনের গল্প	...	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ,	... ১৬৩
মাতার প্রশ্ন	...	বিপিনবিহারী সেন	... ৭৭
মুদ্রাযন্ত্র (সচিত্র)	...	উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ,	... ১৬৬
রামকান্তের ঘোড়া (সচিত্র)	...	সম্পাদক	... ৬৮
রেড়ির গাছ (সচিত্র)	...	দেবেন্দ্রনাথ ধর	... ২
লণ্ডন মেলা (সচিত্র)	...	ঐ	... ১০৭
শাক্যমুনির ক্ষমা	...	চিরঞ্জীব শর্ম্মা	... ৩১
শিশুর আমোদ (সচিত্র পদ্য)	...	নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	... ১০৫
শ্যামচাঁদের পাচদশা (সচিত্র)	...	সম্পাদক	... ১৪২
সতীশ সকলের অপ্রিয় কেন ?	...	শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী	... ১৫৫
সার উইলিয়ম জোন্স (সচিত্র)	...	সম্পাদক	... ৮৮
সাধের খেলা (সচিত্র পদ্য)	...	ভুবনমোহন রায়	... ১৩৮
স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ	...	সম্পাদক	... ১২৯
স্নেহলতার দয়া	...	ভুবনমোহন রায়	... ১৬৮

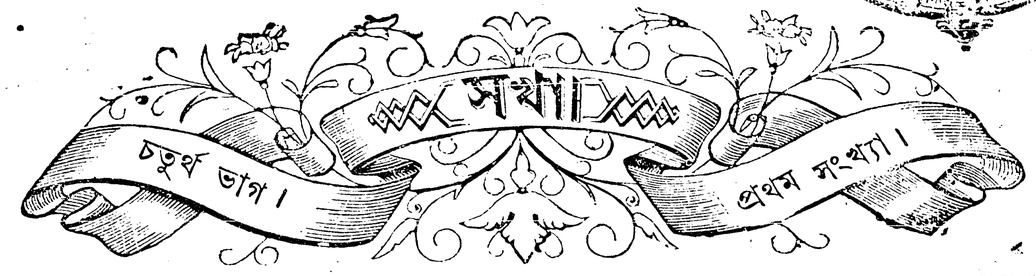

জানুয়ারি, ১৮৮৬।

চতুর্থ বর্ষ।

আমাদের "সখা" ঈশ্বর কৃপায় তিন বছর পার হইয়া চারি বছরে পা দিল। কিন্তু এই বছরে "সখা" ইহার পরম বন্ধু, ইহার পিতা মাতাকে হারাইয়াছে। আমাদের দেশে পিতৃ মাতৃহীন শিশুকে সকলে ভাল বাসে, সকলেই বলে 'আহা! মাথেকো ছেলে, ওকে কেউ কিছু বলিস্ নে।' এই বলিয়া পাড়ার সকল মেয়েরা তাকে আপনার ঘরে ডাকিয়া লইয়া যান; যাঁর ঘরে যা কিছু মিষ্ট সামগ্রী থাকে একটু হাতে দেন, হয়ত কোলে করিয়া তার মুখে একটী চুম্বন করেন। জগদীশ্বরের কি দয়া, সংসারে যে শিশু মা হারা হয়, সে একটী মা হারাইয়া কত মা পায়! পাড়ার সকল মেয়ে তার মায়ের অভাব পূর্ণ করেন। পাড়ার ছেলেরাও তাকে কত যত্ন করে। খেলিতে খেলিতে কেহ তাহাকে মারিলে দশটী ছেলে তাকে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া আসে। সকলেই বলে "আহা ওকে মারিস্ নে, ওর মা নেই।" আজ আমরা জগদীশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ অন্তরে বলিতেছি যে আমাদের "সখা" পিতা মাতা হারাইয়া সকলের কাছে অধিক আদর পাইতেছে। আমরা প্রথমে ভাবিয়াছিলাম যে, যে প্রমদাচরণ "সখা"র জন্য দেহ মন প্রাণ সঁপেছিল, যে প্রমদাচরণ না খাইয়া ইহাকে খাওয়াইয়াছে, না পরিয়া ইহাকে পরাইয়াছে, ইহার জন্য শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া ভাবিয়াছে, আহার নাই, নিদ্রা নাই, লোকের কাছে ছুটাছুটী করিয়াছে, নিজের অল্প আয়ে আপনি ক্লেশে থাকিয়া "সখা"কে ভাল করিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছে, ইহার জন্য ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিয়াছে, সেই প্রমদাচরণ যখন গেল, তখন শিশু "সখা"কে আর কে দেখিবে? হাজার হউক পরে কখনও মায়ের মত যত্ন করিতে পারে না। কিন্তু যতই দিন যাইতেছে আমাদের সে দুর্ভাবনা দূর হইতেছে। এখন দেখিতেছি দশ জনের উপকারের জন্য যার জন্ম হয়—সে ছেলেকে ঈশ্বর বাড়াইয়া থাকেন। দিন দিন তার উন্নতিই হয়। আমাদের "সখা"ও ঈশ্বর কৃপায় বাড়িতেছে। বাঙ্গলা দেশের বালক বালিকাদিগের উন্নতি সাধন করিবার জন্য "সখা"র জন্ম হইয়াছে। "সখা" গুরুর মত বালক বালিকাদিগের কাছে যায় না, কিন্তু বন্ধুর মত যায়। ছেলে হইয়া ছেলেদের সঙ্গে মিশে। আমরা "সখা"কে বলিয়া দিয়াছি যে, ছেলেরা যখন খেলা করিবে তখন "সখা" সেখানে যাইবে, যখন দশজন বালক বালিকা

একত্র বসিয়া গল্প করিবে, তখন সেখানে "সখা" যাইবে, ও বন্ধুভাবে কাছে বসিয়া ভাল কথা শুনাইবে। যাহাতে সকলের সুপথে মতি হয় এমন কথা শুনাইবে। "সখা" বালক বালিকাদের পরম উপকারী বন্ধু, এই জন্যই সকলে "সখা"কে এত ভাল বাসেন। পাড়ার দশটী ছেলের মধ্যে একটী ছেলে যদি সৎ হয়, যার সঙ্গে মিশিলে উপকার আছে, তবে বাড়ীর কর্ত্তারা বাড়ীর ছেলেদিগকে সেই ছেলের সঙ্গে মিশিতে দেন; এবং তাকে আদর করিয়া বাড়ীতে ডাকিয়া আনেন ও বলেন তুমি আমাদের বাড়ীতে সর্ব্বদা আসিবে ও আমাদের ছেলেদের সঙ্গে মিশিবে। দেশের ভদ্রলোকেরা সেইরূপ আমাদের "সখা"কে আদর করিয়া ডাকিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং বলেছেন "ও 'সখা' তুমি আমাদের বাড়ীতে এস, ও 'সখা' তুমি আমাদের বাড়ীতে এস।" ছেলেদের ত কথাই নাই। তারা যেন "সখা"র পথ চাহিয়া থাকে, কখন "সখা" আসিবে। যেই "সখা" বাড়ীতে প্রবেশ করে, অমনি বাড়ী শুদ্ধ ছেলে "সখা"কে লইয়া কাড়াকাড়ি করে। এ বলে "সখা আমার" ও বলে "সখা আমার"। আমরা এই সকল বালক বালিকাকে বলিতেছি "সখা" তোমাদের সকলেরই। যদিও "সখা" আমাদের ঘরে জন্মিয়াছে, তবু এ "সখা" তোমাদেরই। "সখা" তোমাদের ভাই; তোমাদের উপকারের জন্যই "সখা"র জন্ম হইয়াছে। ঈশ্বর করুন যেন ইহার দ্বারা তোমাদের উপকার হয়।

আজ "সখা"র জন্ম দিন। ছেলেদের জন্ম দিনে বাড়ীতে সকলেই আনন্দ করে। কিন্তু আজ আমরা "সখা"কে বাহিরে যাইবার জন্য কাপড় পরাইতেছি, আর প্রমদাচরনের জন্য চক্ষের জল ফেলিতেছি। "সখা"র একটু আদর দেখিলে যে প্রমদাচরন স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইত, সেই প্রমদাচরণ আজ নাই। এখন যদি আমরা "সখা"কে ভাল করিয়া মানুষ করিতে পারি তবেই সে শোক নিবারণ হয়। অতএব পাঠক পাঠিকা তোমরা নূতন বছরে "সখা"কে সকলে আশীর্ব্বাদ কর, যেন "সখা" প্রমদাচরণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে।

অবশেষে যাঁহারা কৃপা করিয়া "সখা"তে লিখিয়াছেন, যাঁহারা ইহার উন্নতি বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, যাঁহারা ইহার হইয়া অপরকে দুটো কথা বলিয়াছেন, যাঁহারা নিজ নিজ বাড়ীতে ইহাকে স্থান দিয়াছেন, যাঁহারা মনে মনে ইহার শুভ ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই সকলকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া এবং যিনি সকল প্রকার শুভ সংকল্পের চির সহায়, সেই পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া আমরা নববর্ষে আবার শিশুদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতেছি।

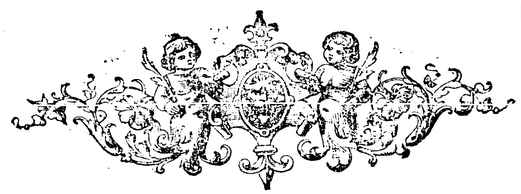

রেড়ীর গাছ।

ঠিক পাঠিকাগণ! তোমরা রেড়ীর গাছ হয় ত দেখিয়াছ। এই রেড়ীর বিচি ঘানিতে বা কলে পিষিয়া যে তৈল বাহির হয় তাহাকেই আমরা সচরাচর রেড়ী বা ভেরেণ্ডার তৈল বলিয়া থাকি। রেড়ীর বিচি দুই প্রকার, ছোট ও বড়। ছোট বিচির তৈল

উৎকৃষ্ট; ইহাই পরিষ্কার করিলে ইংরাজী চিকিৎসা শাস্ত্রে 'কাষ্টর অইল' বলা হইয়া থাকে। লোকে এই তৈল জোলাপের জন্য খায়। বড় বিচি হইতে যে নিকৃষ্ট তৈল বাহির হয় তাহাই পোড়াইবার জন্য ব্যবহার হয়। কিন্তু রেড়ীর তৈল যে আরও কত প্রকার কাজে লাগে তাহা হয়ত অনেকে জানেন না। বিলাতে অনেক দোকানদার আছেন, তাঁহারা পরিষ্কার রেড়ীর তৈলের সহিত নানা প্রকার গন্ধ দ্রব্য মিশাইয়া মাথার চুলে লাগাইবার জন্য সুগন্ধি তৈল, সাবান ও পমেটম প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। আফ্রিকা দেশের নিগ্রো জাতি এই তৈলে রন্ধন করিয়া থাকে এবং আমাদের দেশে উড়ে জাতির অনেকেও গায়ে মাখিবার বা রন্ধন করিবার জন্য রেড়ীর তৈল ব্যবহার করে। রঙ্গীন বস্ত্রের রং উজ্জ্বল করিবার জন্য, ছিট কাপড়ের রং পাকা করিবার জন্য এবং "মরক্কো লেদার" নামক প্রসিদ্ধ ও মূল্যবান চামড়া প্রস্তুত করিবার জন্যও এই তৈল বিস্তর খরচ হয়। ইহা ভিন্ন কলের গাড়ি, কাপড়ের কল, বড় বড় কলের চাকা প্রভৃতি ভাল চলিবার জন্যও এই তৈল লাগান হয়। রেড়ীর গাছের আর একটী বিশেষ গুণ এই যে, যদি কোন ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে এই গাছের বেড়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহার শস্যে কখনও কোন প্রকার পোকা ধরে না। পৃথিবীর সকল স্থান অপেক্ষা ভারতবর্ষেই রেড়ীর চাষ অধিক, এই জন্য আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, রুষিয়া, ইতালি, ফ্রান্স, সিংহল, চীন, মরীচ ও অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জে ভারতবর্ষ হইতে বৎসরে প্রায় ৩০।৩২ লক্ষ টাকার তৈল এবং ১১।১২ লক্ষ টাকার বিচি রপ্তানী হয়।

এতক্ষণ রেড়ীর বিচির তৈল সম্বন্ধেই অনেক কথা বলা হইল, কিন্তু তৈল ছাড়া আর একটী বিশেষ কাজের জন্য যে ভারতবর্ষে রেড়ীর চাষ হইয়া থাকে তাহা বলা হয় নাই। এই গাছ হইতে এক রকম মোটা ও মজবুত রেশম তৈয়ার হইয়া থাকে, উহাকে এরী এণ্ডী বা এরীণ্ডী রেশম বলে। আসাম দেশের অনেক স্থলে এবং বঙ্গদেশের কোন কোন জেলায় এইরূপ বিস্তর রেশম প্রস্তুত হয়। ইহাতে পরিবার কাপড়, গায়ের চাদর প্রভৃতি কত রকম কাপড় হয়। এরী সুতা এতদূর মজবুত যে একজন লোক একখানি এরী সূতার কাপড় আমরণ ব্যবহার করিয়াও ছিঁড়িতে পারে না। কিন্তু রেশম কেমন করিয়া জন্মে? পাঠক পাঠিকাগণ! পর পৃষ্ঠায় এই যে দুইটী সুন্দর পতঙ্গের ছবি দেখিতেছ ইহারাই এই রেশম প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই পতঙ্গ কেমন করিয়া জন্মে তাহা কি জান? ভগবানের কেমন আশ্চর্য্য নিয়ম-কৌশলে ইহাদের জন্ম হয়, এবং ইহাদের জন্মাইবার উদ্দেশ্য কি তাহা পাঠ করিলে অবাক্ হইতে হয়!

যে দুইটী পতঙ্গের ছবি দেওয়া হইল ইহাদের একটী পুরুষ ও অপরটী স্ত্রী। স্ত্রীজাতীয়ের শরীরের আয়তন পুরুষদিগের অপেক্ষা কিছু বেশী। পশু, পক্ষী কিম্বা কীট মাত্রই যেমন জন্মাইবার পর তাহাদের নির্দ্দিষ্ট খাদ্য খায় এবং শাবক প্রসবের পরেও বাঁচিয়া থাকে এই পতঙ্গ দেহের গতি সেরূপ নয়। ইহারা জন্মিবার তিন চারি দিন পরে গাছের ডাল ও পাতায় কতকগুলি রাশীকৃত * ডিম পাড়িয়াই মরিয়া যায়। যে কয় দিন বাঁচে কোন খাদ্য খায় না। ডিমগুলি গাছের ডাল পালায় ছোট ছোট মুক্তার মত ঝুলিতে থাকে। এই ডিম হইতে ক্রমে খুব ছোট কৃমির আকারে এক

* এক একটী পতঙ্গের ডিম্বের সংখ্যা ৪০০ হইতে ৫০০।

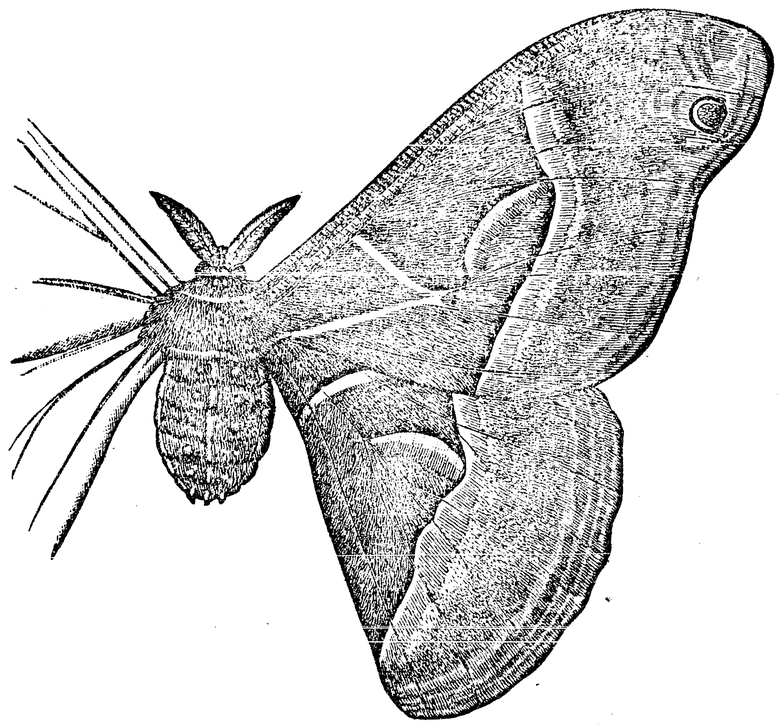

রেড়ীর পতঙ্গ—স্ত্রী জাতীয়।

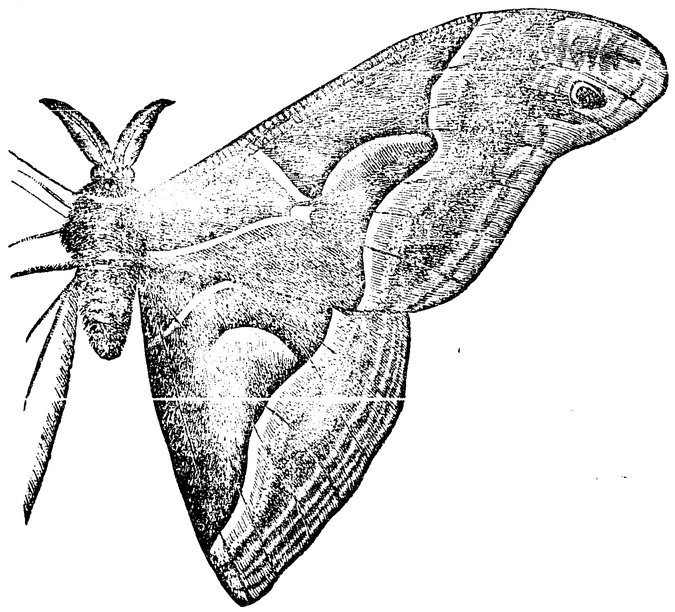

রেড়ীর পতঙ্গ—পুং জাতীয়।

রকম পোকা বাহির হয়। প্রথম অবস্থায় পোকাগুলি দেখিতে খুব ছোট বটে, কিন্তু বড় হইলে এক একটী সাড়ে তিন ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা হইয়া থাকে। ছোট পোকাগুলি ৪ বার খোলোষ ছাড়িবার পর তবে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। খোলোষ ছাড়িবার অর্থ কি জান? পোকাগুলি যেমন শীঘ্র শীঘ্র বাড়িতে থাকে তাহাদের গায়ের চামড়া তত শীঘ্র বাড়ে না, সুতরাং শরীরটা বড় আর শরীরের আবরণটা ছোট হইয়া আসিলেই আবরণটী আপনা আপনি ফাটিয়া যায়। বড় হওয়া পর্য্যন্ত পোকাগুলি কেবল পাতা খাইয়া বাঁচে। শেষ অবস্থায় অর্থাৎ চারিবার খোলোষ ছাড়িবার পর পঞ্চম বারে ইহাদের ক্ষুধা এত বাড়ে যে, তাহারা প্রথম অবস্থা হইতে চতুর্থ অবস্থা পর্য্যন্ত যতগুলি পাতা খায় এখন তাহার চারি গুণ পাতা খাইয়া ফেলে এবং এই খানেই তাহাদের খাওয়ার কার্য্য শেষ হয়। এখন ইহারা চুপ করিয়া এক জায়গায় বিশ্রাম করে। ইহাদের শরীরের উভয় পার্শ্বে ৯টী করিয়া ছিদ্র আছে। এক একটী ছিদ্রের কাছে একটী করিয়া গাঁটের মত ভাগ। ঐছিদ্র সকলের দ্বারা তাহাদের শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য সম্পন্ন হয়। যাহা হউক পোকাগুলি বিশ্রাম করিবার অল্পক্ষণ পরেই মাকড়সার মত মুখের দুই দিক হইতে এক প্রকার লালা বাহির করিতে থাকে, যাহা বাতাস লাগিলেই সূক্ষ্ম কেশের মত সূতায় পরিণত হয় এবং দুই গাছি সূতা আঠাময় হওয়াতে পরস্পর যুক্ত হইয়া যায়। এই সূতাকেই আমরা রেশম বলিয়া থাকি। এক একটী পোকার মুখ হইতে এত লালা বাহির হয় যে, সূতা প্রস্তুত করিতে করিতে ক্রমে পোকাগুলি সেই সূতার মধ্যেই চাপা পড়ে। এই অবস্থার নাম গুটী। গুটীর মধ্যেই পোকাগুলির আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় যে দুইটী সুন্দর পতঙ্গের ছবি দেখিয়াছ এই গুটীর মধ্যেই পরমেশ্বরের সৃষ্টিকৌশলে তাহাদের জন্ম হয়। একটী পোকা হইতে মনুষ্যের অগোচরে কেমন মেরুদণ্ড, পাখা ও পা যুক্ত এক পতঙ্গ জন্মায়! কিন্তু নির্দ্দয় মানুষের হাতে পড়িয়া কত লক্ষ লক্ষ পতঙ্গই না মারা যায়! গুটীর ভিতর পতঙ্গ দেহের অবয়ব পূর্ণ হইলেই উহারা মুখ হইতে আবার এক রকম লালা বাহির করে যাহা দ্বারা কঠিন গুটীর মুখের দিকটী নরম হইয়া আইসে এবং ঐ নরম দিকটী কাটিয়া তাহা হইতে পতঙ্গ বাহির হইয়া পড়ে; কিন্তু গুটী ভেদ করিয়া পতঙ্গ বাহির হইলে তাহা হইতে মানুষের পয়সা রোজকার ভাল রকম হয় না। ভেদ করা গুটী হইতে সূতা তুলিবার সময় লম্বা লম্বা সূতা না হইয়া টুকরা টুকরা সূতা বাহির হয়। এই জন্য নির্দ্দয় মানুষ পয়সা রোজকারের খাতিরে গুটী ভেদ করিবার পূর্ব্বে গুটীগুলিকে লইয়া মধ্যস্থিত প্রায় সমস্ত পতঙ্গের প্রাণ বিনষ্ট করে। পরে সূতা পাইবার জন্য কেবলমাত্র কতকগুলি গুটী যত্নে রক্ষা করে; এই হইতেই কালে পতঙ্গ বাহির হয় এবং আবার ডিম দিয়া মরিয়া যায়।

রেড়ীর পতঙ্গ দুই প্রকার, শাদা ও সবুজ। শাদা হইতে লাল এবং সবুজ হইতে শাদা রেশম তৈয়ার হয়। ইহাদের গুটীর আকার ঠিক একটী আমড়ার আঁটির মত। গুটীর বাহিরের সূতা $\frac{1}{500}$ ইঞ্চি এবং ভিতরের সূতা $\frac{1}{200}$ ইঞ্চি মোটা। গুটীর উপরিভাগ খুব শক্ত,—সূতা সকল জমাট হইয়া থাকে,—এজন্য প্রথমে গুটীগুলাকে ক্ষারের জলে কিছুকাল ভিজাইয়া নরম করিতে হয় পরে হাতে করিয়া তুলা পিঁজার মত ইহা হইতে রেশম তুলিয়া চরকায় সূতা কাটিতে হয়। উত্তর আসামে এবং জৈন্তিয়া পাহাড়ে বিস্তর ভেরেণ্ডা

গাছ জন্মে এবং আসামে যত এরিণ্ডী রেশম জন্মায় এমন অপর কোথাও নয়। সেখানকার ধনী, মধ্যবিত্ত ও অসভ্য পাহাড়ী লোকদিগের অনেকেই এই সূতা ব্যবহার করে। রেড়ীর রেশমের সূতা লামঞ্জিষ্ঠা ও নীলবড়ি প্রভৃতি দ্বারা রং করিয়া সেই রঙ্গীন রেশম নানা প্রকার রেশমী কাপড়ের জন্য অথবা মোটা মোটা সূতার কাপড় বা চাদরের উপর ফুল কাটিবার জন্য খরচ হয়। বাঙ্গলা দেশের মধ্যে গয়া, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং, দিনাজপুর, পুরী, পূর্ণিয়া, রংপুর ও সাহাবাদ জেলা সকলেও অনেক রেড়ীর রেশম তৈয়ার হইয়া থাকে। ডিম ফুটিয়া কীটের জন্ম হইতে গুটি বাঁধা পর্য্যন্ত ৩০ দিনের অধিক সময় লাগে না সুতরাং রেড়ীর পতঙ্গ হইতে বৎসরে ১২ বার রেশম সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এক সের রেশমী সূতার দাম ৸০ আনা হইতে ১৲ টাকা।

পাঠক পাঠিকাগণ! দেখ্‌লে ত, যে সামান্য গাছ বনে জঙ্গলে কত জন্মায়, যাহাকে অনাদর করে হয়ত কত লোকে নষ্ট করে তাহা হইতেই মানুষের কত উপকার হয়। এত দিন তোমরা হয়ত অনেকেই ভেরেণ্ডার তৈল ছাড়া গাছের আর কোন গুণ জানিতে না; বল দেখি আজ তোমরা সেই সামান্য গাছ সম্বন্ধে কত নূতন কথা শিখিলে! এইরূপে আমাদের খাওয়া পরা বা নিত্য খরচের এক একটী জিনিসের গুণাগুণ ভাল করিয়া জানিয়া রাখিলে তোমাদের জ্ঞান কেমন বৃদ্ধি হয় এবং ভবিষ্যতে তোমরা কত কাজের লোক হতে পার। পরমেশ্বর যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন সকলই আমাদের উপকারের জন্য। আমরা যে ঘাস পায়ে মাড়াইয়া চলিয়া যাই তাহা দ্বারা পৃথিবীর কত কল্যাণ সাধিত হয় একবার তাহা ভাবিলে কেনা আশ্চর্য্যান্বিত হয়?

বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর।

ত বর্ষে আমরা তোমাদিগকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত কিছু বলিয়াছি। কিন্তু তাঁহার গুণের কথা সমুদয় বলা হয় নাই। যে গুণের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশে বিখ্যাত, সেটী দয়া। জগতের দীন দুঃখী, কাঙ্গাল, দরিদ্রদের বন্ধু এমন অল্পই আছে। জগতের দুঃখীদের দুঃখের কথা শুনিয়া কতবার যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চক্ষে জল পড়িতে দেখিয়াছি, তাহা তোমাদিগকে সংখ্যা করিয়া বলিতে পারি না।

অনেক দিন হইল আমাদের বাসাতে পাড়ার একটী বালিকা খেলিতে আসিত। মেয়েটীর বয়স তখন আট কি নয় বৎসর। মেয়েটী অতি সুশ্রী ছিল, তাহার মুখখানি এমন সুন্দর যে দেখিলেই ভাল বাসিতে হয়। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের বাসাতে মধ্যে মধ্যে বেড়াইতে আসিতেন। একদিন তিনি সেই বালিকাটীকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ বেশ মেয়েটী, কার মেয়ে হে!" আমরা বলিলাম "মহাশয় ওটী পাড়ার একটি নাপিতের মেয়ে। ওটী বিধবা।" সেই এই কথা বলা হইল, অমনি বিদ্যাসাগর মহাশয় যে এত হাসি খুসি আমোদ আহ্লাদ করিতেছিলেন, সে হাসি তাঁহার মুখ হইতে পলায়ন করিল; এবং আমরা দেখিলাম তাঁহার দুই চক্ষে দুইটী জলধারা গড়াইতেছে। তিনি মেয়েটীকে বলিলেন—"আয় মা আয়, আমার কাছে আয়," এই বলিয়া সেই নাপিতের মেয়েটীকে নিজ কোলে বসাইলেন, ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহার মুখে চুম্বন করিতে লাগিলেন। আমরা কি স্বর্গের দৃশ্যই যে দেখিলাম, তাহা এই ১৬। ১৭ বৎসর পরে তোমাদিগকে ভাঙ্গিয়া বলিতে পারি না। তিনি সেই মেয়েটীকে তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইতে আদেশ করিয়া গেলেন। তদনুসারে পরদিন আমরা মেয়েটীকে তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইলাম। অপরাহ্নে দেখি, মেয়েটী পরম আদর লাভ করিয়া দুই জোড়া নব বস্ত্র পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। তৎপরে তাঁহারই আদেশ ক্রমে আমরা বালিকাটীর পড়া শুনার বন্দোবস্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি এমন সময় তাহার মাতা তাহাকে লইয়া কোথায় সরিয়া গেল।

আর এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতার এক রাজাদের বারাণ্ডাতে বসিয়া বাড়ীর কর্ত্তাদের সহিত গল্প করিতেছেন। রাত্রি দুই চারি দণ্ড হইয়াছে। এমন সময়ে একটী পথভিখারী রাজাবাবুদের দ্বারে আসিয়া ভিক্ষার জন্য চীৎকার করিতেছে। তাহার চীৎকারে বাবুদের বড়ই বিরক্তি হইতেছে। অমনি দ্বারবান গলা ধাক্কা দিয়া প্রহার করিতে করিতে তাহাকে দূরে লইয়া চলিল। ধনীর দ্বারে দরিদ্রের এই নিগ্রহ দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিল। তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না। অমনি রাজা বাবুদের নিকট বিদায় লইয়া নামিয়া আসিলেন ও সেই পথভিখারীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাকে বলিলেন—"দেখ্‌ তুই যদি আমার কাছে একটা প্রতিজ্ঞা করিস্‌ ত তোকে আমি একটা টাকা দি।" সে তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিতে প্রস্তুত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন;—"তুই প্রতিজ্ঞা কর্‌ যে এ বাড়ীতে আর ভিক্ষা করিতে আস্‌বি না।" এই বলিয়া তাহার হাতে একটা টাকা দিয়া প্রস্থান করিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দয়া কোন জাতি বা সম্প্রদায়ে বদ্ধ নয়। বর্দ্ধমানে যখন এপিডেমিক জ্বরের বড় প্রাদুর্ভাব হয় তখন দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর শুনিয়া সুস্থির থাকিতে পারেন নাই। নিজের ব্যয়ে এক জন ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া এবং শত শত লোকের মত ঔষধ ও পথ্য লইয়া তিনি বর্দ্ধমানে গেলেন; এবং ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর গরিব লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ঔষধ ও পথ্য বিতরণ করিতে লাগিলেন। সে সময়ে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহারা অনেক সময় দেখিয়াছেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয় এক গাড়িতে করিয়া রাশীকৃত সাগুদানা, ও ঔষধ লইয়া ঘুরিতেছেন, হয় ত একটী মুসলমানের ছেলে তাঁহার কোলে কিম্বা একাসনে বসিয়া আছে। সে সময়ে তাঁহার পর-হিতৈষিতা দেখিয়া সকলে অবাক হইয়াছিল।

একবার একটী ফিরিঙ্গী স্ত্রীলোক ভিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট আসে। সেই রমণী উপরে আসিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে বসিবার আসন দিয়া সবে এই কথা বলিবার উপক্রম করিতেছেন যে, "সহরে বড় বড় ইংরাজ

আছে, তাদের কাছে তোমরা কেন যাও না।" এমন সময়ে দেখিলেন স্ত্রীলোকটী অতিশয় হাঁপাইতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল যে সে অনাথা বিধবা, তাহার পুত্র কন্যা অনেকগুলি, উপায় কিছু নাই। ইহার উপরে আবার তাহার শ্বাস কাশ হইয়াছে। অমনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া স্বয়ং পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন ও পরে তাহাকে সমুচিত অর্থ সাহায্য করিয়া বিদায় করিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দয়ার কথা কি বলিব। সচরাচর দেখিতে পাই, লোকে যাহার প্রতি বিরক্ত থাকে, যাহার চরিত্র দেখিয়া ঘৃণা করে তাহাকে আর দয়া করিতে পারে না। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কি আশ্চর্য্য দয়া, যাহার চরিত্র দেখিয়া তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন তাহার অথবা তাহার স্ত্রীপুত্রের দুঃখের কথা শুনিলেও সুস্থির থাকিতে পারেন না। কলিকাতার একটী বড় মানুষের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধুতা ছিল। ঐ বড়মানুষের একটী বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র পিতার সহিত বিবাদ করিয়া ও অন্যান্য অনেক অন্যায় কাজ করিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া যায়। সেই কারণে পিতার সহিত তাহার আলাপ পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যায়। সেই যুবক সপরিবারে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়া অবশেষে পীড়িত হইয়া কলিকাতায় আসে। আমাদের সহিত বালক কাল হইতে তাহার আত্মীয়তা ছিল, সুতরাং কলিকাতায় পৌঁছিয়া আমাদের বাসাতেই আসিয়া উপস্থিত হয়। কলিকাতায় আসিয়া তাহার পীড়া দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এমন কি তাহার বাঁচার আশা ছাড়িতে হইল। এই গুরুতর পীড়াতে পড়িয়া সে যুবক একদিন বলিল—"তোমরা যদি পার, আমার পিতাকে একবার ডাকিয়া আন।" তাহার পিতার সহিত আমাদের পরিচয় ছিল না। একে অপরিচিত, তাহাতে বড়মানুষ—আমাদের কথায় গরিবের কুটীরে কুপুত্রকে দেখিতে আসিবেন কেন? অপার ভাবনায় পড়িলাম। অবশেষে নিরুপায় হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে গিয়া ধরিলাম। তিনি ত প্রথমে আমাদিগকে তিরস্কার করিলেন, পরে বলিলেন "সে অতি অসৎ; সে পিতার সহিত অতিশয় উদ্ধত ব্যবহার করিয়াছে, আমি তাহার চরিত্রের জন্য তাহাকে ঘৃণা করি, আমি কি করিয়া গিয়া তাহার পিতাকে ধরিব?" আমরাও ছাড়িবার পাত্র নই। অবশেষে বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের স্নেহের দায়ে সেই দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপর দিন তাহার পিতাকে লইয়া আমাদের বাসাতে আসিলেন। পিতা পুত্রে দেখা হইল; বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঁচিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন যে তাহার স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের ও তাহার রোগের শুশ্রূসার জন্য একটী পয়সাও নাই, অমনি তাঁহার দয়ার সঞ্চার হইল। আমাদিগকে বলিয়া গেলেন "দেখিও উহার স্ত্রীপুত্রের যেন ক্লেশ হয় না, এবং চিকিৎসার যেন ত্রুটী হয় না, এজন্য কিরূপ খরচের প্রয়োজন আমাকে জানাইও।"

আজ এই পর্য্যন্ত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দয়ার বিষয়ে এরূপ গল্প অনেক আছে। যদি জানিতে পারি এই সকল গল্প "সখা"র পাঠক পাঠিকার ভাল লাগিতেছে, তাহা হইলে পরে আরও প্রকাশ করা যাইতে পারে।

খোকা মণি বড় খুসি, গাল ভরা হাসি
দেখে যা পাড়ার লোক কত শোভা রাশি!

সুন্দর মায়ের কোলে সুন্দর সন্তান!
কবি বলে, এই শোভা স্বরগ সমান।

আবদারে ছেলে।

সুন্দর খেলনা দেখে অন্য শিশু হাতে,
অবোধ শিশুর লোভ পড়িল তাহাতে।
দুই শিশু, হিত-কথা কেহই বোঝেনা,
এক জন যাহা চায় অন্যে তা ছাড়েনা।
হলো যে বিষম জ্বালা, কাঁদিল সন্তান,
কতই বুঝান মাতা, নাই দেয় কাণ।
মা তারে চাপেন বুকে, করেন চুম্বন,
লক্ষ্মী ছেলে, সোণামণি, বাপ, যাদু ধন,
কত কি বলেন মাতা, কোলেতে করিয়া,
এঘর ওঘর করে বেড়ান ঘুরিয়া।
এটী ওটী সেটী দেন তার হাতে তুলে,
আবদারে ছেলে মার কিছুতে না ভুলে।
আধ ভাষে সেই বুলি, সেই অশ্রু ঝরে,
'কি দিয়ে ভুলাই,' মাতা ভাবেন অন্তরে।
অবশেষে কাকাতুয়া আছিল যথায়
লইয়া প্রাণের ধনে চলেন তথায়।
এত যে ক্রন্দন তার, এত আবদার,
কি আশ্চর্য্য, পাখী দেখে কিছু নাহি আর!
মা বলেন,—"কাকাতুয়া," পাখী তাই বলে;
যে দিকে পেয়ারা যায় সেই দিকে চলে।
খোকা মণি বড় খুসি, গাল ভরা হাসি
দেখে যা পাড়ার লোক কত শোভা রাশি!
সুন্দর মায়ের কোলে সুন্দর সন্তান!
কবি বলে এই শোভা স্বরগ সমান।

চীনের গল্প।

আমি একখানা বড় মজার বই পড়িয়াছি। পড়িবার সময় পাঠক পাঠিকারা যদি কাছে থাকিতেন, তবে কত আমোদই পাইতেন। পড়িয়াছি, আর দুঃখ করিয়াছি, কাছে বসিয়া শুনিবার জন্য অধিক লোক নাই। বই খানাতে চীন দেশী লোকের কথা লেখা আছে। চীন দেশটা কোথায়, তাহা হয় তো তোমাদের অনেকেই জান। আর চীনেমান্‌গুলিকেও হয় তো অনেকেই দেখিয়াছ। সেই যে সাদা লোকগুলি; সেই যে, চ্যাপ্টা মুখ, খাঁদা নাক, মিট্‌মিটে চোখ, লম্বা টিকী, জুতো তৈরি করে, ছুতোরের কাজ করে, ওয়াহ্ কোওহ্ ওয়াঙ্ চু করিয়া কথা বলে, আফিম খায়, সেই লোকগুলি। চীনের লোকেরা খুব প্রাচীন কালে সভ্য হইয়াছিল। এরাই প্রথম অক্ষর কাটিয়া ছাপ তুলিতে শিখে। এরাই বারুদের সৃষ্টি করে। একটা দেশের সঙ্গে যুদ্ধ হইত বলিয়া এরা অনেক দিন হইল ঐ দেশ আর চীন দেশের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড দেয়াল দিয়া ফেলিল। সে এমনি দেয়াল যে তেমন আর পৃথিবীতে নাই। আমাদের দেশে এখনও অজ্ঞ লোকের বিশ্বাস আছে যে, যত কল সব চীন দেশে তৈরি হয়। চীন দেশের লোকের মতন পৃথিবীর আর কোন জাতি এত ভাল ঘুড়ি উড়াইতে পারে না।

সেই পুস্তক খানাতে ইহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা আছে। এক একটা কথা এমনি হাসিবার যে, পড়িবার সময় যে কত হাসিয়াছি তাহার তো কথাই নাই, এখন আমার 'চীনেমান্' গুলিকে দেখিলেই হাসি পায়। আগে চীনদেশী ছেলে মেয়ের সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিব, তার পর ইচ্ছা আছে মাঝে মাঝে চীন দেশী গল্পের ঝুড়ি খুলিয়া পাঠক পাঠিকাদিগকে আমোদ দিব।

বেটা ছেলেটী জন্মিলে চীন দেশী বাপ মা বড় খুসী হন, আর খুব ধুমধাম করেন। মেয়ে ছেলেটী যদি হইল তবে তাঁহারা বড় দুঃখিত। সেখানে মেয়েদের বড় অনাদর। অনেক পরিবারে তাহাদের নাম পর্য্যন্ত রাখা হয় না; অনেক গুলি মেয়ে হইলে তাহাদিগকে ডাকা হয় 'একের নম্বর', 'দুয়ের নম্বর' ইত্যাদি। কোন কোন জায়গায় মেয়ে জন্মিলে পর তিন দিন তাহাকে মেজেতে ন্যাকড়া পাতিয়া তাহার উপর ফেলিয়া রাখা হয়। ইহার অর্থ, মেয়ে বড় হইলে ঐরূপ আদর পাইবে।

তিন দিনের হইলে ছেলেটীকে স্নান করান হয়। সেই স্নানের জলে বাপ মা কত জিনিসই মিশাইয়া দেন, মনে করেন ইহাতে ছেলে ভাগ্যবান্ হইবে। তার পর আর কিছু জল দিয়া ছেলেটীকে ধোওয়া হয়। এই জলে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে কিঞ্চিৎ মুদ্রা আর রূপা ফেলিয়া দেন—ছেলের খুব টাকা কড়ি হইবে। গায়ের রং ভাল হইবে বলিয়া ডিম ভাঙ্গিয়া তাহার সাদা অংশটা গায়ে মাখাইয়া দেন। শেষে পেঁয়াজ দিয়া তাহার পাছায় আঘাত করা হয়; ইহাতে ছেলে খুব চালাক হইবে।

এর সঙ্গে সঙ্গে লাল সূতা দিয়া তাহার হাত দুখানি বাঁধিয়া দেওয়া হয়। কখন কখন কয়েক মাস ধরিয়া হাত এইরূপে বাঁধা থাকে। এরূপ করিলেই আর বড় হইয়া দুষ্টু ছেলে হইতে পারে না, আর ভয় পাইয়া হাত পা ছুড়িতে পারে না। দড়ীটা খুব লম্বা থাকে, সুতরাং ছেলে ইচ্ছামত হাত নাড়িতে পারে। মাঝে মাঝে হাতে পয়সা বাঁধিয়া দেন—এর কারণ, যদি ভূত টুত ছেলেটীকে উৎপাত করিতে আসে, তবে এই পয়সাতে তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইবে।

অল্প দিন পরেই ক্ষুর দিয়া ছেলের মাথার চুল চাঁছিয়া ফেলা হয়। তবেই চুল শীঘ্র শীঘ্র উঠে। চুল এক ইঞ্চি দু ইঞ্চি লম্বা হইলে বেশ করিয়া তাহাকে একটী ছোট ল্যাজের আকারে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। টুপীতে একটী ছিদ্র থাকে, তাহার ভিতর দিয়া ল্যাজটী বাহির হইয়া থাকে।

মেয়ে ছেলের বেলা এ সব যত্ন কিছুই করা হয় না। অনেক স্থানে মেয়ে হইলেই তাহাকে মারিয়া ফেলে। তাহাদিগকে কেহ চায় না, তাহাদের আবার কে খাইতে দিবে! সাধারণতঃ তাহাদের বাবারাই এই নৃশংস কাজ করিয়া থাকে। গলায় পাথর বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দেয়। অনেক নিষ্ঠুর লোক তাহাদের নবজাত মেয়েগুলিকে পোড়াইয়া মারে। অনেক ধনী লোক ও মাঝে মাঝে মনে করেন যে তাঁহাদের ঢের মেয়ে হইয়াছে, আর দরকার নাই। এর পর মেয়ে হইলে তাঁহারাও ঐরূপ মারিয়া ফেলেন।

এক জন কামারের ক্রমে দুইটী মেয়ে হইয়া দুইটীই নিতান্ত শিশু অবস্থায় মরিয়া গেল। কিছু দিন পর আর একটী মেয়ে হইল। বাপ মা মনে করিল যে এ আর কিছুই নয়,—একটা ভূত বার বার আসিয়া তাহাদিগকে উৎপাত করিতেছে। এটা কখনও ভাল ভূত নহে। এইরূপ যুক্তি করিয়া কামার অনেকগুলি কাঠ সংগ্রহ করিয়া

একটা বড় আগুন করিল, আর মেয়েটীকে তাহাতে ফেলিয়া তামাসা দেখিতে লাগিল। শেষে তাহার শরীরের অঙ্গারগুলি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিল।

আর একটী শিশু মেয়ের মা তাহাকে সমস্ত রাত্রি মেজেতে ফেলিয়া রাখিল। সকালে মেয়ের বাবা আসিয়া দেখিয়া তাহাকে ডুবাইয়া মারিবার জন্য জল আনিতে গেল। এর মধ্যে এক জন স্ত্রীলোক আসিয়া এ সব দেখিল। সে মেয়েটীর বাবাকে বলিল 'তুমি একে মারিও না, একটু অপেক্ষা কর।' এই কথা বলিয়া সে এক জন খ্রীষ্টান ধর্ম্ম-প্রচারিকার কাছে গিয়া খবর দিল। তিনি আসিয়া মেয়েটীকে নিতে চাহিলেন। মেয়ের বাবা তাহাতে কোন আপত্তি করিল না, সে ভাবিল আপদ বিদায় হইলেই বাঁচি। বিবি তাহাকে লইয়া আসিলেন, এবং তাহাকে খুব যত্নে মানুষ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মেয়েটী শীঘ্রই মরিয়া গেল।

ছেলে মেয়ে মরিয়া গেলে চীন দেশী লোকেরা মনে করে যে ছেলের বাবা অথবা তাহার পিতামহ কাহারও নিকট হইতে টাকা ধার করিয়াছিল এবং তাহা দেয় নাই; সুতরাং সেই লোকটা মরিয়া ইহাদের ঘরে আসিয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এত দিন তাহাদের পয়সা খরচ করাইয়া, তাহাদের অন্ন ধ্বংস করিয়া, এখন চলিয়া-গিয়াছে। সুতরাং ছেলের অসুখ হইলে তাহাকে খুব যত্ন করা হয়, কিন্তু মরিয়া গেলেই মনে করে যে ঐরূপ একটা ভূত আসিয়াছিল, তাহাকে যত শীঘ্র ফেলিয়া দেওয়া হয় ততই ভাল। মৃত দেহটী বাড়ীর বাহিরে লইয়া যাইবার সময় তাহারা বাড়ী ঝাড়ে এবং পট্‌কা পোড়াইয়া ও ঘণ্টা বাজাইয়া ভূত তাড়াইতে চেষ্টা করে।

ছেলে মেয়ে হাটিতে শিখিলেই তাহাদিগকে কাজ করিতে শিখান হয়। চীন দেশের ছেলে মেয়েদিগকে এত বেশী কাজ করিতে হয় যে, বেচারীরা খেলা করিবার সময় পায় না। ছেলে বয়সেই বুড়াদের মত তাহাদের মুখ ব্যস্ত ও গম্ভীর হইয়া যায়। ৬।৭ বছর বয়স হইলে তাহাদিগকে পড়িতে শিখান হয়। চীন দেশে আমাদের ন্যায় অক্ষরের সাহায্যে শব্দ প্রস্তুত করিবার রীতি নাই। সেখানে প্রত্যেকটী কথার জন্য এক একটা নূতন চিহ্ন ব্যবহার করিতে হয়। তোমাদের অনেকেই বাজার হইতে পট্‌কা কিনিয়া আনিয়া থাকিবে। পট্‌কার বাক্সের উপরে লাল কাগজে সোণার অক্ষরে কতকগুলি কি আঁকা থাকে তাহা দেখিয়া তোমরা হয় তো মনে করিয়া থাকিবে যে, ঐ বুঝি চীন দেশীয় কোনরূপ গাছের অথবা জাহাজের ছবি। কিন্তু বাস্তবিক উহারা এক একটী অক্ষর। ভাষায় যতগুলি শব্দ আছে, ঐ প্রকার চেহারা বিশিষ্ট ততগুলি অক্ষরের সঙ্গে পরিচয় হইলে তার পর মনে করিতে পার যে, ছেলের বর্ণ পরিচয় হইল। সুতরাং তাহাদের অক্ষর পরিচয় হইতেই জীবন যায়।

১৪।১৫ বছরের হইলে ছেলেকে স্কুলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। স্কুলে যাওয়ার পর হইতে সে খেলা করিতে পারিবে না। সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া স্কুলে যাইবে আর সন্ধ্যার সময় তাহার ছুটী হইবে। তার পর কিরূপ গুরু মহাশয়ের নিকট পড়িতে হইবে তাহা চেহারা দেখিয়াই বুঝা যাইতে পারে। চেহারার একটী বিষয় নিয়া বোধ হয় তোমাদের কিছু গোলমাল লাগিয়াছে; উহাতে একটী থলিয়া আর একটী নল থাকিবার উদ্দেশ্য হয় তো অনেকেই বুঝিতে পার নাই। থলিয়াটীর ভিতর কি কি আছে আমি ভাল করিয়া জানি

না, তবে একটী দেশলাইয়ের বাক্স এবং কিঞ্চিৎ আফিম আছে একথা বলিয়া দিতে পারি। হাতের নলটী আফিম খাইবার যন্ত্র। ঐ জিনিসটী চেহারায় উঠিয়াছে, তাহাতেই বুঝিতে পার মাষ্টার মহাশয় ইহার কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন; এবং ঐরূপ ব্যবহারের পর মাষ্টার মহাশয়ের মাথা কত দূর পরিষ্কার থাকে তাহাও একবার অনুমান করিয়া লইবে।

তোমরা পাঠ বলিবার সময় মাষ্টারকে সম্মুখে করিয়া পাঠ বলিয়া থাক; চীন দেশীয় ছাত্রদিগকে মাষ্টারের দিকে পৃষ্ঠ দেশ রাখিয়া পড়া বলিতে হয়। নহিলে মাষ্টার মহাশয় মনে করেন যে তাঁহার হাতের বই দেখিয়া ফাঁকি দিবে। ইহাতে তিনি যে ভয় করেন তাহারই সহায়তা হয়। কেমন করিয়া হয় বলিব না। চীন দেশের স্কুলে সচরাচর শাস্তি দেওয়ার নিয়ম নাই। নিল ডাউন করিয়া রাখা, মাথায় টোকা দেওয়া ইত্যাদি শাস্তি মাঝে মাঝে দেওয়া হইয়া থাকে। কখন কখন পূর্ণ এক কড়া জল তাহার মাথায় রাখিয়া তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে বলা হয়; এক ফোঁটা জল মাটিতে পড়িলেই বেত খাইবার নিয়ম। সহজে যদি উপকার না হইল তবে মাষ্টার মহাশয় এক খণ্ড কাঠ লইয়া তাহার হাতে এবং পীঠে আঘাত করেন। তাহাতেও যদি না শুধরাইল তবে মাষ্টার মহাশয় এক বাঁশ লইয়া তাহার সাহায্যে ছাত্রকে সংশোধন করেন।

মেয়েদের জন্য স্কুল অতি অল্পই আছে। সাধারণতঃ মেয়েদিগকে স্কুলে দেওয়াই হয় না।

নাক ও চোকের বিবাদ।

"কার তরে চশমার হয়েছে সৃজন,"
এই লয়ে ঘোর দ্বন্দ্ব করে দুই জন।
নাক বলে "তিল মাত্র বুদ্ধি আছে যার,
সে বুঝিবে চশমার দেখিয়া আকার।
অবশ্যই মোর তরে চশমা সৃজন,
নতুবা তাহার কেন এমন গঠন।
আমার উপরে কিবা খাপে খাপে বসে;
হাঁটো, ছোটো, উঠো বসো, কভু নাহি খসে!
আমাকে ছাড়িয়া শোভা থাকে কি তাহার,
আমাতে বসিলে তার কেমন বাহার।"
চোক বলে, "আমি যদি পাতা নাহি খুলি?
কি হেতু মানুষ তবে পরিবেরে ঠুলি?"
জ্বলিয়া উঠিল নাক অগনি সমান,
রক্তিমা বরণ হ'লো রাগে কম্পমান।
"কেন মিছে এত কথা, বকিতেছ তুমি,
তোমা হতে সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠতর আমি;
আমি যদি নাহি থাকি, চলে কি ধরণী?
নিশ্বাস ঠেকিয়া লোক, মরিবে এখনি।
ফুলের গৌরব যত আমা হতে হয়;
গোলাপ, আতর, মান আমা হতে পায়;
আমি যদি নাহি থাকি, মানব নিচয়
কেমনে সুগন্ধি দ্রব্য করিবে নির্ণয়;
তুই বিনা বাঁচে জীব কাণা কহে তারে,
যা যা চোক্ কেবা তোরে পুছে এ সংসারে?"

জবাফুল সম চোক, হইল শুনিয়া,
থর থর কাঁপে পাতা, থাকিয়া থাকিয়া।
বলে—"নাক, কার কাছে করিস্ বড়াই,
দিন রাত কাছে থাকি অগোচর নাই।
ও দুটো বিবর তোর নর্দ্দমার মত,
কফ্ শর্দ্দি জলকত বহে অবিরত;
নিদ্রা কালে তোর ডাকে ত্রাস লাগে প্রাণে,
ভাবিবে কলুর ঘানি যে বা নাহি জানে।
বলিলি মানের কথা এই তোর মান,
নাক মলা দিয়ে লোকে করে অপমান।
যার তুই, সেও তোকে কভু নাহি ছাড়ে,
শর্দ্দি হ'লে তোরে মলে যেথা সেথা ঝাড়ে।
বাক্য ব্যয়ে কাজ নাই, পাতা না মেলিব,
তোমার বড়াই কত, এখনি দেখিব।"
"তথাস্তু" বলিয়া নাক ছিদ্র বন্ধ করি,
বসিল রাগিয়া তবে, বিসম্বাদ করি।

বাধিল বিষম গোল, উঠিল ক্রন্দন রোল,
আর আর ইন্দ্রিয় ভিতরে;
"কিহল" "কিহল" ধ্বনি, হঠাৎ শ্রবণে শুনি,
ভয় হ'ল মানব অন্তরে।
আঁধারেতে কোন্ খানে পড়িয়া মরিবে প্রাণে
পদ তাই চাহেনা চলিতে;
সুমিষ্ট কি তিক্ত হায়, মুখেতে আনিয়া দেয়,
জিভ তাই চাহেনা খাইতে।
কিছু না বুঝিতে পারে, এক ছেড়ে আর ধরে,
হাত বলে একি হ'ল দায়;

কাণেরা বসিয়া দূরে, সঠিক বুঝিতে নারে,
ভাবিল পরাণ বুঝি যায়।
মুখ দিয়া পথ খুলে, নিশ্বাস সজোরে চলে,
হাঁ করিয়া রহিল আনন;
পেট বলে একি হল, অনাহারে প্রাণ গেল,
কেন আজি ঘটিল এমন।
রসনা ডাকিয়া তবে, বলিল ইন্দ্রিয় সবে,
এস ভাই কি দেখিছ আর!
এ বিবাদ ঘরে ঘরে, একারণে সবে মরে,
শালিসিতে করিবে বিচার।
সবে তাতে দিল সায়, নাক চোক সে সভায়,
রাজি হয়ে জানাল সম্মতি;
প্রতিজ্ঞা করিয়া তবে, বসিল ইন্দ্রিয় সবে,
ধীরভাবে করিতে যুকতি।
মিটে গেল গোল পলাইল রোল,
সভায় সবার মতি,
সবে মিলে কাণে প্রধান আসনে,
বসাইল সভাপতি।
ছিদ্র খুলে দিয়া, বিনয় করিয়া,
বলে নাক খাঁট সুরে;—
"শুন সবে ভাই, যার নাক নাই
কেমনে চশমা পরে?
তাই দ্বন্দ্ব করি, চশমা আমারি,
বিচার করিব মিলি,
নত করে ঘাড়, সভার বিচার,
লইব সঠিক বলি।"
পাতা দিয়ে খুলে, চোক এসে বলে,
"শুন শুন মোর যুক্তি,
যুক্তি শুনে সবে, বিচার করিবে
নির্দ্দোষীরে দিবে মুক্তি।
দৃষ্টি হলে কম; করে উপশম,
এগুণ চশমা ধরে;
তাইত সকলে, দৃষ্টি ক্ষীণ হ'লে,
যতনে চশমা পরে।
দুপক্ষ শুনিয়া, বিচার করিয়া,
বল যাহা সত্য মোরে।"
দাঁড়াইয়া তবে, সুগম্ভীর রবে,
সভাপতি বলে জোরে;
শুন শুন সভাজন সভার বিচার,
অপরাধী নাকে আজি দিতেছি ধিক্কার।
দৃষ্টি ক্ষীণ চোক তরে, চশমা মানব পরে,
নাক শুধু নত ভাবে করিবে বহন,
নতুবা শরীর তার হইবে কর্ত্তন।

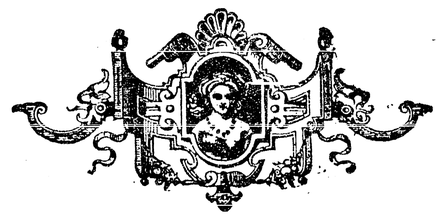

কুকুরের চাতুরী।

একটী ভদ্র লোকের কুকুর সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইত। একদিন এক বাড়ীতে রাত্রে তাঁহার নিমন্ত্রণ হয়। কুকুরটী সঙ্গে গিয়া উপস্থিত। তাঁহারা আহারাদি করিতেছেন, কুকুরটী এক পাশের অন্ধকার ঘরে ঘুমাইয়া আছে। তিনি বাড়ী যাইবার সময় কুকুরটীকে দেখিতে পাইলেন না; ভাবিলেন, সে বুঝি চলিয়া গিয়াছে। একা ঘরে ফিরিয়া গেলেন। ওদিকে গৃহস্থের ভৃত্যেরা বাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া সেই ঘর বন্ধ করিয়া নিদ্রা গিয়াছে। গভীর রাত্রে কুকুরের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া সে ভয়ানক বিপদে পড়িল। বাহিরে যাইবার পথ পায় না। যাহোক অনেক কষ্টে একটী জানালা আঁচড়া-

ইয়া খুলিয়া প্রায় একতলা সমান উচু জায়গা হইতে বাহিরে পড়িয়া সে দিন ঘরে গেল। তার পর আর একদিন রাত্রে তার প্রভুর সেই বাড়ীতে নিমন্ত্রণ। কুকুর ও তাহার সঙ্গে গিয়াছে। কিন্তু সে দিন ভদ্রলোকটী আসিবার সময় নিজের লাঠি ও টুপি খুজিয়া পান না। আলো ধরিয়া এদিক ওদিক অন্বেষণ করিতে করিতে দেখেন যে কুকুরটী লাঠি ও টুপিটী লইয়া গিয়া তাহার উপরে পা দুখানি রাখিয়া ঘুমাইতেছে। তখন বুঝিতে পারিলেন যে পূর্ব্ব রাত্রে ফেলিয়া যাওয়াতে সে এবারে ঐ বুদ্ধি খেলিয়াছে।

ধাঁধা।

নূতন।

১। তিন অক্ষরে এমন একটী স্থানের নাম কর যাহার প্রথম ও দ্বিতীয় একত্রে লইলে এমন একটী দ্রব্যের নাম হয় যাহা সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গে আছে এবং প্রথম ও তৃতীয় লইলেও সেই একই দ্রব্যর নাম; বলত সেই স্থানের নাম কি?

২। ৪০ জন লোক এক নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিল। ইহাদের মধ্যে কতগুলি ব্রাহ্মণ, কতগুলি কায়স্থ ও কতগুলি মুসলমান। নিমন্ত্রণ কর্ত্তা ৪০ খানা পাতা দ্বারা প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে ৩ খানা, কায়স্থকে ২ খানা এবং প্রত্যেক তিনজন মুসলমানকে এক খানা করিয়া দিয়া বসাইয়া দিলেন। এখন এই নিমন্ত্রণে কতগুলি ব্রাহ্মণ, কতগুলি কায়স্থ ও কতগুলি মুসলমান উপস্থিত ছিল বল দেখি?

৩। এক দিন চন্দ্র বনের ধারে বেড়াইতেছিল, এমন সময় তাহার দাদা একটী র আনিয়া তাহার সহিত যোগ করিয়া দিলেন; দিবা মাত্র সে এক প্রকার শব্দ করিতে করিতে বনে প্রবেশ করিল। বলত কেমন করে?

৪। নানা বর্ণ ধরি আমি একই শরীরে।
কারো সঙ্গে নাহি থাকি মেঘ নীরে॥
ভানু বিপরীত দিকে যদি মেঘ হয়।
তখনি জানিবে সবে আমার উদয়॥

৫। ঘরে ঘরে নৃত্য করে, দেখিতে না পাই।
সর্ব্বক্ষণ তার কার্য্য রাত্রি দিবা নাই॥
স্মরণেতে ভয় হয় পরশনে নয়।
মিত্র কিন্তু হয় সেই, লোকে শত্রু কয়॥

৬। মাংস নাই, হাড় নাই আঙ্গুল আছে তার,
বল দেখি শিশু ভাই কি নাম তাহার।

৭। এক বর্ষ ধরে মোর কতই আদর,
এক বর্ষ পরে সবে করে অনাদর।
মোর মতে কার্য্য করে এক বর্ষ ধরে,
সময় হইলে গত, নাহি গ্রাহ্য করে।

৮। কি এমন আছে যাহা দেখিয়াছে সবে,
কিন্তু তাহা আর কেহ দেখিতে না পাবে।

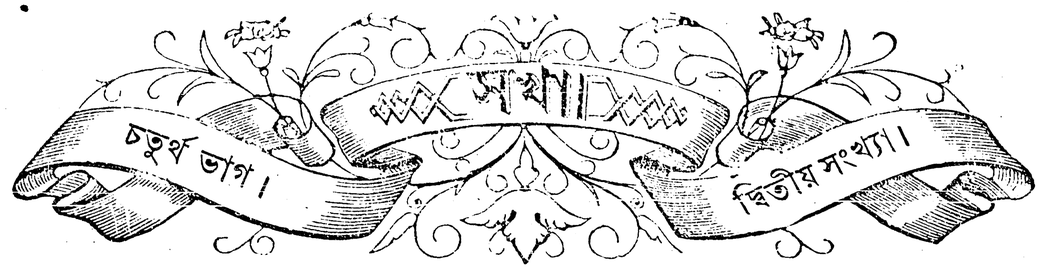

ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬।

পূর্ণিমা ও অমাবস্যা।

ত্রিকালে পূর্ণিমা তিথিতে আকাশের কেমন শোভা হয়! কিন্তু আবার যে দিন অমাবস্যা তিথি, সে দিন রাত্রি কি ভয়ানক অন্ধকার! ভাল, জিজ্ঞাসা করি, পূর্ণিমার রাত্রিতে যে সুন্দর চাঁদ দেখা যায় অমাবস্যার রাত্রিতে সে কোথা যায়? এ কথা কি কখন মনে উদয় হয়? আবার মধ্যে কয়দিন চন্দ্রের আকার ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইয়া হইয়া শেষে একেবারে অদৃশ্য হয়; এবং অমাবস্যার পরে আবার ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া বৃদ্ধি হইয়া পুনরায় পূর্ণচন্দ্র দেখা দেয়। প্রায় একমাসে একবার পূর্ণচন্দ্র হইতে কমিয়া অমাবস্যা ও অমাবস্যার পর হইতে বাড়িয়া পূর্ণিমা দেখা যায়। ইহার কারণ বোধ হয় তোমরা মনে মনে ভাবিতে পার নাই। আজ আমরা সহজ করিয়া বলিতে চেষ্টা করিব। প্রকৃতির মধ্যে এই রকম হাজার হাজার আশ্চর্য্য কাণ্ড সর্ব্বদাই আমরা দেখি। যিনি এই গুলির কারণ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারেন তিনিই বিদ্বান ও বড় লোক হইয়া থাকেন।

শিশু যে চাঁদকে "আই আই" বলিয়া হাত নাড়িয়া থাকে, লোকেও যে চাঁদকে নহিলে সুন্দর জিনিসের তুলনা দিতে পারে না, সেই শোভার আকর পূর্ণ-শশী কি? তোমরা এত কচি ছেলে নও যে, ঠাকুর মা তোমাদের চোকে ধূলি দিয়া বুঝাইয়া দিবেন—"চাঁদ একটা দেবতা" বা "চাঁদ স্বর্গের বাতি" ইত্যাদি। চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ। পৃথিবী যেমন সূর্য্যের চারিদিকে এক বৎসরে ঘুরিয়া আসে, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, ইউরেনস্, নেপ্‌চুন্, প্রভৃতি অন্যান্য গ্রহগণ যেমন ক্রমাগত সূর্য্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, চন্দ্রও তেমনি পৃথিবীর চারিদিকে প্রায় এক মাসে ঘুরিয়া বেড়ায়। চন্দ্র যদি সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিত, তাহা হইলে উহার নাম ও গ্রহ হইত। কিন্তু একটী গ্রহের চারিদিকে বেষ্টন করে বলিয়া উহার নাম "উপগ্রহ" হইয়াছে। কখনও ভুলিওনা যে চন্দ্র আমাদের পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। উহা উপগ্রহ। অন্যান্য গ্রহগণের মধ্যেও কয়েকটীর উপগ্রহ আছে। বৃহস্পতির চারিটী উপগ্রহ আছে, শনির চারিদিকে আটটী উপগ্রহ পরিভ্রমণ করে, ইউরেনসের অন্ততঃ চারিটী, নেপ্‌চুনের একটী। ইহারাও চন্দ্রের মত স্ব স্ব গ্রহের চারিদিক বেষ্টন করে।

এইবার একটী কথা বলিব, তাহা হয়ত

তোমরা বিশ্বাস করিবে না। আর নয়ত বিশ্বাস করিলেও আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইবে। সে কথাটী এই যে,—চাঁদের আলো নাই, উহার নিজের একটুও আলো নাই! তোমরা বলিবে "সে কি? চাঁদের আলো নাই? সমস্ত পৃথিবী যে আলো করে, তাহার আলো নাই? চাঁদ কি তবে চুরি করিয়া আলো আনে?" আমরা বলিব যথার্থই চাঁদ চোর। ঐ যে আলো, ঐ যে হাসি,—উহার একটুও চন্দ্রের নিজের ধন নহে। সবটুকুই সূর্য্যের কাছ হইতে ধার করা। আমাদের পৃথিবীর যেমন নিজের আলো নাই, চন্দ্রও ঠিক তাহারই মত। ঠিক পৃথিবীর মত মাটি, পাহাড়, পর্ব্বত, গহ্বর, এই সকলে চন্দ্র পরিপূর্ণ। প্রভেদ এই যে সেখানে গাছ পাতা নাই—মানুষ প্রভৃতি জন্তু নাই, আর এ রকম বাতাস নাই। সে যাহাই হউক, কথাটা এই যে, চন্দ্র ঠিক পৃথিবীর মত জ্যোতির্ব্বিহীন জড়পিণ্ড, উহার আলো বা তেজ কিছুই নাই।

তবে চন্দ্র পূর্ণিমার রাত্রিতে তত আলো কোথায় পায়?—সূর্য্যের নিকট হইতে। পৃথিবী নিজে জ্যোতি-হীন হইলেও মধ্যাহ্নকালে যেমন সূর্য্যের কিরণে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, উহার গাছ পাতা, পথ ঘাট, মাঠ প্রান্তর, পর্ব্বত সাগর, নদী হ্রদ সমস্তই যেমন এক কালে আলোকিত হইয়া ধপ্ ধপ্ করিতে থাকে, চন্দ্রের পক্ষেও ঠিক তাই। চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে বটে, কিন্তু সূর্য্যেরও আলো পায়। এই আলোকে চন্দ্রের জমি আলোকিত হইয়া ঝক্ মক্ করিতে থাকে। পৃথিবীর চারিদিকেই যেমন সূর্য্যের কিরণ পতিত হয়, যখন যেদিকে পড়ে সেইদিকে দিন হয় আর তাহার বিপরীত দিকে রাত্রি থাকে; চন্দ্রেরও যে দিকে যখন সূর্য্যকিরণ পড়ে সেই দিকে চন্দ্রের দিন, আর অন্য দিকে চন্দ্রের অন্ধকার রাত্রি। এখন বুঝিয়া দেখ, চন্দ্রের যেদিকে দিন হয় সেই দিকের আলো আমরা দেখিতে পাই। এই আলোককে জ্যোৎস্না বলে। একটী অন্ধকার গৃহের দ্বারের নিকটে রৌদ্রে একখানা ভিজা শ্লেট্ রাখিলে দেখিবে ঐ শ্লেটের ভিতর হইতে রৌদ্রের আভা ঘরের ভিতরে গিয়া লাগে ও তথায় একটা আলো হয়। এইরূপ আলোর নাম "প্রতিফলিত আলোক"। বাহিরে রৌদ্র থাকিলে ঘরের পাশের রাস্তা দিয়া যে সকল লোক চলে, তাহাদেরও প্রতিফলিত আলোক ঐ ঘরের দেয়ালে পড়িতে দেখা যায়। চন্দ্রের আলোক ও ঠিক ঐরূপ। চন্দ্রের উপর সূর্য্যের কিরণ পতিত হইলে উহা উজ্জ্বল হয় এবং ঐ আলোকে সমস্ত চন্দ্র মণ্ডল আলোকময় হইয়া উঠে। তখন আর বুঝা যায় না যে, চন্দ্রের নিজের আলোক নাই।

উপরে বেশ বুঝা গেল যে চন্দ্রের আলো পরের। চন্দ্রের যে ভাগ সূর্য্যালোকে আলোকিত হয় তাহারই আলো আমরা দেখি। চন্দ্রে যদি মনুষ্য থাকিত তাহা হইলে আমাদের পৃথিবীকেও তাহারা ঐরূপ আলোকিত দেখিতে পাইয়া মনে করিত পৃথিবী জ্যোতির্ম্ময়। কিন্তু বস্তুতঃ উহা তাহাদের ভ্রম হইত সন্দেহ নাই।

ভাল, যদি সূর্য্যের আলোকেই চন্দ্রের আলোকের কারণ এবং সূর্য্যও ত প্রতিদিন আছে, তবে পূর্ণচন্দ্র একদিন বৈ আর দেখিনা কেন? এ প্রশ্ন তোমরা এখন করিবেই করিবে। আমরা ক্রমে তাহার উত্তর দিব। প্রথমে একটী কথা মনে করিতে হইবে। পৃথিবীর যেমন বার্ষিক গতি দ্বারা ইহা আপন মেরুদণ্ডে গাড়ীর চাকার মত একদিনে একবার ঘুরে; চন্দ্রেরও এই উভয় প্রকার গতি আছে। চন্দ্র প্রায় একমাসে পৃথিবীকে বেষ্টন করে, আবার ঠিক সেই সময়েই

সূর্য্য।

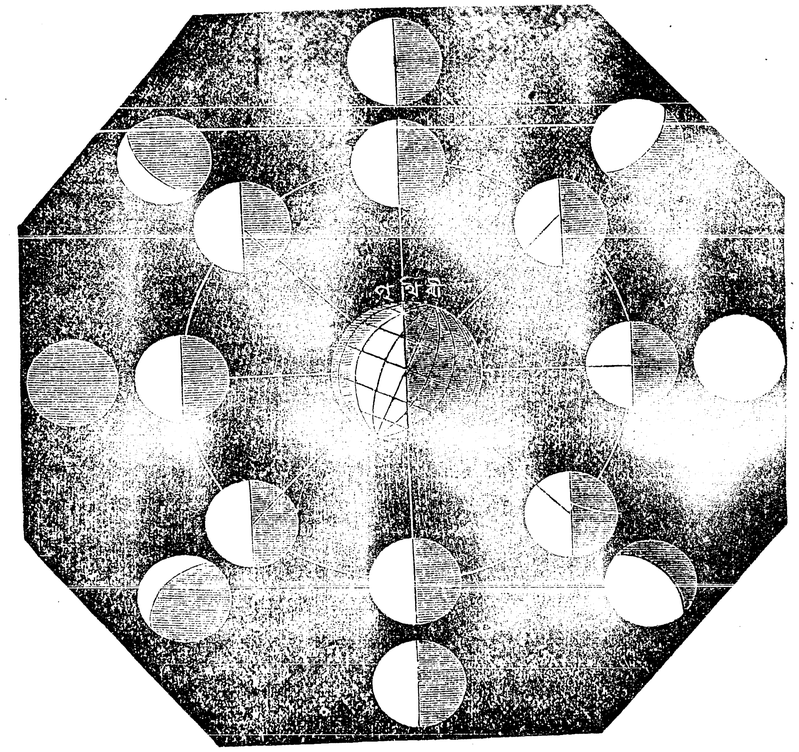

উহা আপন মেরুদণ্ডে একবার আবর্ত্তন করে। এই জন্য একটা বড় বিশেষ ঘটনা হয়। তাহা এই—আমরা পৃথিবী হইতে চন্দ্রের একটী মাত্র দিক দেখিতে পাই, কিন্তু উহার সকল দিকই সূর্য্যের দিকে ফিরে। এ বিষয়টী উদাহরণ ভিন্ন বুঝান যাইবে না। মনে কর ঘরের মধ্যে একটা গোল টেবিলে তুমি বসিয়া আছ, আর ঐ ঘরের কোণে গোপাল রহিয়াছে। আমি তোমার দিকে ফিরিয়া টেবিলটার চারিধারে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতেছি। তা'হলে তুমি একবারও আমার পশ্চাৎ দিক দেখিতে পাইবে না, কিন্তু গোপাল আমার সকল দিকই দেখিতে পাইবে। বরং পরীক্ষা করিয়া দেখিও। এখানেও ঠিক তাহাই হয়। গোপাল যেন সূর্য্য, তুমি পৃথিবী, আর আমি চন্দ্র। অর্থাৎ চন্দ্র এমনভাবে পৃথিবীকে বেষ্টন করে যে পৃথিবীর দিকে তাহার একভাগ মাত্র থাকে, উহার আর আধ খানা পৃথিবী হইতে কখনই দেখা যায় না। কিন্তু সূর্য্যের দিকে চন্দ্রের সকল ভাগই ফিরিতে পারে। ইহাতে কি হয়, বুঝিতেই ত পারিতেছ:—সূর্য্যের আলোকে চন্দ্রের সকল দিকই পর পর আলোকিত হয়, কিন্তু আমরা চিরকাল পূর্ণিমা দেখিতে পাই না। চন্দ্রের যে আধ খানা আমাদের দিকে ফিরান, যে দিন সূর্য্যের আলোকে সেই দিকটা সমস্ত আলোকিত হয় সেই রাত্রিতে আমরা গোল চাঁদ খানি আলোকিত দেখিয়া তাহার নাম দিই পূর্ণিমা। আর যে দিন ঠিক বিপরীত দিকে সূর্য্যকিরণ পড়ে সে দিন আমরা

চন্দ্রের আলোকিত অংশের একটুও দেখিতে পাই না ; সব টুকু আলোকিত অংশ আমাদের বিপরীত দিকে থাকে। সেই দিন সমস্ত রাত্রি অন্ধকার থাকে, আমরা বলি অমাবস্যার রাত্রি। এই দুটী দিন ছাড়া যে দিন চন্দ্রের আলোকিত অর্দ্ধাংশের যেটুকু আমাদের দিকে থাকে, সে দিন সেইটুকুই আমরা দেখিতে পাই। তাই বলি প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, ইত্যাদি।* এ সকল দিনেও চন্দ্রের সেই অর্দ্ধভাগ পৃথিবীর দিকে থাকে, কিন্তু চন্দ্রের ত আর নিজের আলোক নাই, তাই ঐ অর্দ্ধভাগের যেটুকু সূর্য্যের আলো পায় সেই টুকুই দেখিতে পাই, বাকী টুকু দেখা যায় না। যেমন দিনের বেলা নক্ষত্র সকল আকাশেই থাকে অথচ, সূর্য্যের উজ্জলতর কিরণে বায়ুমণ্ডল আলোকিত হয় বলিয়া ঐ সকল ক্ষুদ্র তারা দেখা যায় না ; তেমনি চন্দ্রের খানিকটা ভাগের উজ্জল আলোতে অন্ধকারময় ভাগটা দেখাই যায় না। তবু অমাবস্যার ২।১ দু এক দিন পরে যে কাস্তের মত সরু চাঁদ পশ্চিমদিকে উঠিতে দেখিয়াছি, তাহার উপরে অল্প আলোকিত চন্দ্রের অবশিষ্ট ভাগও দেখা যায়। ইহাতেই বুঝিতে পার যে চন্দ্রকে যে রাহুতে গ্রাস করে তাহা এই অন্ধকার বৈ আর কিছু নয়।

একটা অন্ধকার ঘরে একটী বাতি জ্বাল, ঐ বাতিটী তোমার পশ্চাতে রাখ, এবং তোমার সম্মুখে কিছু দূরে একটা বড় মাটির গোলা ধর। তাহলে ঐ গোলার সমস্ত গোল অংশটী তুমি আলোকিত দেখিবে। পূর্ণিমার দিনেও তাই হয়। সূর্য্য পশ্চিমে (অর্থাৎ পশ্চাতে) অস্ত গেল, আমাদের সম্মুখে (অর্থাৎ পূর্ব্বে) গোল হইয়া চন্দ্র উঠিতেছে। এই দিন চন্দ্রের যে ভাগ আমাদের দিকে থাকে, সূর্য্য তার সমস্তটাই আলোকিত করিতে পারে। আবার যদি তুমি ঐ গোলাটীর যে দিকে এখন আছ, ঠিক তাহার উল্টা দিক দিয়া গোলাটীর প্রতি চাও, দেখিবে যে তাহার সমস্তটা অন্ধকার হইয়া আছে ; যেদিকটাতে বাতির আলো পড়িয়াছে সেদিকের সমস্তটাই তোমার বিপরীত দিকে। অমাবস্যার রাত্রে তাই হয়। তখন পশ্চিমে সূর্য্য অস্ত যায় তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চন্দ্র ও চলে, আবার সূর্য্য পূর্ব্বে উদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রও উদয় হয়। সেদিন চন্দ্র ঠিক পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে থাকে। তাই ঐ মাটির গোলার মত চন্দ্রেরও আলোকিত অংশ আমাদের বিপরীত দিকে থাকে। তৃতীয়তঃ—ঐ বাতি তোমার পশ্চাতে রাখিয়া গোলাটীকে যদি ঠিক তোমার বাম বা দক্ষিণ (ডান) দিকে একটু দূরে রাখিয়া দাও, তবে দেখিবে যে আলোকিত অংশের অর্দ্ধেক ভাগ তুমি দেখিতেছ, তাহার আকার ঠিক অর্দ্ধচন্দ্রের মত। সপ্তমী অষ্টমী তিথিতে ঠিক এইরূপ ঘটে। ঐ দিনে যখন সূর্য্য অস্ত যায় তখন চন্দ্র মাথার উপরে থাকে ; মনে রাখিও এই তিথি অমাবস্যার পর। পূর্ণিমার পর সপ্তমীতে সূর্য্য উদয় হইবার সময়ে চন্দ্র মাথার উপর থাকে, সে দিন চন্দ্রও সূর্য্যের মধ্যে আধখানা আকাশ তফাৎ। কাজেই ঐ দিনে চন্দ্রের আকার ঐরূপ দেখা যায়। তা ছাড়া অন্য অন্য দিনেও যেরূপ কম বেশী দেখায়, আস্তে আস্তে ঐ গোলাটীকে তোমার চারিদিকে চন্দ্রের মত ঘুরাইলেই বুঝিতে পারিবে। যে পাঠক পাঠিকা সত্য সত্যই এরূপ করিয়া না দেখিবেন তিনি কখনই পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন না। আর পরীক্ষা দ্বারা বুঝিলে অতি সহজ হইয়া যাইবে। জ্ঞানলাভের জন্য যদি একটু কষ্ট করিতে হয় তাহাতে ভীত হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নয়। এই টুকু বুঝিতে পারিলে ক্রমে আমরা আরও অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিব ; যদি এ বিষয়ে কাহার কোন সন্দেহ থাকে এবং শিক্ষক বা অন্য কাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যদি তাহা দূর না হয় তবে তিনি আমাদিগকে লিখিলে সাধ্যমত তাহার উত্তর দিব।

* ছবি দেখ। মাঝ খানে পৃথিবী। তাহার চারিধারে চন্দ্র। পোনের দিনের ছবি দিলে অনেক গুলি হইয়া যাইত আর তোমরা ভাল বুঝিতে পারিতে না, তাই আট দিনের ছবি দেওয়া হইয়াছে। তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার "দু সা'র চন্দ্র কি করিয়া হইল ?" ইহার অর্থ এই :—ভিতরের সা'রটাতে চন্দ্রের যে অংশে আলো পড়িতেছে তাহা দেখান হইয়াছে। চন্দ্রের যে দিক পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া রহিয়াছে ঐ আলো সেই দিকের যে অংশ পর্য্যন্ত আসিয়াছে আমরা তাহাই দেখিতে পাই ; তাহার চেহারাটা কিরূপ দেখিতে হয়, বাহিরের সা'রে তাহাই আঁকা হইয়াছে। এক পাশে যে ছবিটী আঁকা হইয়াছে, তাহা সূর্য্য।

আখ্যান মালা।

নং ১

আরব দেশে একটী গল্প আছে যে, একদিন ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হইতেছে এমন সময়ে একটী উট ঝড় বৃষ্টিতে বহু কষ্ট পাইয়া একজন গৃহস্থের বাড়ীতে আশ্রয় পাইবার জন্য বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহস্বামী ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া কাজ করিতেছিলেন ; উট যাইয়া বলিল—"মহাশয় ! আমি সমস্ত দিন ঝড়ে ও বৃষ্টিতে কষ্ট পাইতেছি, এখন আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটু স্থান দেন তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হই।" গৃহস্বামী উত্তর করিলেন "আমার ঘরের স্থান বড়ই সংকীর্ণ ; আমার থাকিবার স্থানই নাই, কেমন করিয়া তোমার মত অত বড় জীবের স্থান আমার ঘরে দিই ?" উট কাতর স্বরে বলিল "সমস্ত শরীর আমি আপনার ঘরে রাখিতে চাহি না ; কেবল আমার মুখটী রাখিবার স্থান দিন ?" গৃহস্বামী উটের কাতরোক্তি শুনিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া উটের মুখ ঘরের ভিতর রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। উট আবার বলিল "আমার মুখ খানি বেশ সুখে আছে কিন্তু আমার সমস্ত শরীরটা জলে ভিজিয়া অসাড় হইতেছে ; যদি অনুগ্রহ করিয়া আরও একটু স্থান দেন তাহা হইলে শরীরের অর্দ্ধেকটা ঘরে রাখিয়া একটু সুখে থাকিতে পারি।" বৃদ্ধ গৃহস্বামী উটের দুঃখে গলিয়া গেলেন এবং তাহার কথায় সম্মতি দিলেন। উট ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া সমস্ত শরীরটা ঘরে রাখিবার জন্য প্রার্থনা করিল। প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল ; ছোট ঘরে দুই জনে কিছু কাল বহু কষ্টে রহিলেন। অল্পক্ষণ পরেই ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গেল। তখন গৃহস্বামী উটকে বলিলেন—"ঝড় বৃষ্টি এখন থামিয়া গিয়াছে, দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি হইতেছে মাত্র। এখন তুমি গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাও, আমি আমার কাজে প্রবৃত্ত হই।" উট এই কথায় বলিল "তোমার যদি কষ্ট হয় তুমি বাহিরে যাইতে পার, আমার বাহিরে যাইবার কিছুই দরকার নাই।"

এই গল্পটী অনেক কালের, তবে ইহা হইতে যে গভীর উপদেশ পাওয়া যায় তাহার জন্যই এই

গল্পটী উল্লেখ করিলাম। ইহা হইতে এই উপদেশ পাওয়া যায় যে, দুষ্ট প্রকৃতিকে একবার অবলম্বন করিলে শেষে তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না। এইরূপ দেখা গিয়াছে যে, অনেক বালক একটী সামান্য মিথ্যা কথা বলা বা সামান্য দ্রব্য চুরি করাকে আদোবে অন্যায় মনে করে না; ভাবে যে ছেলে বেলায় কৃত এই দোষ বড় হইলে শুধরাইয়া যাইবে। যাহারা ছেলে বেলা হইতেই এই রূপ করে বা এইরূপ করাকে অন্যায় মনে করে না তাহারাই আস্তে আস্তে শেষে ভয়ানক দুষ্কর্ম্মে রত হয় এবং সেই অবস্থা হইতে তখন ভাল হইবার চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

যাহা কিছু অন্যায় তাহা প্রথম হইতেই ত্যাগ করা উচিত, একবার দুষ্কার্য্যকে প্রশ্রয় দিলে শেষে তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া বড় সহজ নহে।

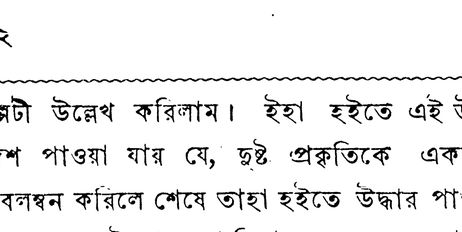

নং ২

জর্ম্মন দেশে একটী গল্প আছে যে, একদিন নদীতীরে একটী ইন্দুর কি উপায়ে সেই নদীটী পার হইতে পারে মনে মনে তাহাই ভাবিতেছিল; এমন সময়ে সেই স্থানে একটী ধূর্ত্ত ভেক আসিয়া উপস্থিত হইল। ভেক ইন্দুরকে বলিল "তুমি কি ভাবিতেছ?" ইন্দুর মনের ভাব প্রকাশ করিল। ধূর্ত্ত ভেক ইন্দুরকে পার করিয়া দিতে স্বীকৃত হইল; এবং ইন্দুরের লেজে এক দড়ি বাঁধিয়া তাহার অপর পার্শ্ব দ্বারা নিজের কোমর বাঁধিল। এই প্রকারে ইন্দুরকে বাঁধিয়া পীঠের উপর চড়াইয়া ভেক মহাশয় জলে নামিলেন এবং সাঁতার কাটিয়া যাইতে লাগিলেন। মধ্যস্থানে যাইয়া ইন্দুরকে মারিবার জন্য ভেক মহাশয় জলে ডুব দিলেন; ইন্দুর ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং বলিল "কর কি? এরূপ ভাবে আমাকে মারা কি উচিত? আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, এখন তোমার কি আমার প্রতি এরূপ নৃশংস ব্যবহার করা উচিত?" ভেক মহাশয় হাস্য করিয়া বলিলেন "সকল লোকই অনেক বড় বড় কথা বলে, কিন্তু কাজের বেলায় কেহই কথা রাখে না। মুখে বলিলেই যে কাজ করিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই।" এই বলিয়া ধূর্ত্ত ভেক ইন্দুরকে অন্তিম কাল স্মরণ করিতে বলিল। ইন্দুর বেগতিক দেখিয়া অনন্যমনে অন্তিম কালের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এমন সময়ে আকাশ হইতে একটী পক্ষী ছোঁ দিয়া দুই জনকেই লইয়া গেল। পক্ষীটী ভেককে বলিল "তুমি কি করিতেছিলে? এবং তোমাকে কিসের জন্যই বা এখানে আসিতে হইল?"

ভেক কহিল "ধূর্ত্ততার জন্যই আমার এখন এরূপ দুরাবস্থা; নিরপরাধী ইন্দুরকে বধ করিয়া তামাসা দেখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম বলিয়াই এখন আমার এই দুর্দ্দশা—" পক্ষী ভেককে আর বেশী কথা বলিতে না দিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে উদরসাৎ করিয়া ফেলিল।

যে পরের সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করে তাহার সাজা ভগবান্ দেন। নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে কখনও ক্লেশ দিওনা, অকারণে কাহারও মনে কখনও ক্লেশ দেওয়া ভয়ানক অন্যায়; যাহারা এরূপ

করে তাহারা ইহার শাস্তি নিশ্চয়ই ভোগ করিবে।

বেলুন।

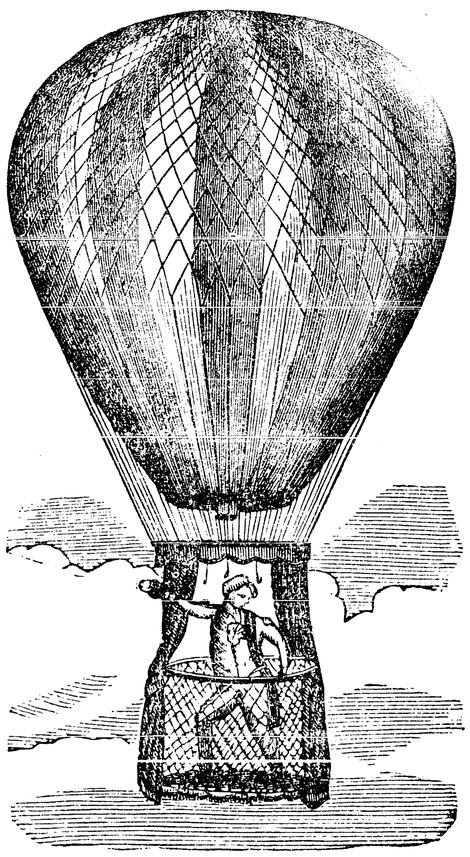

তোমাদের অনেকেই বেলুন দেখিয়াছ। আসল বেলুন না দেখিয়া থাকাই সম্ভব, কিন্তু বেলুনের নকল সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। বেলুনে চড়িয়া মানুষ আকাশে উঠে একথাও অনেকে শুনিয়া থাকিবে। অনেক সময় হয়ত তোমরা কেহ কেহ ভাবিয়াছ যে, ওরূপ একটা বেলুনে চড়িতে পারিলে না জানি কি মজাই হয়! তোমাদিগকে বেলুনে চড়াই, আমার তেমন সাধ্য নাই, কিন্তু যাহাতে তোমরা চারি পাঁচ দিন স্বপ্নে পড়িয়া বেলুনে চড়িতে পার আজ একটা পুস্তক হইতে তাহারই কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা করা যাইতেছে।

ইউরোপে জোজেফ্ মণ্ট্‌গল্‌ফিয়র এবং ষ্টীভ্‌ন্ মণ্ট্‌গল্‌ফিয়র নামে দুই ভাই থাকিতেন, তাঁহারাই প্রথমে বেলুন উড়াইতে শিখেন। তাঁহারা দেখিলেন যে ধোঁয়া ঊর্দ্ধে উঠে। ইহাতে তাঁহারা মনে করিলেন যে, ধোঁয়াকে যদি খুব হাল্‌কা একটা থ'লের ভিতর পূরিয়া দেওয়া যায়, তবে ঐ থ'লেটাও ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঊর্দ্ধে উঠিবে। এই মনে করিয়া তাঁহারা একটা কাপড়ের থ'লে প্রস্তুত করিলেন এবং তাহাকে একটু উচ্চ স্থানে রাখিয়া তাহার নীচে আগুন জ্বালাইয়া দিলেন। কিছুকাল পরেই বেলুনটা উঠিতে লাগিল এবং প্রায় দেড় মাইল দূরে গিয়া মাটিতে পড়িল।

মণ্ট্‌গল্‌ফিয়রদের এই অদ্ভুত কীর্ত্তির বিবরণ লোকে শুনিয়া শুনিয়া হাঁ করিয়া থাকিতে লাগিল—অনেকে বিশ্বাস করিল না। পারিস্ নগরে মস্থ চার্ল্‌স্ নামে একজন লোক থাকিতেন, তিনি কিন্তু এরূপ করিলেন না। তিনি মনে করিলেন যে শুধু ধোঁয়ার মধ্যে এমন কিছু থাকিতে পারে না যে, তাহাতে বেলুনটাকে ঠেলিয়া আকাশে তুলিতে পারে। ধোঁয়াটা যতক্ষণ খুব গরম থাকে, ততক্ষণ সেটা বাতাসের চাইতে অনেক হাল্‌কা থাকে। হাল্‌কা থাকে বলিয়াই বেলুনটাকে ঠেলিয়া তুলিতে

পারে। এই প্রকার চিন্তা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বাতাসের চাইতে হাল্‌কা অন্য কোন জিনিস দিলেও ঐরূপ হইবে। তিনি কাপড়ের একটা বেলুন প্রস্তুত করিলেন। বেলুনের ভিতর হইতে বাতাস যেন পলাইতে না পারে, এই জন্য তাহাতে বেশ করিয়া ভাল আটা মাখাইয়া দিলেন। এই বেলুনের ভিতর জলজান বায়ু পূরিয়া তাহাকে শূন্যে উড়াইবেন সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি পারিস্ নগরে বিজ্ঞাপন দিলেন যে, '২৭ এ আগষ্ট (১৭৮৩) আমি একটা প্রকাণ্ড গোলাকার জিনিস শূন্যে ছাড়িয়া দিব; আর সে

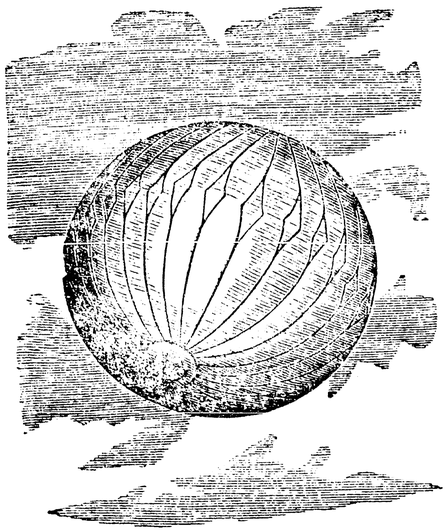

আপনা আপনি উর্দ্ধে চলিয়া যাইবে।' যে স্থান হইতে উড়াইবার কথা হইল, ২৭এ আগষ্ট সেখানে লোকে লোকারণ্য। যাহারা সেখানে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই চার্ল্‌স্ সাহেবের কথায় বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিল। তাহারা মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিল যে পক্ষী ফড়িং ছাড়া আর কোন জিনিস আপনা হইতেই উর্দ্ধে উঠিতে পারে না। চার্ল্‌স্ সাহেবের গোলাকার জিনিসটা যখন উঠিতে না পারিয়া মাটিতে পড়িয়া যাইবে, তখন তাঁহাকে কিঞ্চিৎ উত্তম মধ্যম উপদেশ প্রদানের যুক্তিও স্থির করিয়া আসিয়াছিল। নিরূপিত সময়ের একটু পূর্ব্বেই অনেকে অধৈর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিল। যখন ছাড়িবার সময় হইল তখন যে দড়িদ্বারা বেলুন বাঁধাছিল তাহা খুলিয়া দেওয়া হইল; আর দেখিতে দেখিতে সেই প্রকাণ্ড জিনিসটা তিন হাজার ফিটেরও বেশী উর্দ্ধে উঠিয়া গেল। দর্শকগণের মনে তখন কিরূপ ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ফ্রান্স্ দেশের একটী ছোট গ্রামে বেলুনটী পড়িল। সেখানকার লোকেরা মনে করিল, এটা না জানি একটা কি? উচ্চ হইতে নীচে পড়িবার সময় সকল জিনিসই লাফায়; বেলুনটাও সেইরূপ লাফাইতে লাগিল। সহরে যে বেলুন উড়ান হইয়াছে, এ গ্রামের অধিবাসিগণ তাহা জানিত না; সুতরাং এ সব দেখিয়া তাহারা মনে করিল যে এ জানোয়ারটা একটা মস্ত পাখী বই আর কিছুই নহে। চারি ধারে গণ্ডী করিয়া লোকের সার দাঁড়াইয়াছে; বুকের ভিতর একটু একটু গুর্ গুর্ করিতেছে। ইচ্ছা আছে জানোয়ারটীকে দুই একটা খোঁচা দিয়া তামাসা দেখে, কিন্তু সাহস হইতেছে না—পাছে ঠোক্‌রায়! শেষে কয়েকজন সাহসী লোক অনেক কষ্টে কোমর বাঁধিয়া অনেক বার অগ্রসর এবং অনেকবার পশ্চাৎপদ হইয়া অল্পে অল্পে তাহার কাছে আসিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে যে খুব সাহসী সে খোঁচা দিবার উপযোগী একটা যন্ত্র হাতে লইয়া অগ্রসর হইল। একবার এদিক একবার ওদিক হইতে সেই যোদ্ধা বিস্তর সংগ্রামকৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিল। শেষে সাহসে

নির্ভর করিয়া প্রাণপণে জানোয়ারের গাত্রে অস্ত্রাঘাত করিল; অমনি সেটা ফোঁস ফোঁস শব্দ করিতে লাগিল, আর যে দুর্গন্ধ—গ্রামবাসীরা রণে ভঙ্গ দিল। কিছু কাল পরে জানোয়ারটা যেন খুব শুট্‌কাইয়া গেল; তখন তাহারা মনে করিল যে এবারে আঘাত সাংঘাতিক হইয়াছে। অবিলম্বে জানোয়ারকে বন্দী করতঃ গ্রামবাসী ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের নিকট লইয়া যাওয়া হইল। তাঁহারা দেখিয়া বলিলেন ইহা এতাবৎ কাল অপরিজ্ঞাত জন্তু বিশেষের চর্ম্ম।''

প্রথম বারেই এইরূপ সুন্দর ফল লাভ করিয়া চার্ল্‌স্ সাহেবের সাহস বাড়িল। তিনি আর

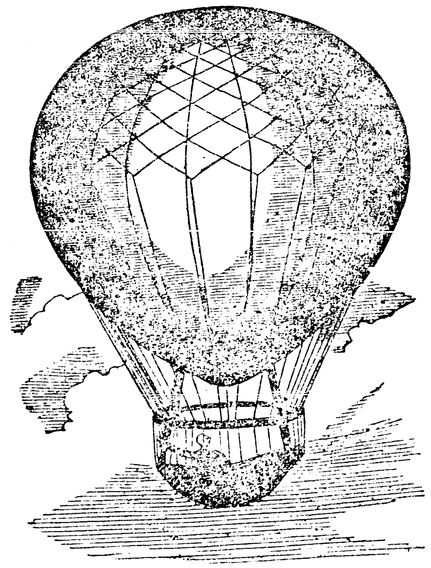

একটা বেলুন প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক আকাশে উঠিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

ক্রমশঃ।

চন্দ্রমুখীর সাজা।

একজন ভদ্রলোক জানোয়ার পুষিতে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার বাড়ীতে তিন চারিটী কুকুর, একটী বানর, দুই তিনটী খরগোস, ও অনেকগুলি বিড়াল ছিল। ভদ্রলোকটীর বাড়ীতে জায়গা বড় বেশী নয়। একটী ছোট উঠানে তাঁহার পালিত পশুগুলিকে সর্ব্বদাই খেলিতে হইত; সুতরাং তাহারা সকলে এক সঙ্গে খেলা করিত। সে বাড়ীতে কেহ বেড়াইতে আসিলে, আশ্চর্য্য হইয়া বলিত; বাঃ! বানর কুকুর বিড়াল খরগোসে একত্র খেলাইতে কখনও দেখি নাই।

সকলের বড় কুকুরটীর নাম ভুলো। সে একটী প্রকাণ্ড বিলাতি কুকুর, কিন্তু বড় ভাল মানুষ। সে বেচারা তাহার সঙ্গীদের অনেক উপদ্রব সহ্য করে। বানরটী তাহাকে কখনও কখনও ঘোড়া করে, তার ঘাড়ে চড়িয়া বসে, কখনও তাহার লেজ ধরিয়া টানে, কখনও তার কাণ মলিয়া দেয়। আবার কখনও বা আদর করে। ভুলো চারি হাত পা ছড়াইয়া চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া থাকে, আর বানরটী তার উকুন বাছিয়া দেয়; তাহার লেজটী উলটিয়া পালটিয়া পরীক্ষা করে, তাহার তল পেট চুলকাইয়া দেয়, ভুলোর তাহাতে বড় আনন্দ। বানরটীর নাম মহাবীর। ভুলো মহাবীরের প্রতি বড় কৃতজ্ঞ। সে মাঝে মাঝে ভাল ভাল খাবার জিনিস পাইলে নিজে না খাইয়া মুখে করিয়া মহাবীরকে আনিয়া দেয়। বিড়াল গুলির মধ্যে একজন গিন্নী, অন্য গুলি তার ছেলে মেয়ে। তাহারা সেই বাটীতেই জন্মিয়াছে। মহাবীর তাহাদের সকলকেই কোলে পীঠে করিয়া মানুষ

করিয়াছে। ছানাগুলি যত দিন ছোট থাকে, মহাবীর তাহাদিগকে বড় ভাল বাসে। সর্ব্বদাই একটী না একটী ছানা বগলে থাকে। ছানাগুলির এমনি অভ্যাস হয় যে, তাহার মায়ের মুখে যেমন সুখে ঝোলে, মহাবীরের বগলেও তেমনি আরামে থাকে। মধ্যে মধ্যে মহাবীর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দুধের ঢাকা খুলিয়া ছানাগুলিকে দুধ পান করান। দুই একবার এইরূপ ধরা পড়াতে, তাঁহার কোমরের দড়ি প্রায় খুলিয়া দেওয়া হয় না। ছানাগুলি বড় হইলে মহাবীরের আর ততটা ভাল বাসা দেখা যায় না; তখন আর দিন রাত্রি বগলে করিয়া বেড়ান না কিন্তু তাহাদের সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি থাকে। তাহারা পরস্পর কামড়া-কামড়ি করিলে মহাবীর তৎক্ষণাৎ গিয়া বিবাদ ভাঙ্গিয়া দেন।

খরগোস গুলি পথে ঘাটে লোহিত বর্ণ চক্ষু উল্টাইয়া শুইয়া থাকে; বিড়ালের ছানাগুলি তাহাদের লম্বা লম্বা কাণ লইয়া খেলা করে, তাহাতে তাহাদের বিরক্তি নাই। বিড়ালদের গিন্নীও কখনো কখনো আসিয়া খরগোস গিন্নীর কাছে শুইয়া লেজটী নাড়িয়া ছানাদিগকে খেলা দিয়া থাকেন।

কুকুরদের মধ্যে সকলের ছোট একজন আছে, তাহার নাম "পেমা"। সে কিছু লোভী। অন্য সময়ে সে বেশ খেলা করে, বেশ লাফায়, বেশ ছুটা-ছুটী করে। বিড়ালের ছানাদের মুখের কাছে খেউ খেউ করিয়া তাহাদের ছোট ছোট হাতের থাবার প্রহার খাইতে ভাল বাসে। মহাবীরের কাঠের ঘরের ছিদ্রের ভিতর মুখের অগ্রভাগ পুরিয়া দিয়া কৌতুক করে। এ সকল বেশ, কিন্তু আহারের সময় সে আর এক মূর্ত্তি ধারণ করে। যখন সে ক্ষুধাতে খেঁকি হইয়া থাকে, এবং আহার করিতে আরম্ভ করে তখন তাহার নিকট যায়, কাহার সাধ্য! দশ হাতের মধ্যে একটী পায়রা চরিতে আসিলে তাহাকে তাড়া করে। তখন কাহারও নিস্তার নাই; ছোট বড় জ্ঞান নাই; সকলকেই কামড়াইতে যায়। এই জন্য তাহাকে স্বতন্ত্র খাবার দেওয়া হয় এবং তাহার সঙ্গীদের কেহই তাহার নিকটে যায় না। বেচারা ভুলো ভাল মানুষ, সে রাক্ষসের মত তাড়াতাড়ি নাকে মুখে কতক গুলো গিলিতে পারে না। এই জন্য পেমার জ্বালায় তাহাকে কখনও কখনও আধ পেটা থাকিতে হয়। কোন কোন দিন পেমার নিজের খাবারে পেট ভরে না, সে তাড়াতাড়ি আপনার খাবার খাইয়া ফেলিয়া ভুলোর পাত্র আক্রমণ করে, ভুলো বেচারা যখন দেখে যে ছোট ভাইটীর পেট ভরে নাই, ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আসিয়াছে, অমনি মুখটী সরাইয়া লয় ও নিজের খাবার তাহাকে খাইতে দেয়।

এইরূপ কয়জনে সুখে বাস করিতেছে, একদিন কর্ত্তা বাবু একটী সুন্দর বিড়াল আনিলেন। তাহার রূপ অতি চমৎকার। চক্ষু দুটীতে যেন মাণিক জ্বলিতেছে; লোমগুলি নরম নরম, গলাতে পুঁতীর মালা, পেটের তলাটী মেজেণ্টার দিয়া রঙ্গান। দেখিলেই বোধ হয় বড় সুখী বিড়াল, যেন ননির পুতুলটী। ভিতরকার কথা এই, সেটী এক আঁট কুড়ো ঘরের বিড়াল। একটী বিধবা স্ত্রীলোক তাহাকে পুষিয়াছিলেন। তাঁহার আর কেহই ছিল না; সুতরাং দুধটুকু সরটুকু ঘরে যখন যাহা হইত সমুদায় "চন্দ্রমুখী" পাইত। ঐ বিধবা তাহাকে চন্দ্রমুখী বলিয়া ডাকিতেন। চন্দ্রমুখী সর্ব্বদাই লেপ ও বালিশের উপরে শয়ন করিয়া ঘোঁড় ঘোঁড় করিত। একটী দিনের জন্য কাদাতে পা দেয় নাই, বৃষ্টিতে ভিজে নাই। বৃষ্টি

আসিলে সে লেজটী গুটাইয়া পা দুখানি পাতিয়া ঘরের দ্বারে বসিয়া বৃষ্টি দেখিত ও মাঝে মাঝে গা, হাত, পা চাটিত, জলের ত্রিসীমায় যাইত না। চন্দ্রমুখীর রুচিটী নবাবের মত হইয়াছিল। সে ছোটলোকের মত ডাল ভাত খাইতে পারিত না, ডাঁটা নাক দিয়া শুকিতও না; হয় দুধ না হয় মাছ দিয়া ভাত খাইত, তাও মাখিয়া না দিলে তাহা স্পর্শ করিত না। বিধবা নিজে মাছ খাইতেন না, কিন্তু চন্দ্রমুখীর জন্য ভাল ভাল মাছ কিনিয়া আনিতেন; সুতরাং চন্দ্রমুখী একলা ঘরের একলা মেয়ে, সে সেই সমুদায় মাছ একলা খাইত। এই রূপে সুখে স্বচ্ছন্দে চন্দ্রমুখীর দিন যাইতেছিল, হঠাৎ বিধবাটীর গুরুতর পীড়া হইয়া মৃত্যু হইল। সুতরাং চন্দ্রমুখী পরের হাতে পড়িল। আমাদের কর্ত্তা বাবুটী বড় জানোয়ার-ভক্ত; সুতরাং ঐ বিড়ালটী যত্ন করিয়া বাড়ীতে আনিলেন। কিন্তু আনিয়া যেই উঠানে ছাড়িয়া দিলেন, ভাবিলেন ভুলো ও মহাবীরের সহিত পরিচয় করিয়া দিবেন, অমনি চন্দ্রমুখী আর এক মূর্ত্তি ধরিল। ভুলো নিকটে আসিবা মাত্র লেজ ফুলাইয়া ও গায়ের লোম খাড়া করিয়া দাঁড়াইল, পেমা নবাগত বন্ধুর সহিত কৌতুক চলিবে কিনা পরীক্ষা করিবামাত্র তাহাকে থাবা মারিল, এবং অন্য বিড়ালগুলিকে দেখিবামাত্র গর্জ্জন করিয়া বিবাদ আরম্ভ করিল। গৃহস্বামী দেখিলেন বড় বিপদ; তাঁহার শান্তির সংসারে অশান্তি আসিল। ভাবিলেন সময়ে চন্দ্রমুখী একটু ভদ্রতা শিখিবে। দুই চারিদিন তাহাকে দূরে দূরে রাখিলেন, অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু সে সঙ্গীদের সহিত কোন ক্রমেই মিশিতে চাহিল না। পেমা খেলানে বালক, তাহার অগম্য স্থান বাড়ীতে ছিল না। চন্দ্রমুখী কোন কোণে বা বিছানার পার্শ্বে শুইয়া আছে পেমা সেখানে আসিত; আর চন্দ্রমুখী তাহাকে থাবা মারিয়া অপমান করিয়া তাড়াইত। গৃহস্থ মধ্যে মধ্যে সকলের খেলা দেখিবার জন্য সকলকে ঘরের মধ্যে আনিতেন, তখন চন্দ্রমুখী জানালা দিয়া বাহির হইয়া যাইত এবং বাড়ীর মধ্যে একপার্শ্বে গিয়া শয়ন করিয়া থাকিত।

ক্রমে চন্দ্রমুখীর আরও অনেক বিদ্যা প্রকাশ পাইল। একটী খাঁচাতে গৃহস্থের একটী পাখী ছিল, তিনি তাহাকে স্নান করাইয়া মধ্যে মধ্যে মাটিতে রৌদ্রে বসাইয়া রাখিতেন। চন্দ্রমুখী তাহাকে ধরিবার জন্য খাঁচার উপরে ঝাঁপ দিয়া পড়িত। গৃহস্থ দেখিয়া বলিতেন—হাঁ তাইত কোন গুণ নাই, এটীত বেশ আছে! চন্দ্রমুখীর দ্বিতীয় বিদ্যা চুরি করা। সে দুধের ঢাকা খুলিয়া মধ্যে মধ্যে চুরি করিয়া দুধ খাইত।

এক দিন চন্দ্রমুখীর স্বার্থপরতার প্রতিফল ফলিল। সেই দিন গৃহস্থ খেলা করিবার জন্য ঘরের মধ্যে পশুগুলিকে আনিবামাত্র চন্দ্রমুখী জানালা দিয়া বাহির হইয়া গেল। সে দিন তাহার এত অসহ্য হইল যে, সে সে বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া অন্য এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে যাইবে মনে করিল। কিন্তু যেই যাইবার জন্য পথে বাহির হইল অমনি তীরের বেগে এক বিলাতি কুকুর আসিয়া একেবারে তাহার ঘাড়ে কামড়াইয়া ধরিল। সে কুকুরটী নিজের প্রভুর সহিত পথ দিয়া যাইতে ছিল, সে বড় দুরন্ত। চন্দ্রমুখীর বিপদ সূচক আর্ত্তনাদ উঠিবা মাত্র ভুলো গৃহের ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু আসিয়া যখন দেখিল চন্দ্রমুখীকে বিনাশ করিতেছে, আর যেন তাহার উৎসাহ হইল না। সে নিজে বিলাতী কুকুর, গায়ে যথেষ্ট জোর ছিল,

মনে করিলে চন্দ্রমুখীকে শত্রুমুখ হইতে উদ্ধার করিতে পারিত, কিন্তু তাহার যেন সে উৎসাহ হইল না। সে আসিয়া দেখিয়াই দূরে দাড়াইয়া রহিল ও আবার বাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। গৃহস্বামী চন্দ্রমুখীর আর্ত্তনাদ শুনিতে পান নাই; কেবল ভুলো হঠাৎ ছুটিয়া গেল কেন এই বলিয়া কারণ জানিবার জন্য দ্বারের দিকে যাইতেছিলেন, দেখিলেন ভুলো ফিরিয়াছে, তখন তিনিও ফিরিলেন। অবশেষে চাকরেরা চন্দ্রমুখীর রক্তাক্ত মৃত দেহ আনিয়া উপস্থিত করিল। গৃহস্থ বড় একটা দুঃখিত হইলেন না, বলিলেন "স্বার্থপর বিড়ালটা আচ্ছা সাজা পাইয়াছে।" চন্দ্রমুখী যে মরিল তাহাতে কাহারও এক বিন্দু কষ্ট হইল এরূপ বোধ হইল না। সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল, "আচ্ছা যে ভুলো সে দিন পেমাকে বাঁচাইবার জন্য বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়াছে সে আজ কিছু বলিল না কেন?" ভুলো মনে মনে ভাবিল "যে আমাদিগকে দেখিতে পারেনা, তাহার জন্য মরিব কেন?"

এইত দেখিলে চন্দ্রমুখীর দশা। ভুলোর মৃত্যু শয্যার ছবি একবার দেখ। কিছুদিন পরে বেচারা ভুলোর কি এক প্রকার পীড়া হইল; আহার করিতে চায় না, সর্ব্বদা বমন করে, যেখানে সেখানে শুইয়া থাকে; গায়ের লোম গুলি ঝরিয়া যাইতে লাগিল; পোকার কামড়ানিতে সর্ব্বদা মাটিতে গা ঘষিত, বাড়ী শুদ্ধ সকলের অসুখ। পেমা আগে বুঝিতে পারে নাই, ভাবিয়াছিল বুঝি সুখ করিয়া শুইয়া আছে। কিন্তু শেষে যখন বুঝিল যে ভুলো পীড়িত তখন আর কাছ ছাড়ে না, সর্ব্বদা আসিয়া শুঁকিয়া থাকে। মহাবীর বড় অপ্রসন্ন। গৃহস্বামীর ত কথাই নাই, তিনি স্বয়ং স্বহস্তে সাবান দিয়া ভুলোর গা পরিষ্কার করিয়া দেন; তাঁহার কন্যাগণ পোকা বাছিয়া দেয়; তাঁহার গৃহিণী ভুলোর মুখে চুম্বন করেন, বলেন—"বাপধন! তোমার কি হয়েছে? অমন করে পড়ে আছ কেন।" যে সময়ে ভুলোর প্রাণবায়ু দেহকে পরিত্যাগ করিল, তখনকার কি ভাব! সমুদায় পশুগুলি বিষণ্ণ বদনে চারি দিকে ঘিরিয়া বসিয়াছে, গৃহস্থের চক্ষে জলধারা বহিতেছে; বাটীতে ছেলে মেয়ে মরিলে বাটীর লোক যেমন কাঁদে তেমনি গৃহস্থের পত্নী ও কন্যাগণ কাঁদিতেছেন। স্বার্থপর চন্দ্রমুখীর মরণে কেহ একটী নিশ্বাসও ফেলে নাই; আজ ভুলোর মৃত্যুতে কত লোকের চক্ষে জল পড়িতেছে।

চন্দ্রমুখী ও ভুলো, এই দুই জনের মধ্যে পাঠক পাঠিকাগণ কাহাকে অধিক ভাল বাসিলেন জানিলে সুখী হইব।

(প্রাপ্ত।)

চোর বিড়াল!

১

এক বাটী দুধ রেখে ভাঙা ডালা-তলে,
"ঘোষ পিসী" গিয়াছে কোথায়।
"সুসময়" বুঝি পুশি চুপে চুপে চলে,
উপনীত হইল তথায়।

২

এদিক ওদিক চেয়ে লোক নাহি হেরি
বিড়ালের কি আনন্দ আজ।
"জয় জনার্দ্দন!" বলি চক্ চক্ করি
আরম্ভিল আপনার কাজ!

৩

"চক্ চক্" সর গেল, আধা দুধ যায়
হায় হরি! পাপীর কপালে
সুখ ভোগ কখনই চিরস্থায়ী নয়,
তাই চারু এল হেন কালে!

৪

চারু সে "দুরন্ত ছেলে" জল খেতে এসে
দেখিল সকল পাতি আড়ি,
নিকটে আছিল লাঠি তাই লয়ে ক'সে
মারে এক দোহাতিয়া বাড়ি!

৫

"মেও মেও" করে পুশি বাটী ছেড়ে যায়
বড়ই লেগেছে গায়ে ব্যথা,
রাগ ক'রে কতবার চারু পানে চায়
হতভাগা কেন এল হেথা!

৬

ভাবে পুশি চারু গেলে বুঝিব আবার
নাহয় সহিব আর বাড়ি
কেমনে ভুলিব আহা! ও দুদের তার
কেমনে যাইব বাটী ছাড়ি?

৭

চারু বলে, চোর পুশি! কি সাহস তোর,
দিন দু পহরে কর চুরি?
আর এক বাড়ি দিয়ে ঘুচাইব জোর
চোরে আমি বড় ঘৃণা করি!

৮

শোনেনি বোঝেনি যেন, এইরূপে পুশি
মধুর করুণ গীতি গায়;
তবু চারু চলে যাবে ভেবে মহা খুসি!
তবু সেই বাটী পানে চায়!

৯

হেনকালে—যে কুকুরে চারু ভালবাসে
সেই এসে উঠানে ডাকিল
কুকুরে হেরিয়া চারু স্নেহভরে হাসে
দুদ টুকু তারে নিয়ে দিল।

১০

তখন নিরাশ চিতে বিড়াল বুঝিল
"পাপ আশা,—তাই পুরিল না!
চোর বলি চারু মোরে এতই মারিল
আর আমি চুরি করিব না।"

১১

দু একটী ছেলে আছে বিড়ালের মত
দিবা নিশি কত সাজা পায়
আপনার দোষে হায় রোগ ভোগে কত
তবু তারা চুরি ক'রে খায়।
আমারে মনের কথা চুপে চুপে কও
পাঠক পাঠিকা! ভাই তোমরা তো নও?

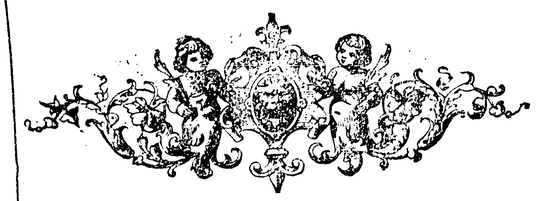

কেমন ছবি এঁকেছি?

য়ারাম কলিকাতার সিটি স্কুলে পড়ে। পাঠকদিগের মধ্যে যাহারা সিটি স্কুলে পড় তাহারা জান যে সিটি স্কুলে চিত্র বিদ্যা (drawing) শিক্ষা

দেওয়া হয়। আমাদের গয়ারাম কখনও চিত্রের ক্লাসে যায় না, চিত্র কাহাকে বলে তাহাও জানে না; অথচ তাহার মনে মনে একটা ভারি অহঙ্কার আছে যে, সে ইচ্ছা করিলেই ভাল ছবি আঁকিতে পারে। গয়ারামের সকল দিকেই এই রকম; সে ক্লাসে বসিয়া পড়ার সময় গল্প করে, শিক্ষক পড়া জিজ্ঞাসা করিলে হাঁ করিয়া থাকে, একটী কথাও বলিতে পারে না; শিক্ষক তিরস্কার করেন, সে চুপ করিয়া শুনে। অথচ তার মনে মনে অহঙ্কার আছে যে, সে সব জানে; তবে যে শিক্ষকের নিকট প্রত্যহ সে গালি খায় সে তাহার কপালের দোষ। একদিন তাহাদের ক্লাসের নরেন্দ্র একটা ঘোড়ার ছবি আঁকিয়াছিল; ছবি খানি এত সুন্দর হইয়াছিল যে, সকলেই তাহাকে খুব প্রশংসা করিল, এমন কি শিক্ষক মহাশয় পর্য্যন্ত তাহার প্রশংসা করিলেন। এই সমস্ত দেখিয়া আমাদের গয়ারামেরও বড় সাধ হইল, সে ছবি আঁকিয়া সকলের প্রশংসা লইবে। পূর্ব্বেই

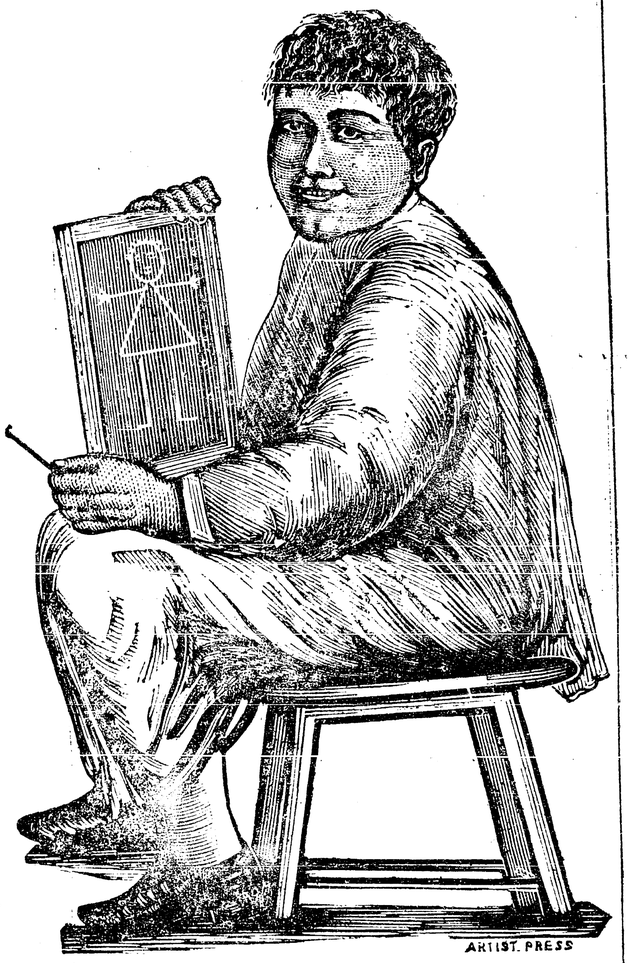

বলিয়াছি, গয়ারাম কখনও ছবি আঁকে নাই, কিন্তু তাহার বিশ্বাস, সে ইচ্ছা করিলেই ছবি আঁকিতে পারে; এখন এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া সে ছবি আঁকিতে বসিল; নরেন্দ্র ঘোড়া আঁকিয়া বাহবা লইয়াছে, গয়ারামের ইচ্ছা হইল সে মানুষের ছবি আঁকিয়া আরও অধিক প্রশংসা লইবে। যে কখনও ছবি আঁকে নাই, সে যে একেবারেই মানুষ আঁকিবে তাহা কত অসম্ভব তাহা সহজেই বুঝিতে পার; কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি গয়ারামের অহঙ্কার বড় বেশী, তাই সে একেবারেই মানুষ আঁকিতে বসিয়াছে। বাঃ! কি চমৎকার ছবিই হয়েছে! যেমন বিদ্যে, তেমনিই হয়েছে। ক্লাসের ছেলেরা ত হো হো ক'রে হেসে হাত তালি দিতে লাগিল।

আমাদের গয়ারামের বুদ্ধি একটু মোটা, সে ঠাট্টা বুঝিল না, ভাবিল বুঝি তাহারা বাহবা দিতেছে। আমাদের পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে যদি গয়ারামের মত কেহ থাক তবে দেখিয়া শেখ। শুধু ছবি আঁকা কেন, সকল দিকেই এই রকম গয়ারাম দেখিতে পাওয়া যায়। নিজে যাহা জান না তাহার অহঙ্কার করিও না, গয়ারামের মত তোমা-

কেও দেখিয়া সকলে হাসিবে। নিজের যাহা আছে তাহা অপেক্ষা আপনাকে বড় মনে করিও না, করিলে পদে পদে ঠকিবে; প্রশংসা পাইবার জন্য কোন কাজ করিবে না, প্রশংসার আশায় কাজ করিলে তাহাতে কখনও প্রশংসা পাওয়া যায় না। তার পর ভাল ছবিই আঁকিতে চাও, আর ক্লাসের সকলের চেয়ে পড়া শুনাতেই ভাল হইতে চাও, বা খুব বড় পদ পাইয়া সকলের মান্য গণ্য হইতে চাও, দশ জনের এক জন হইতে চাও, তবে কয়েকটী কথা মনে রাখিতে হইবে। যাহাই করিতে চাও, প্রথমতঃ খুব আগ্রহ,—ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা দরকার; তার পর সেই কাজ করিবার নিমিত্ত যত্ন, উৎসাহ ও অধ্যবসায় থাকা দরকার। তার পর যাহা করিবে গোড়া হইতে আরম্ভ করিবে, একেবারেই গাছের ডগায় উঠা যায় না, পত্তন ভাল না হইলে কোন কাজই হয় না। তার পর আরও একটী চাই, সেটী ধৈর্য্য; ব্যস্ত হইলে কোন কাজ হয় না, ধীরে ধীরে কাজ করিতে হয়, একবারে না হইলে দশ বার চেষ্টা করিতে হয়; এইরূপে তবে লোকে বড় লোক হয়। নতুবা আমাদের গয়ারামেরও যে দশা তোমাদেরও সেই দশা হইবে।

শাক্য মুনির ক্ষমা।

শাক্য সিংহ বলিতেন, "মূর্খতা বশতঃ কেহ যদি আমার প্রতি মন্দ আচরণ করে, তৎপরিবর্ত্তে আমি তাহাকে প্রেমের শীতল আশ্রয় প্রত্যর্পণ করিব। তাহা হইতে যত অন্যায় ব্যবহার আসিবে, আমা হইতে ততই সদ্ভাব বাহির হইতে থাকিবে। এই সদনুষ্ঠানের সুঘ্রাণ আমার পক্ষে সর্ব্বদা সুফলপ্রদ, কিন্তু নিন্দুকের বিদ্বেষ বচনের মন্দ ফল তাহারই নিকট পুনর্ব্বার ফিরিয়া আইসে।"

"সদ্ভাবের দ্বারা অসদ্ভাব জয় করিতে হইবে" এই উপদেশ তাঁহার মুখে শ্রবণ করিয়া কোন দুষ্ট লোক একবার তাঁহাকে অপমান করে; তাহার অপমান করা শেষ হইলে মুনিবর দুঃখের সহিত বলিলেন, বৎস! কোন ব্যক্তি কাহাকে কোন সামগ্রী উপহার দিবার কালে যদি ভদ্রতার নিয়ম বিস্মৃত হয়, তাহা হইলে এইরূপ বলিবার রীতি আছে যে, 'তুমি ইহা ফিরাইয়া লইয়া যাও।' পুত্র, এক্ষণে তুমি আমার অবমাননা করিলে, কিন্তু আমি তোমার কুব্যবহার গ্রহণে অসম্মত হইতেছি; তোমার নিজ দুঃখের কারণ এই ব্যবহার তুমি ফিরাইয়া লও। যেমন ঢাকের সহিত শব্দ এবং বস্তুর সহিত ছায়া অবস্থিতি করে, পরিণামে দুরাচারীর পশ্চাতে তেমনি দুঃখই নিশ্চয় অনুসরণ করিবে। আকাশের দিকে চাহিয়া থুথু ফেলিলে তাহা দ্বারা স্বর্গ যেমন কলঙ্কিত হয় না, দুষ্ট লোকের নিন্দা অপমানে তেমনি সাধুর কিছু মাত্র ক্ষতি হয় না।" মুখের একটী কটু কথা সহ্য করিতে না পারিয়া কত লোক ক্রোধে পাগল মত হয়। কিন্তু শাক্যের কেমন অশ্চর্য্য ক্ষমা গুণ! তিনি জলন্ত ক্রোধানলে ক্ষমার জল ঢালিয়া দিতেন, এবং শান্তভাবে লোকের কটু বাক্য সহ্য করিতেন।

মন পরীক্ষা।

একজন লোক মনে মনে যাহা ভাবিতেছে আর একজন তাহা বলিয়া দিতে পারে; তোমরা বোধ হয় ইহা কল্পনাও করিতে পার না।

বিলাতে অনেক লোক আছেন যাঁহারা এরূপ বলিতে পারেন; সম্প্রতি একজন সাহেব এখানে আসিয়াছেন, তিনি মনের কথা বলিয়াদিতেছন। যে কোন লোক যে কোন বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হউন না কেন, তিনি তাহা বলিয়া দিতে পারেন। এ বিষয় পরীক্ষা করিবার জন্য এখানে অনেক সভা হইয়া গিয়াছে; এবং যাঁহারা মন পরীক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহাদের সকলেরই মনের কথা উক্ত সাহেব ঠিক বলিয়া দিয়াছিলেন। এ বড় আশ্চর্য্য ক্ষমতা! কি করিয়া এইরূপ পারা যায় আমরা তাহা বলিতে অক্ষম।

তোমাদিগকে একটী সংকেত শিখাইয়া দিতেছি; তোমাদের মধ্যে কেহ একটী অঙ্ক মনে ভাবিলে তোমরা এই সংকেত অনুসারে তাহা অনায়াসেই বলিয়া দিতে পারিবে।

মনে কর তুমি এবং নেপাল একস্থানে খেলা করিতে বসিয়াছ; তুমি নেপালকে একটী অঙ্ক ভাবিতে বল এবং সে যে অঙ্ক ভাবিবে তাহাকে ৩ দিয়া গুণ করিতে বল এবং গুণফলের সহিত ১ যোগ করিতে বল। যোগফলকে আবার তিন দিয়া গুণ করিয়া যাহা মনে মনে ভাবিয়াছে তাহা দ্বারা যোগ করিতে বল; যোগ ফল যাহা হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইবে এবং তুমি মনে মনে শেষের অঙ্কটি বাদ দিয়া যাহা থাকিবে তাহাই বলিয়া দিবে 'যে তুমি ইহা ভাবিয়াছ।'

দৃষ্টান্তঃ—

মনে কর নেপাল ভাবিয়াছে ১১

১১×৩ =৩৩

৩৩+১ =৩৪

৩৪×৩ =১০২

১০২+১১ =১১৩

১১৩ হইতে শেষের অঙ্কটি অর্থাৎ ৩ মনে মনে বাদ দিলেই ১১ থাকিল।

অনেক প্রকার উপায় আছে যাহা দ্বারা পরে যে অঙ্ক মনে ভাবিতেছে তুমি তাহা বলিয়া দিতে পার। একটী নিয়ম মাত্র এবারে প্রকাশিত হইল। ইহা ভিন্ন অন্য কোন নিয়ম কেহ আমাদিগকে জানাইলে আমরা তাহা প্রকাশ করিব। এবং যাঁহারা ঠিক উত্তর দিতে পারিবেন তাঁহাদের উত্তর ধাঁধার উত্তরের সহিত পরিগণিত হইবে।

ধাঁধা।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

১। কানন; ২। ব্রাহ্মণ ৫ জন, কায়স্থ ৮ জন ও মুসলমান ২৭ জন; ৩। ইন্দু+র=ইন্দুর; ৪। রামধনু; ৫। মৃত্যু; ৬। দস্তানা; ৭। নূতন পঞ্জিকা; ৮। গতকল্য।

নূতন।

১। বলত ৪৫ কে কিরূপ ভাবে সাজাইলে ৪৫ হইতে ৪৫ বিয়োগ করিলে ৪৫ অবশিষ্ট থাকিবে?

২। উত্তর করয় শুধু কে আছে এমন
কোন প্রশ্ন কাহাকেও না করে কখন।

সখা।
চতুর্থ ভাগ। তৃতীয় সংখ্যা।
মার্চ্চ, ১৮৮৬।

জোসেফ ম্যাট্‌সিনি।

সখার পাঠক পাঠিকা! যে মহাত্মার ছবি আজ তোমরা দেখিতেছ, ইনি আমাদের দেশের লোক নন। তোমরা কি ইটালী দেশের নাম শুন নাই? শুনিয়াছ বৈ কি? ভূগোলে নিশ্চয় পড়িয়াছ। যদি না পড়িয়া থাক, তবে ইহাঁর এই জীবন-চরিত পড়িবার পূর্ব্বে একবার এটলাস খানি খুলিয়া ইউরোপের ম্যাপটী দেখ। ঐ ম্যাপে ইউরোপের দক্ষিণ ভাগে তিনটী উপদ্বীপ দেখিবে, তাহার সকলের পশ্চিম ধারেরটী স্পেন ও পোর্টুগাল; মাঝেরটী ইটালী ও সকলের পূর্ব্বটী গ্রীস দেশ। এই ইটালীদেশ দেখিতে বিলাতী শিকারীর বুট জুতার ন্যায়। ইটালী দেশে অন্বেষণ করিতে টাইবার নামে এক নদী ও তাহার তীরে রোম নামে এক নগর দেখিতে পাইবে। আগে অনুসন্ধান কর, আমরা কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিতেছি।

পাইলে কি? ঐ রোম নগর এক সময়ে ভুবন-বিজয়ী ছিল। রোমের লোকদিগকে রোমান বলিত। রোমানগণ সাহসে ও পরাক্রমে জগতের সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। তাহাদের সাহস ও দেশ-হিতৈষিতার অনেক আশ্চর্য্য গল্প আছে, যাহা শুনিলে তোমরা অবাক হইয়া যাইবে, এবং স্বদেশকে কিরূপে ভাল বাসিতে হয়, তাহা বুঝিতে পারিবে। সে সকল গল্প শুনিতে শুনিতে তোমাদের মাথার চুল দাঁড়াইয়া উঠিবে। কিন্তু এবার সে সকল গল্প করিতেছি না। মনোযোগ পূর্ব্বক যদি তোমরা 'সখা' পড়,ক্রমে সে সব শুনিতে পাইবে। যাহা হউক রোমানগণ অতিশয় সাহসী, বীর ও দেশ-হিতৈষী জাতি ছিল। তাহারা অপর জাতির দাসত্ব সহ্য করা দূরে থাকুক, নিজেদের রাজাদের দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিল। রোমে রাজা ছিল না; প্রজারাই আপনারা রাজ্য শাসন করিত। ক্রমে রোমানেরা দেশ বিদেশ জয় করিয়া জগতে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তখন ইটালীর বড় সৌভাগ্যের অবস্থা ছিল। রোমের নামে জগতের সকল দেশ কাঁপিয়া যাইত। ইটালী কোন বিদেশীয় রাজার অধীন ছিল না। কিন্তু কাল ক্রমে ইটালীর সে সুখের দিন চলিয়া গেল। ইটালীবাসীগণ ধনী, সুখ-প্রিয়, পাপাসক্ত হইয়া পড়িল; তাহাদের বীরত্ব ও পরাক্রম চলিয়া গেল। অবশেষে তাহারা অপর জাতির অধীন হইয়া পড়িল। ইটালীর উত্তরে অষ্ট্রিয়া নামে একটী দেশ দেখিবে। ঐ দেশের লোকেরা আসিয়া ইটালীর অনেক দেশ অধিকার করিল। ইটালীর

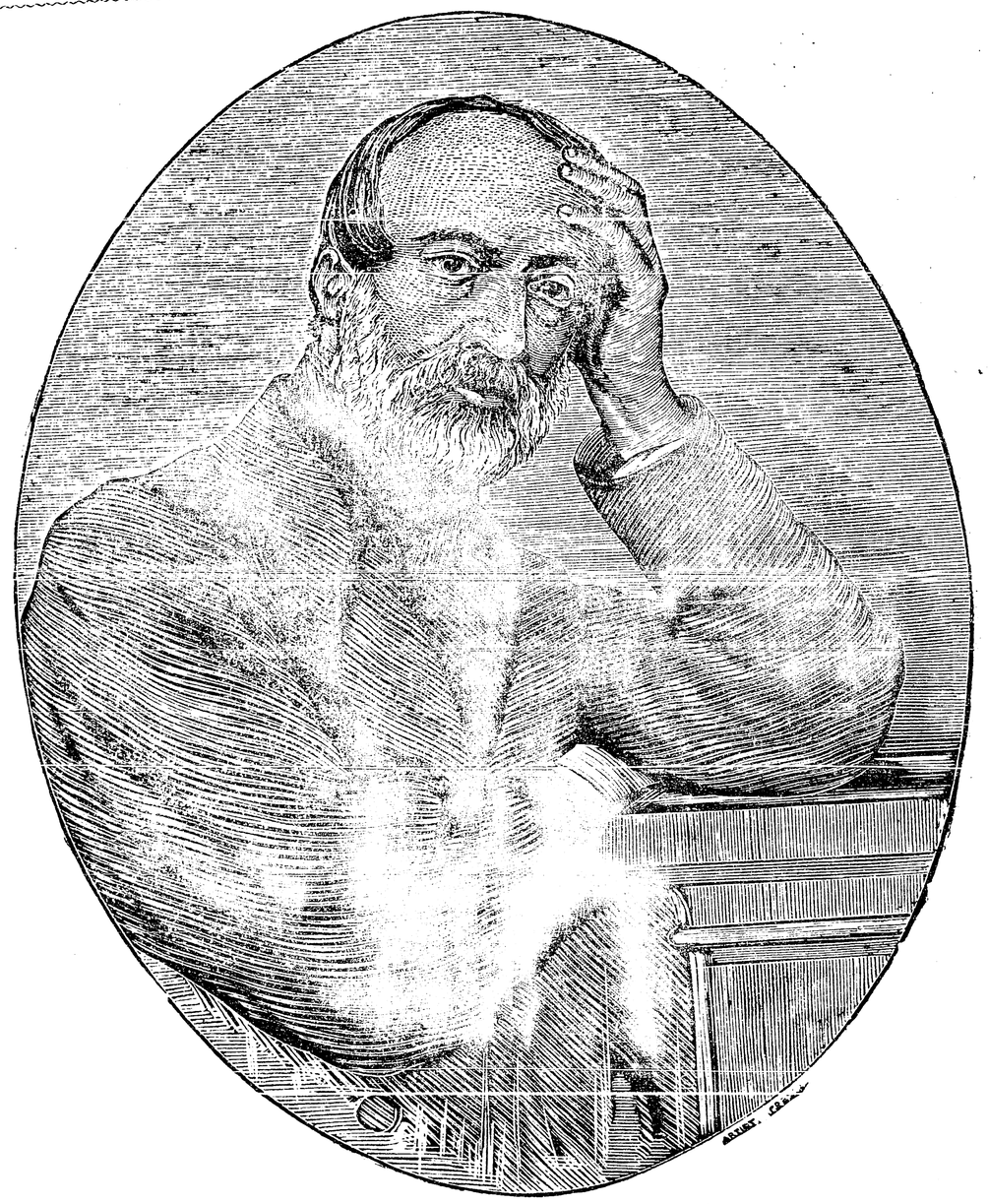

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যে দুই একজন দেশীয় রাজা রহিল তাহারাও নিস্তেজ, হীন-সাহস, অপদার্থ হইয়া রহিল।

এইরূপে পরাধীন হইয়া কয়েক শত বৎসর কাটিয়া যাইতে লাগিল। এখন আমাদের প্রিয় জন্ম-ভূমির যেরূপ অবস্থা, তখন ইটালীর সেইরূপ অবস্থা ছিল। পরাধীনতার অনেক ক্লেশ, সে সব ক্লেশ তোমরা বড় হইলে বুঝিতে পারিবে। সেই

ক্লেশে ইটালী দেশের লোকের মন বহু শত বৎসর ধরিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে সেই দেশে অনেক লোক পরাধীনতা হইতে স্বদেশকে উদ্ধার করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। পরাধীনতাতে দেশের অধিকাংশ লোকের মন এতদূর নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল যে,ঐ সকল দেশ-হিতৈষী লোক দেশের লোকের সাহায্য না পাইয়া যুদ্ধে হারিয়া দলে দলে প্রাণ পরিত্যাগ করিত। এইরূপে জোসেফ ম্যাট্‌সিনির জন্মিবার অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই ইটালীদেশে স্বদেশ-হিতৈষী ব্যক্তিগণ দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া মনের ক্ষোভে কাল কাটাইতেছিলেন। এবং মধ্যে মধ্যে এক এক দল লোক বিদেশী রাজাদের দাসত্ব হইতে আপনাদের দেশকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া ধনে প্রাণে নিধন প্রাপ্ত হইতেছিল।

এমন সময়ে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর অন্তর্গত জিনোয়া নগরে জোসেফ ম্যাট্‌সিনির জন্ম হইল। তাঁহার পিতা ঐ নগরের একজন বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার মাতা অতি ধীর-প্রকৃতি ও সদাশয়া রমণী ছিলেন। তাঁহার সদগুণে সকলে মোহিত হইত। সন্তানদের প্রতি তাঁহার অতিশয় স্নেহ ছিল, কিন্তু জোসেফের প্রতি তাঁহার কিছু বিশেষ ভালবাসা ছিল। শৈশবাবস্থায় জোসেফের শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল। এমন কি ৫।৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি দাঁড়াইতে শিখেন নাই। তাঁহাকে একটা ঘেরা চৌকিতে বসাইয়া তাঁহার মাতা গৃহকর্ম্ম করিতেন। ছেলেটীর শরীর বড় দুর্ব্বল বলিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে কিছু দিন পড়িতে দিবেন না মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু শিশু ম্যাট্‌সিনির পড়াতে এমন অনুরাগ ছিল যে,তিনি পিতার অজ্ঞাতসারে আপনার ভগিনীদের পড়া শুনিয়া শুনিয়া ও তাহাদের সাহায্যে অল্প দিনের মধ্যে বেশ পড়িতে শিখিলেন। এক দিন একজন আত্মীয় তাঁহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া দেখেন যে, সেই পাঁচ ছয় বছরের ছেলে নিজের চৌকির উপরে চারিদিকে বই ও ম্যাপ ছড়াইয়া নিমগ্ন-চিত্তে তাহা পাঠ করিতেছে, দেখিয়া তাঁহার আশ্চর্য্য বোধ হইল। যদি সেই বালককে কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন তুমি কি উপহার চাও,অমনি তিনি বলিতেন আমি বই চাই। বই তাঁহার এত প্রিয় ছিল।

ম্যাট্‌সিনির ছেলেবেলার আর একটী সুন্দর গল্প আছে। একদিন তাঁহার মাতা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছেন, এমন সময়ে একটী বৃদ্ধ ভিক্ষুক দ্বারে ভিক্ষা করিতে আসিল। জননী দেখিলেন ঐ বৃদ্ধকে দেখিয়া ছেলে আর নড়ে না, কেবল হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে। মনে করিলেন বুঝি ছেলে তাহার পাকা দাড়ি, ছেঁড়া কাঁথা ও ভিক্ষার ঝুলি দেখিয়া ভয় পাইয়াছে। এই ভাবিয়া ফিরিয়া যেমন ম্যাট্‌সিনির হাত ধরিয়া আনিতে যাইবেন, অমনি ম্যাট্‌সিনি তাঁহার হাত ছাড়াইয়া দৌড়িয়া গিয়া ঐ বৃদ্ধের কণ্ঠ আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাহার মুখে ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন ও মাতাকে বলিতে লাগিলেন,—"মা ইহাকে কিছু দেও, মা ইহাকে কিছু দেও।" বুড়টীর চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। সে বলিল "মা! ঈশ্বর তোমার ছেলেকে বাচাইয়া রাখুন, এ ছেলে গরিবকে বড় ভাল বাসিবে।"

ক্রমে ম্যাট্‌সিনির বয়স বাড়িতে লাগিল, তাঁহার পিতা তাঁহাকে স্কুলে দিলেন। ম্যাট্‌সিনি স্কুলে পড়িবার সময় খুব মন দিয়া লেখা পড়া শিখিতে লাগিলেন। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি

দেখিয়া শিক্ষকগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন। ম্যাট্‌সিনির প্রকৃতি অতি সৎ, নম্র, সাহসী, ও পরোপকারী ছিল; এই সকল গুণে তিনি সকলের প্রিয় হইলেন। ম্যাট্‌সিনি সুশিক্ষিত হইয়া কলেজ হইতে বাহির হইলেন; এবং ওকালতি করিবার জন্য চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার যেমন বয়স বাড়িল সেই সঙ্গে তাঁহার মন আর একদিকে গিয়া পড়িল। দেশের লোকের দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে বড় ক্লেশ হইত। তিনি দেশের পরাধীনতার কথা ভাবিয়া চক্ষের জল ফেলিতেন বিদেশীয় লোকে দেশের প্রজাদের উপর অত্যাচার করিতেছে, ইহাতে তাঁহার প্রাণে এত কষ্ট হইত যে, তিনি মনের দুঃখে ভাল কাপড় পরিতেন না, কোন আমোদ প্রমোদে যোগ দিতেন না, লোকের সঙ্গ ভাল লাগিত না, একেলা একেলা থাকিতেন এবং কিসে দেশের উদ্ধার হয় এই চিন্তা করিতেন। সেই সময়ে ইটালী দেশে যুবকদিগের এক অতি গোপনীয় সভা ছিল, তাহার সভ্যেরা স্বদেশকে পরাধীনতা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য শপথ পূর্ব্বক দলবদ্ধ হইয়াছিলেন। 'স্বদেশের উদ্ধার জন্য যদি প্রাণ দেওয়া আবশ্যক হয় তাহাও দিব' তাঁহারা এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ম্যাট্‌সিনি গোপনে ঐ দলের সভ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মাতা তাহা জানিতেন না। রাজারা এইরূপ দলকে বড় ভয় করিতেন ও তাহার মধ্যে কাহাকেও ধরিতে পারিলে কঠিন শাস্তি দিতেন।

ম্যাট্‌সিনি তাঁহাদের সহিত যোগ দিয়া উৎসাহের সহিত স্বদেশের উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ সেই দলের একজন বিশ্বাস-ঘাতক লোক তাঁহাকে ধরাইয়া দিল। এই ঘটনা ১৮৩০ সালে ঘটে। ম্যাট্‌সিনির বয়স তখন ২৫ বৎসর। তাঁহাকে ধরিয়া এক নির্জ্জন কারাগারে অনেক দিন কয়েদ করিয়া রাখা হইল। তাঁহার পিতা তাঁহাকে কয়েদ হইতে মুক্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিনি জেল-খানাতে বসিয়াই দেশের উদ্ধারের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অষ্ট্রিয়া গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন এ ব্যক্তিকে ইটালীতে কয়েদ করিয়া রাখাতেও বিপদ আছে; সুতরাং তাঁহাকে দেশের বাহির করিয়া দিল। তিনি ফ্রান্স দেশে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আর দেশে ফিরিয়া আসিবার যো নাই; পিতা মাতা ভাই ভগিনী কাহারও মুখ দেখিবার আশা নাই; ইটালী রাজ্যে একখানি পা বাড়াইবার হুকুম নাই। কিন্তু ফ্রান্স দেশে আসিয়াও ম্যাট্‌সিনি অলস হইলেন না। স্বদেশের উদ্ধার কিসে হইবে এই চিন্তাতে দিন রাত্রি ব্যস্ত হইলেন। তিনি যেমন স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়া আসিয়াছিলেন এইরূপ তাঁহার সমবয়স্ক আরও অনেকগুলি যুবক তাড়িত হইয়া সেই সময়ে ফ্রান্স দেশে বাস করিতেছিলেন। ম্যাট্‌সিনি তাহাদিগকে একত্র করিয়া "নব্য-ইটালী" নামে এক সভা স্থাপন করিলেন ও ঐ নামের একখানি খবরের কাগজ বাহির করিলেন। ঐ সভাতে প্রবেশ করিতে হইলে সভ্যদিগকে শপথপূর্ব্বক প্রাণ, মন, ধন সমুদায় দিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতে হইত। ম্যাট্‌সিনি সর্ব্ব প্রথমে নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া সভ্য হইলেন, তৎপরে আরও অনেক ব্যক্তিকে শপথ করাইয়া সভ্য করিলেন। এই সকল সংবাদ ইটালী দেশে প্রচার হইলে রাজাদের প্রাণে ভয় জন্মিল; কিন্তু দরিদ্র প্রজারা আনন্দ করিতে লাগিল। সে দেশের গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যাহাতে ম্যাট্‌সিনির কাগজ সে দেশে

প্রচার না হয়, কেহ না পড়িতে পায়। কিন্তু কোথা হইতে যে শত শত কাগজ বিলি হইয়া যায় কেহ ধরিতে পারে না! ঐ সকল কাগজ গোপনে গোপনে বিলি হয়, লোকে পড়ে, গবর্ণমেণ্ট কোন রূপেই বারণ করিতে পারে না। হাজার হাজার যুবক ম্যাট্‌সিনির সভার সভ্য হইতে লাগিল। তখন গবর্ণমেণ্টের মনে ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। তাঁহারা দেখিলেন ম্যাট্‌সিনি ফ্রান্স দেশে থাকিলেও নিস্তার নাই। তখন ফ্রান্স দেশের রাজা লুই ফিলিপ্‌কে এই অনুরোধ করা হইল যে, তিনি ম্যাট্‌সিনিকে ফ্রান্স দেশ হইতে তাড়াইয়া দেন। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, রাজায় রাজায় বন্ধুতা না রাখিলে চলে না সুতরাং ফ্রান্সের রাজা তাহাই করিলেন। ম্যাট্‌সিনি ফ্রান্সেও থাকিতে পাইলেন না! ফ্রান্স দেশ পরিত্যাগ করিয়া সুইজরল্যাণ্ড দেশে গমন করিলেন। সেখানেও তাঁহার বিশ্রাম নাই; সেখানে নানা দেশের তাড়িত লোকদিগকে একত্র করিয়া নব্য-ইউরোপ নামক আর একটী সভা করিলেন। ঐ সভাতে নানা জাতীয় লোক ছিল, সেখানেও তিনি নূতন স্বাধীনতার জলন্ত ভাব সকলের মনে প্রবিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অত্যাচারী গবর্ণমেণ্ট এখানেও তাঁহাকে সুখে থাকিতে দিল না। ইটালী গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে সুইজরল্যাণ্ডের গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে তাড়াইয়া দিল।

এই সময় তাঁহার বড় ভয়ানক দশা উপস্থিত হইল। কষ্টে দুঃখে দুর্ভাবনায় তাঁহার শরীর মন ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল; তিনি স্বদেশের উদ্ধারের বিষয়ে যে আশা করিতেছিলেন, সে বিষয়ে এখন সন্দেহ জন্মিতে লাগিল; তাঁহার নিতান্ত আত্মীয় বন্ধু যাঁহারা ছিল, তাঁহারাও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল; যাহারা শপথ পূর্ব্বক তাঁহার সাহায্য করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহারা অনেকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে লাগিল। এই অবস্থায় ঘোর যাতনাতে তাঁহাকে দিন কাটাইতে হইয়াছিল। অবশেষে তাঁহার মনের অন্ধকার আবার সরিয়া গেল। তিনি সুইজরল্যাণ্ড দেশ হইতে তাড়িত হইয়া জগৎ বিখ্যাত ইংলণ্ডে গমন করিলেন।

ইংলণ্ডে যে তিনি কি কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন তাহার বর্ণনা হয় না। তাঁহাকে যখন স্বদেশ হইতে বাহির করিয়া দিল, তখন তাঁহার পিতা পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি, যদি বিদেশীয় রাজাদের নিকট একটু ঘাড় হেঁট করিতেন তাহা হইলেই স্বদেশে সুখে বাস করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করিলেন না। এজন্য তাঁহার পিতা চটিয়া গেলেন। মনে মনে ভাবিলেন "ইটালীতে কি আর যুবক কেহ নাই; ইটালী কি তাহাদের স্বদেশ নয়, দেশের জন্য তাঁহার এত ছটফটানি কেন?" হায়! সংসারাসক্ত পিতা বুঝিতে পারিলেন না, পুত্রের প্রাণে কি আগুন জলিয়াছে। তিনি ম্যাট্‌সিনির প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিলেন "যাক্ মরুক গিয়ে, আমি তাঁহার খরচের টাকা দিব না।" এই বলিয়া খরচ পত্র বন্ধ করিলেন। সংসারে ম্যাট্‌সিনির মা না থাকিলে বিদেশে অনাহারেই তাঁহার মৃত্যু হইত। তাঁহার জননী ও ভগিনী গোপনে আপনাদের টাকা হইতে তাঁহার খরচ পত্রের মত টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা তাহা জানিতেন না। এই টাকা পাঠাইবার সময় তাঁহার মাতা ও ভগিনীদিগকে অতিশয় ক্লেশে থাকিতে হইত। ওদিকে ম্যাট্‌সিনি যে টাকা পাইতেন, তাহা এক জনের মত, কিন্তু

তিনি সেই এক জনের টাকাতে তাঁহার ন্যায় আরও দুইটী তাড়িত যুবকের ব্যয় চালাইতেন। তাঁহাকে আধপেটা খাইয়া অত্যন্ত ক্লেশে থাকিতে হইত। ইংলণ্ডে তাঁহার এক এক দিন এতদূর কষ্ট হইয়াছে যে, তাঁহাকে গায়ের জামা ও পায়ের জুতা পর্য্যন্ত বন্ধক দিতে হইয়াছে। ইহাতেও তিনি একদিনের জন্য দমিয়া যান নাই; একটী দিনের তরেও স্বদেশের উদ্ধারের চিন্তা করিতে ভুলেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে গিয়া তিনি নিরাপদে বাস করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহাও হইল না। তাঁহার দেশের গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট ডাকঘর হইতে তাঁহার চিঠি পত্র খুলিয়া পড়িতেন ও ইটালীর গবর্ণমেণ্টকে সেই সংবাদ দিতেন। ওদিকে ইটালীতে তাঁহার বন্ধু বান্ধবের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ হইল।

(ক্রমশঃ।)

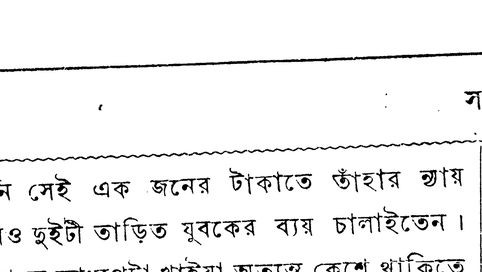

জোয়ার ভাঁটা।

নেক পাঠক পাঠিকা কলিকাতার নিকটে অথবা অন্য কোন স্থানে গঙ্গাতীরে বাস করেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন যে, প্রতিদিন দুইবার করিয়া গঙ্গার জল বাড়ে ও কমে; লোকে ইহাকে জোয়ার ভাঁটা বলে। এখন জিজ্ঞাসা করি এই যে, রোজ দুবার করিয়া গঙ্গার জল বাড়ে ও কমে কেন? স্নান করিবার সময়ে হয়ত কত দিন ভাঁটার সময় কাদার উপর দিয়া অনেক দূর গেলে তবে জল পাওয়া যায়, আর কতদিন অমনি একেবারে গঙ্গার কানে কানে জল থৈ থৈ করিতেছে দেখিয়া বড় আনন্দ হয়; তাহার কারণ তোমরা কখন কি জানিবার চেষ্টা করিয়াছ? পাঠক পাঠিকাদিগকে আমরা একটী অনুরোধ করিতেছি। যাঁহার সম্মুখে যে বিষয় আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইবে, তিনি যদি কাহার নিকট তাহার কারণ জানিতে না পারেন, তবে যেন আমাদিগকে লিখেন, আমরা উপযুক্তমত তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

এখন আমরা জোয়ার ভাঁটা কেন হয়, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। যাঁহাদের বাড়ী ত্রিবেনীর উত্তর, তাঁহারা গঙ্গার জোয়ারের জল বড় দেখিতে পান না; সেখানে গঙ্গার জল কেবল সাগরের দিকেই চলিতে থাকে, ভাঁটার জলের মত সে সকল স্থানের জল কেবল দক্ষিণ মুখে চলে। আর যত দক্ষিণ দিকে আসা যায়, গঙ্গাতে ততই জোয়ারের তেজ দেখা যায়। তাহার অর্থ বুঝা কঠিন নয়। জোয়ার যে কেবল ভাগীরথীতেই দেখা যায় তা মনে করিও না। গঙ্গা, মেগ্না, সিন্ধু, গোদাবরী, কাবেরী, কৃষ্ণা, মহানদী প্রভৃতি যত নদী ভারতবর্ষে আছে এবং তা ছাড়া সমস্ত পৃথিবীর যত নদীর কথা ভূগোলে পড়িয়াছ, তাহাদের প্রায় সমস্ত গুলিতেই জোয়ার হয়। কিন্তু কেবল সাগরের নিকট কিয়ৎ দূর পর্য্যন্ত জোয়ারের জোর চলে, তার পর নদী সকল

একটানা। সুতরাং বুঝিতেই পারিতেছ যে গঙ্গা ও অন্যান্য সব নদীর জোয়ার সাগরের উপর নির্ভর করে। নদী সকল সাগরে পড়ে, এজন্য যতক্ষণ সাগরের জল নদীর মুখ অপেক্ষা নীচু, ততক্ষণ নদীর জল সাগরেই পড়িবে। কিন্তু যদি কোন কারণে সাগরের জল নদীর জল অপেক্ষা উচ্চ হইয়া উঠে, তাহা হইলে সাগরের জল নদীর মধ্যে প্রবেশ না করিয়া থাকিতে পারেনা। তখন নদীর জলের গতি ফিরিয়া যায়। এতক্ষণ যে জল সাগরের দিকে যাইতেছিল, তাহা এখন বিপরীত দিকে চলিবে। এই বিপরীত প্রবাহের নামই নদীর জোয়ার।

এখন বুঝিলে যে সাগরের জলে জোয়ার হওয়ায় জল ফুলিয়া উঠে এবং ঐ উচ্চ জল নদীর মধ্যে প্রবেশ করিলেই নদীতে জোয়ার হয়। কাজেই এখন এই প্রশ্ন মনে উঠিবে—যে সাগরে জোয়ার কেন হয়? আমরা এইবার তাহার উত্তর দিব।

সমুদ্রই পৃথিবীর অধিক ভাগ ব্যাপিয়া আছে। সমস্ত পৃথিবীকে চারি ভাগ করিলে, প্রায় তাহার তিন ভাগ জলে ঢাকা, আর এক ভাগের কিছু বেশী স্থল দেখা যাইবে (ওয়ার্ল্ডের ম্যাপ দেখ।) এই সমুদ্রভাগ যে কত গভীর তাহার এখনও সকল স্থানে ঠিকানাই হয় নাই। হিমালয় পর্ব্বত যে এত উচ্চ, তাহার মত পর্ব্বত ও সাগরের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে পারে এবং তাহার উপরে ও অনেক জল থাকে। এই অতল অকূল জলরাশি পৃথিবীর গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে কেন?—সকলেই জান যে পৃথিবী নিজ আকর্ষণ শক্তি দ্বারা উহাকে টানিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছে। মনে কর যদি আর একটা প্রকাণ্ড গ্রহ পৃথিবীর নিকটে আসিয়া জলটাকে টানিত, তাহা হইলে ঐ জল আর স্থির থাকিতে পারিত না। এখন দেখ পৃথিবী এই রূপে জলে আবৃত হইয়া আছে, আর আকাশের সমস্ত গ্রহ ও উপগ্রহ, সূর্য্য ও নক্ষত্রাদি সকলেই জলস্থলময় পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে। সহজেই বুঝিতে পারিতেছ যে চন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিকটে বলিয়া উহার আকর্ষণই খুব বেশী হইবে। সূর্য্যটা একটা অতি প্রকাণ্ড জিনিস, সুতরাং সে দূরে থাকিলেও চন্দ্রের পরেই তাহার আকর্ষণ। নক্ষত্র সকল এত দূরে আছে যে মনে ধারণা করাই যায় না। সুতরাং কেবল চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণই অনুভব করা যায়। পৃথিবীর যে সমস্ত অংশ স্থলময় তথায় কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না; কেননা স্থল কঠিন। কিন্তু যে সকল ভাগ সাগরে আবৃত, তথায় এই আকর্ষণের কার্য্য বেশ দেখা যায়। যখন যে সাগরের উপর এই আকর্ষণ কার্য্য করে, অর্থাৎ যাহার উপর সূর্য্য বা চন্দ্র উদিত থাকে, তথাকার জল তরল বলিয়া ঐ টানের জোরে একটু উপরদিকে ফুলিয়া উঠে। এই ফুলিয়া উঠার নাম জোয়ার হওয়া। কোন কঠিন পদার্থের এক দিক ধরিয়া টানিলে সেই সঙ্গে তাহার সমস্তটাই আসে; কিন্তু তরল জিনিসের যেখানটা টানা যায় সেখান হইতেই খানিকটা সরিয়া আসে। জোয়ার হওয়ারও কারণ সেইরূপ। পৃথিবীর জল ও স্থল উভয়ই আকৃষ্ট হয়। স্থল কঠিন বলিয়া তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না, যেমন ছিল তেমনি থাকিয়া যায়; কিন্তু সমুদ্রের অগাধ জল ত সেরূপ কঠিন নহে, কাজেই সূর্য্য বা চন্দ্র আকর্ষণ করিলে খানিক পরিমাণে সেই দিকে উঁচু হইয়া উঠে, তাই সেখানে তখন জোয়ার হয়।

যখন যে সাগরের ঠিক উপরে সূর্য্য ও চন্দ্র

উদয় হয়, তখন তথায় জোয়ার হয়, বুঝিলে। আবার সেই সঙ্গে একই সময়ে, ঠিক তাহার বিপরীত দিকে যে সাগর, সেখানে ও জোয়ার হয়। তাহার কারণ বুঝা তত সহজ নয়। তবু মন দিয়া শুন। আকর্ষণের একটী নিয়ম আছে জান, তাহার দ্বারা যে বস্তু যত দূরে থাকে তাহার প্রতি আকর্ষণ ও তত কম হয়। এখন, পৃথিবী যে কেমন প্রকাণ্ড তা তোমরা জান। এই প্রকাণ্ড পৃথিবীর এক দিক ও তাহার বিপরীত দিকের মধ্যে যে দূরত্ব তাহার নাম উহার ব্যাস। মনে কর কলিকাতা হইতে যদি একটা পাৎরুয়া খুঁড়িয়া যাওয়া যায় তবে ক্রমে উহা পৃথিবীর মধ্যস্থল ভেদ করিয়া উহার অপরদিকে গিয়া বাহির হইবে। পৃথিবীর এই ব্যাস প্রায় ৮০০০ আট হাজার ক্রোশ; সুতরাং ইহা সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, একটা জিনিসকে চন্দ্র সূর্য্য কলিকাতায় যত জোরে আকর্ষণ করে, পৃথিবীর অপরদিকে কলিকাতার বিপরীত ভাগে থাকিলে সে বস্তুকে আর তত জোরে আকর্ষণ করিতে পারেনা।

ভাল। এখন দেখ, যখন চন্দ্র সূর্য্য আটলান্টিক মহাসাগরের কোন স্থানে উদয় হইয়াছে ও তথায় জোয়ার দেখা যাইতেছে, তখন ঠিক তাহার বিপরীত দিকের সাগরে যে জল আছে, সে জলকে কখনই আটলান্টিক মহাসাগরের জলের মত জোরে আকর্ষণ করিতে পারে না, নিশ্চয়ই কম জোরে টানিবে, কেননা উহা ৮০০০ ক্রোশ দূরে আছে। আটলান্টিক মহাসাগরের জলের অপেক্ষা পৃথিবীর কেন্দ্রে আকর্ষণের বল কম, আবার কেন্দ্রের অপেক্ষাও আটলান্টিকের বিপরীত দিকের সাগরের জলকে কম জোরে টানিতেছে। কাজে কাজেই, কম টান পাওয়ায় ঐখানকার জল পৃথিবীর গা হইতে একটু ঝুলিয়া পড়িবে অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য যেদিকে আছে তাহার উল্টাদিকে ফুলিয়া উঠিবে। এই ফুলিয়া উঠা আর কিছুই নয়, ঐস্থানের সমুদ্রের জোয়ার। এইরূপে আমরা দেখিলাম যে একই সময়ে দুই স্থানে জোয়ার হয়।

বিষয়টী এত কঠিন যে ছবি না দেখিলে ভাল বুঝিতে পারিবে না। ছবিতে—(ক) সূর্য্য বা চন্দ্র। প—পৃথিবীর কেন্দ্র। (পৃথবী যেন চারি দিকেই সমুদ্রে বেষ্টিত) স-ফ-স-ব—সমুদ্রের উপরিভাগ। তোমরা সকলেই 'সখা'তে আকর্ষণের বিষয় পড়িয়াছ। একটী নিয়ম আছে, যে, যে বস্তু যত দূরে থাকে তাহার প্রতি অন্য বস্তুর আকর্ষণ তত কম হয়। আর যে বস্তু যত নিকটে থাকে তাহার আকর্ষণ তত বেশী হয়। এখানে দেখিতেছ যে ব নামক স্থানটী প অপেক্ষা সূর্য্য বা চন্দ্রের অধিক নিকটে। ফ নামক স্থানটী আবার প অপেক্ষাও অধিক দূরে। সুতরাং সূর্য্য বা চন্দ্রের স্থানটীকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলে আকর্ষণ করিতেছে, প কে তাহা অপেক্ষা কম আকর্ষণ করিতেছে, ফ কে আরও কম। বেশ্; এখন তোমরা দেখিতে পাইতেছ যে ফ, ব, দুইটী স্থান, তাহার ঠিক মধ্যস্থলে প আছে। ব হইতে প যত দূরে, প হইতে ফ ঠিক তত দূরে। ক ব কে টানিল, ব একটু অগ্রসর হইল; প কে ক একটু কম জোরে টানিল, সুতরাং প ব এর সমান অগ্রসর হইতে পারিল না; সুতরাং পূর্ব্বে প ও ব এর মধ্যে যে ব্যবধান টুকু ছিল, এখন তাহা একটু বাড়িল! এইরূপে প ও ফ এর মধ্যস্থিত দূরত্বটা ও ক এর আকর্ষণে বাড়িবে। সুতরাং ক আসিয়া প ফ ব কে টানিয়া এই করিল যে ইহাদের দূরত্ব একটু বাড়িল। প পৃথিবীর কেন্দ্র। পৃথিবীটা কঠিন জিনিস কি না, সুতরাং কেন্দ্র যে দিকে নড়িল, সমস্ত পৃথিবীই সেই দিকে নড়িল। ইহাতেই বুঝিতে পারিতেছ যে, ব যদি কেন্দ্র হইতে বেশী দূরে আসিয়া থাকে, তবে ভূপৃষ্ঠ হইতে প বেশী দূরে আসিয়াছে। সেইরূপ, ফ হইতে ভূপৃষ্ঠ একটু সরিয়া গিয়াছে। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, এই দুই স্থানে সমুদ্রের গভীরতা বাড়িয়াছে—অর্থাৎ জোয়ার হইয়াছে।

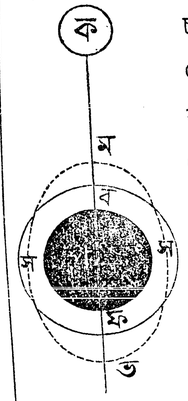

কিন্তু এই যে দুই স্থানে জোয়ারের জল উচ্চ হইয়া উঠিতেছে, এজল কোথা হইতে আসিল? ছবি দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছ যে, ঐ ফুট ফুট আকারের গোল রেখাটীই তখনকার জলের সীমা রেখা। অর্থাৎ স স নামক যে দুইটী স্থান চন্দ্র বা সূর্য্যের ঠিক নীচেও নয় বিপরীত দিকেও নয়, সেই দুই পাশের দুটী স্থান হইতে জল সরিয়া আসিয়া ম ও ভ নামক স্থান দুইটীর জোয়ারের জল যোগাইয়াছে। তজ্জন্য স স নামক ঐ দুই পাশের জল খুব কমিয়া গিয়াছে অর্থাৎ ঐ দুই স্থানে ভাঁটা পড়িয়াছে।

আজ আমরা এই টুকু বুঝিতে পারিলাম যে, চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণই জোয়ার ভাঁটার কারণ। এবং এক সময়ে দুই স্থানে জোয়ার ও দুই স্থানে ভাঁটা হইয়া থাকে। তাহার পর আজিকার শেষ কথা এই যে, পৃথিবী প্রায় ২৪ ঘণ্টায় একবার আপনি ঘুরে, এজন্য উহার প্রত্যেক স্থান এক দিবসের মধ্যে একবার চন্দ্র ও সূর্য্যের দিকে ফিরে; সুতরাং পৃথিবীর সর্ব্বত্রই, সকল মহাসাগরেই প্রতি দিনে দুই বার জোয়ার ও দুই বার ভাঁটা হইয়া থাকে। আরও অনেক কথা আছে, সে সমুদয় পরবারে আবার বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

———

বেলুন।

বাতাসের চাইতে হাল্‌কা জিনিস ভিতরে পূরিয়া দেওয়াতেই বেলুন উপরে উঠে, এই কথা তোমরা পূর্ব্বেই শিখিয়াছ। এখন তোমাদিগকে আরো কতগুলি কথা বলিব।

মনে কর অনেক দূর উঠিয়া বেলুন আর উঠিতে চাহিতেছে না। তখন যদি তোমার আরো উঠিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে কি করিবে? তাহার সঙ্কেত বলি, শুন। বেলুনে চড়িবার পূর্ব্বে কয়েক বস্তা বালি বেলুনে তুলিয়া দিতে হয়। বেলুন যখন আর উঠে না, তখন এর একটী বস্তা খুলিয়া কিঞ্চিৎ বালি ফেলিয়া দিতে হয়। তাহা হইলেই বেলুন একটু হাল্‌কা হইল, এখন আর কিছু দূর নিরাপদে উঠিবে। এইরূপে যখন বালির বস্তা ফুরাইয়া যাইবে, তখন তোমার নামিয়া আসার যোগাড় দেখাই ভাল। অনেক সময় কোন সমুদ্রের উপর আসিয়া বেলুন পড়িয়া যাইবার যোগাড় করে। সমুদ্রে পড়িলে কি হয়, তা ত জানই; সুতরাং তখন বাধ্য হইয়া উপরের লিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হয়। কখন কখন আবার ইহাতেও কুলায় না, তখন একটী দুইটী করিয়া সঙ্গের জিনিস পত্র পর্য্যন্ত ফেলিয়া দিতে হয়। তাহাতেও যদি না কুলাইল তবেই বিপদ।

আচ্ছা, মনে কর এমন হইল যে, বেলুন এত উপরে উঠিয়াছে যে তুমি তাহাতে সুবিধা মনে কর না; তখন যদি আর উঠিতে ইচ্ছা না হয়, কিম্বা যদি নামিয়া আসিতে ইচ্ছা হয় তখন কি করিবে? তখনকার জন্য দুই প্রকারের ব্যবস্থা আছে। ১ম—বেলুনের গায় একটী ছিদ্র করিয়া

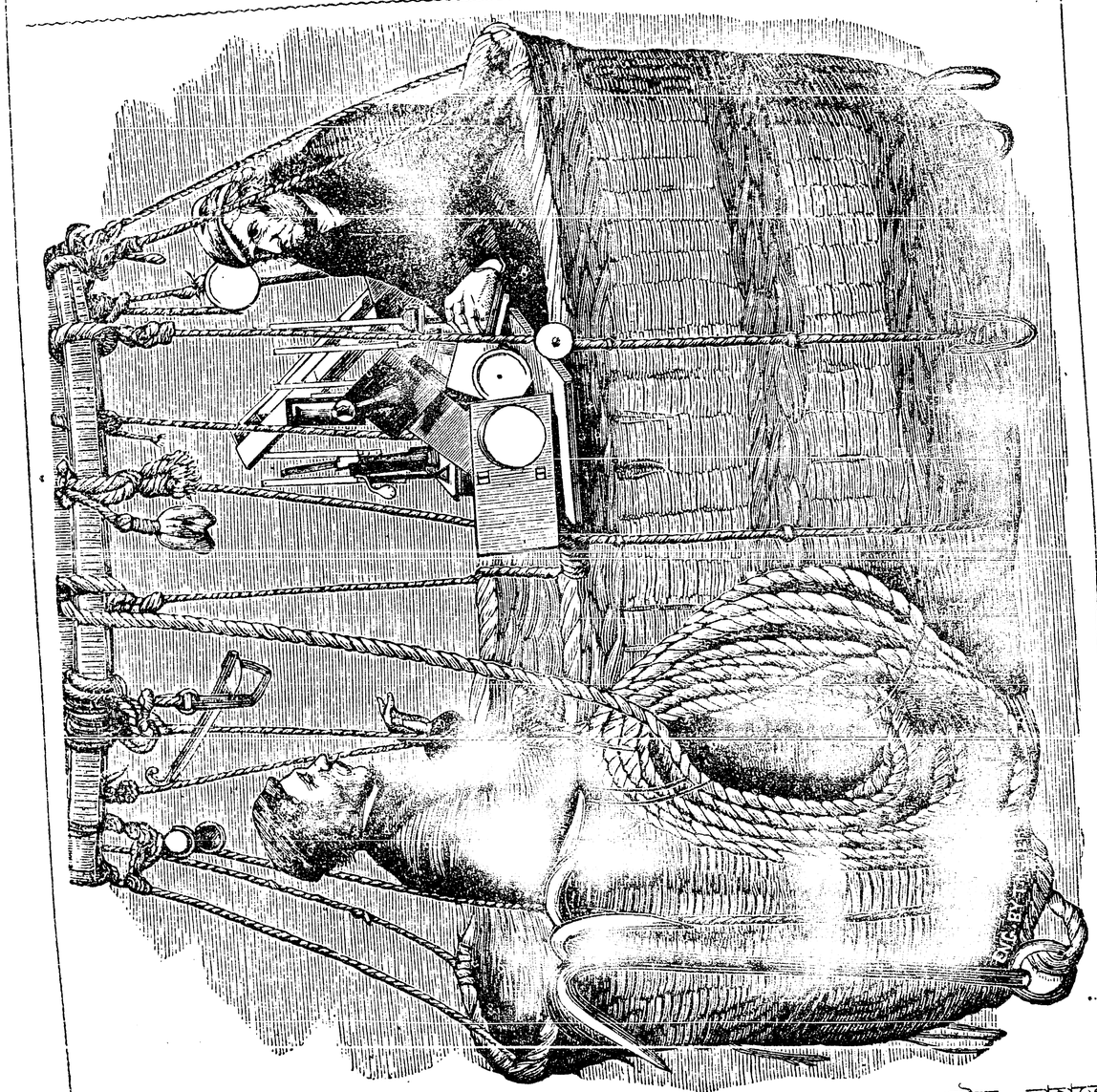

দিতে পারিলেই ভিতরের হাল্‌কা জিনিসটা বাহির হইয়া যাইবে, তখন বেলুনটীকে বাধ্য হইয়া নামিতে হইবে। অনেক সময় বেলুনটীকে উপরে রাখিয়াই নিজে নামিবার যোগাড় করিতে হয়। তাহার জন্য দ্বিতীয় উপায়টী উত্তম।

দ্বিতীয় উপায়।—কাপড়ের একটা মস্ত ছাতা কর। ছাতাটা শুধু কাপড়ের হইবে, তাহাতে শিক্ বাঁট দিতে হইবে না। ছাতার মাঝখানটায় একটা গোল ছিদ্র রাখ—ছিদ্রটা যেন খুব বড় হয়। তার পর ছাতার চারিধারে লম্বা দড়ি বাঁধিয়া সমস্ত গুলি দড়ির মাথা একত্র করিয়া বাঁধ। যেখানে দড়ির মাথা গুলি বাঁধিয়াছ, সুবিধা হইলে সেখানে

বসিবার কোন রূপ উপায় কর। এই যন্ত্রটীও বেলুনে তুলিয়া লইতে হয়। নামিতে ইচ্ছা হইলে যেখানে বসিবার উপায় করিলে, সেই স্থানটা অবলম্বন করিয়া বেলুনের সহিত ছাতার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে হয়। বাতাসে ছাতাটা আপনা আপনি ফুলিয়া উঠে। তখন ধূপ্ করিয়া পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে না।

ছাতার মাঝখানে ঐ ছিদ্রটী না থাকিলে ছাতা ভয়ানক দুলিত, ও তোমার পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা হইত। ঐ ছিদ্রটী থাকাতে দেখা গিয়াছে যে, ঐরূপ দুলিবার কোন ভয় থাকে না। (বল দেখি কেন এরূপ হয়?)

অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, লোকে কেবল মাত্র আমোদের জন্যই বেলুনে উঠে। অনেকে আমোদের জন্য বেলুনে উঠে বটে, কিন্তু তা ছাড়া বেলুনে উঠাতে অনেক উপকার হয়; বড় ছবিটী দেখিলেই ইহা বুঝিতে পারিবে। ঐ ছবিতে যে দুইজন লোক বসিয়া আছেন, তাঁহাদের একজন গ্লেশার আর একজন কক্‌ওয়েল সাহেব। ইঁহারা ইংলণ্ডের দুইজন বৈজ্ঞানিক। পৃথিবী হইতে কত ঊর্দ্ধে বাতাসের অবস্থা কিরূপ, জানিবার জন্য ইঁহারা বেলুনে চড়িয়াছেন। গ্লেশার সাহেবের সম্মুখে বাতাস পরীক্ষা করিবার উপযোগী যন্ত্র গুলি সাজান রহিয়াছে। একটী যন্ত্রের সাহায্যে জানা যায় যে "এত" ঊর্দ্ধে উঠা হইয়াছে। অন্য একটী যন্ত্র বলিয়া দিতেছে যে সেখানকার বাতাসে "এত" জলীয়বাষ্প আছে। আর একটী বলিতেছে যে সেখানকার বাতাস "এত" গরম—ইত্যাদি।

আমরা একস্থানে বলিয়াছি যে "বেলুন এত উপরে উঠিয়াছে যে তুমি তাহা সুবিধা মনে কর না।" ইহার অর্থ হয়ত অনেকেরই বুঝিতে একটু গোল হইয়াছে, সুতরাং অত্যন্ত উচ্চে উঠিলে যে যে অসুবিধা হয়, তাহার দু একটীর উল্লেখ করা যাইতেছে। কিছু উপরে উঠিলেই দেখিবে শ্বাস ফেলিতে একটু কষ্ট হয়—বাতাস যেন কমিয়া গিয়াছে। এই অসুবিধাটা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। এর চাইতে আরো উপরে উঠিলে দেখিবে তোমার গায়ের চামড়া ফাটিয়া যাইতেছে। আরো উপরে উঠিলে তোমার নাকের লোমকূপ গুলি দিয়া বিন্দু বিন্দু রক্ত বাহির হইবে। তাই বলিতেছিলাম অধিক উপরে উঠিলে অসুবিধা হইবে।

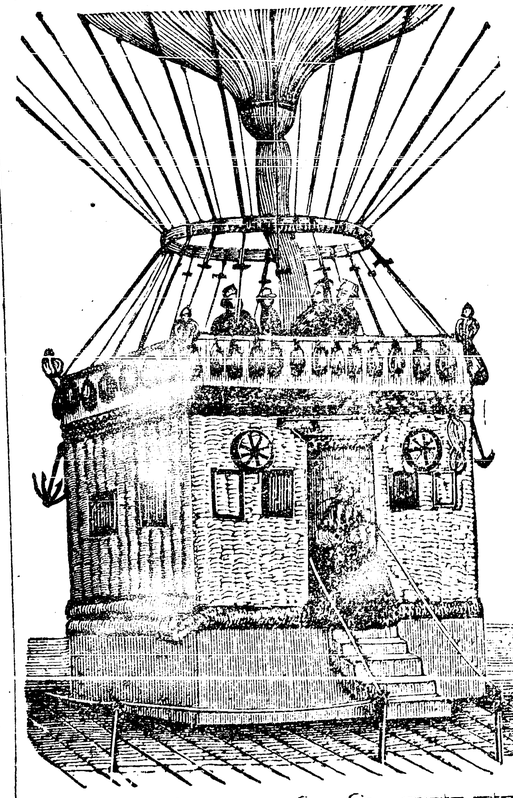

একটা গল্প বলিয়া শেষ করিতেছি। নেডার নামক এক সাহেব খুব যোগাড় যন্ত্র করিয়া একটা প্রকাণ্ড বেলুন প্রস্তুত করিলেন। (ছবি দেখ,) তাহার ভিতরে

কত কিছু ব্যাপারেরই আয়োজন হইল; সাহেব মনে করিলেন গরু হারাইলে ইহার ভিতর তাহাও পাওয়া যাইবে। সকলে শশব্যস্ত হইয়া তামাসা দেখিতে আসিল; মনে করিল "এটা যখন শূন্যে উঠিবে তখন না জানি একটা কি ব্যাপারই হয়।" "বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া", বেলুনটা কত দূর উঠিয়াই পড়িয়া গেল। যাহারা তামাসা দেখিতে গিয়াছিল তাহারা বাড়ী আসিয়া হাসিতে লাগিল।

গুরু-দরবার।

তোমরা কি পঞ্জাব দেশের নাম শুনিয়াছ? ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম কোণে একটী দেশ আছে, তাহার নাম পঞ্জাব। "পঞ্চ" ও "আপ" এই দুইটী শব্দ হইতেই বোধ হয় ঐ শব্দটী হইয়াছে। "পঞ্চ" শব্দের অর্থ পাঁচ ও "আপ" শব্দের অর্থ জল। ইহার অর্থ এই এদেশে পাঁচটী নদী প্রবাহিত। ঐ পাঁচটী নদী সিন্ধু নামক নদীর শাখা। ঐ পাঁচটীর নাম, বেয়া, শৎলেজ্, রাবী, চেনাব ও ঝেলম। তোমরা ভারতবর্ষের ম্যাপ খুলিয়া এই দেশটী ও ঐ নদীগুলি ভাল করিয়া দেখিবে।

এই পঞ্জাব দেশে নানক নামে একজন মহাপুরুষ জন্মিয়াছিলেন। আমাদের দেশে নবদ্বীপ নগরে চৈতন্য জন্মিয়া যে সময়ে হরিনাম প্রচার করেন, প্রায় তাঁহার সম সম কালে, অর্থাৎ এখন হইতে তিন চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নানকের জন্ম হয়। নানক একজন সামান্য লোকের ছেলে ছিলেন। অতি বালক কাল হইতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে ব্যবসায় বাণিজ্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্য তাঁহার ভাল লাগিত না, তিনি কেবল ধর্ম্ম বিষয়ে চিন্তা করিতেন; এবং ধর্ম্ম বিষয়ে দেশের লোকের দুর্দ্দশা দেখিয়া শোক করিতেন। অবশেষে তিনি বিষয় কার্য্য ছাড়িয়া কেবল গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি সকলকে এই কথা বলিতে লাগিলেন যে, একমাত্র পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরকে তোমরা প্রীতি কর, সকল পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার ছাড়। ক্রমে নানকের অনেক শিষ্য জুটিল। ঐ শিষ্যদের নাম এখন শিখ। শিষ্য শব্দ হইতেই শিখ শব্দ হইয়াছে। নানক এই শিখদিগের প্রথম গুরু। তাঁহার পর আরও নয় জন গুরু পর পর জন্মিয়াছেন। এই শিখগণ অতিশয় সাহসী। আগে ইহারা কেবল ধর্ম্ম প্রচারই করিত, অতি শান্ত স্বভাব ছিল; কিন্তু মুসলমান রাজাদের দৌরাত্ম্যে ইহারা সুস্থির হইতে পারিত না। মুসলমান রাজারা ইহাদের গুরুদিগকে ধরিয়া অপমান করিত; এবং কাহাকে কাহাকেও প্রাণে হত্যা করিয়াছিল। সেই জন্য ইহাদের একজন গুরু ইহাদিগকে অস্ত্র শস্ত্র ধরিয়া আত্ম-রক্ষা করিতে হুকুম করেন। তদনুসারে শিখগণ সাহসী বীর ও যুদ্ধ-প্রিয় জাতি হইয়া পড়িল। ক্রমে পঞ্জাব দেশ শিখেরই রাজ্য হইল। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজেরা যখন পঞ্জাব দেশ জয় করিবার চেষ্টা করেন, তখন রণজিৎ সিংহ নামে একজন শিখরাজা পঞ্জাবে রাজত্ব করিতেন। তিনি বিক্রমে বাস্তবিক সিংহের সমান ছিলেন। ইংরাজেরা ভারতবর্ষের আর সর্ব্বত্র অনায়াসে জয় করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু পঞ্জাব দেশ জয়

করিতে নাকের জলে চোখের জলে হইতে হইয়াছিল। শিখদিগের বিক্রমে ইংরাজদিগকে অস্থির হইতে হইয়াছিল। যাহা হউক অবশেষে শিখগণ হারিয়া গেল ও পঞ্জাবদেশ ইংরাজের রাজত্ব হইল। পাঠক পাঠিকা! তোমরা যদি শিখদের ইতিহাস হাতে পাও, পড়িয়া দেখিও তাঁহাদের বীরত্ব দেখিয়া মনে আনন্দ হইবে। যাহা হউক এই শিখ জাতির সবিশেষ বিবরণ বলা অদ্য আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ইহাদের প্রধান ধর্ম্ম-মন্দিরের বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য।

পঞ্জাব দেশে যে সকল বড় বড় সহর আছে, তাহার মধ্যে অমৃতসহর নামে একটী বড় সহর আছে। ম্যাপে ঐ সহরটী দেখিবে। পঞ্জাবের সহরগুলি আমাদের দেশের সহরগুলির মত নহে। এই যে কলিকাতা সহর, ইহার চারিদিক খোলা; অর্থাৎ সকল দিক্ দিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ করা যায়। পঞ্জাবের বড় বড় সহরগুলি এইরূপ নয়। সমুদয় সহরটী প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত, এবং সহরে প্রবেশের জন্য কতকগুলি "গেট" আছে; তাহাকে সংস্কৃতে তোরণদ্বার বলে। সে দ্বার গুলি বন্ধ করিবার উপায় আছে। গেট গুলি যদি বন্ধ করা যায়, তাহা হইলে সমুদয় সহরটী যেন একটী কোন বড় পরিবারের প্রাচীর বেষ্টিত বাড়ীর ন্যায় হইয়া পড়ে। পূর্ব্বকালে শত্রুকুলের আক্রমণের ভয়ে, নগর গুলিকে এইরূপ প্রাচীর বেষ্টিত করা হইয়াছিল। ইহাতে একটী প্রধান অনিষ্ট হইয়াছে। কালক্রমে সহরের লোক সংখ্যা যত বাড়িয়াছে সকলকে ঐ সহরের ভিতরেই ঠেলাঠেলি করিয়া, মাথা গুঁজিয়া থাকিতে হইয়াছে। স্থানের অত্যন্ত অপ্রতুল হওয়াতে বাড়ীর উপর বাড়ী, তার উপর বাড়ী, এই করিতে করিতে রাস্তাগুলি বড় সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; এমন কি অনেক রাস্তাতে একখানি পাল্কী যাইবারও যো নাই। সুতরাং সহরের মধ্যে বাতাস পাওয়া দুষ্কর, ও সহরগুলি অত্যন্ত অপরিষ্কার হইয়াছে। এই কারণে এই সকল সহরে ওলাউঠা প্রভৃতি জন্মিয়া মধ্যে মধ্যে অনেক লোক মারা যায়। পরিষ্কার বায়ু যে স্থানে যাইতে পারে না, সে স্থান ত্বরায় অস্বাস্থ্যকর হয়। পঞ্জাবের সহর গুলিতে তাহা দেখা যায়।

যাহা হউক অমৃতসহর এইরূপ একটী সহর। কিন্তু অমৃতসহরের একটী গুণ আছে, ইহা প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত হইলেও ইহার রাস্তা গুলি প্রকাণ্ড এবং সহরের জল বায়ু অতি চমৎকার। অমৃতসহরের জলের এমনি গুণ যে আমরা প্রাতে সেখানে গিয়া বৈকালে বুঝিতে পারিলাম যে নূতন স্থানে আসিয়াছি; শরীরে এত স্ফূর্ত্তি বোধ হইতে লাগিল। এই অমৃতসহর নগর যে জন্য প্রসিদ্ধ তাহা এখন বর্ণনা করিব। এই অমৃতসহরে শিখদের আদিগুরু নানক অনেক সময় থাকিতেন, তখন ইহা এত বড় সহর ছিল না। সামান্য স্থান ছিল। এই নগরে একটী উদ্যান ও একটী সরোবর আছে, তাহার নাম অমৃত-সর; সেই সরোবরের নামে এই সহরের নাম হইয়াছে। ঐ সরোবরের মধ্যস্থলে পাষাণ নির্ম্মিত একটী মন্দির আছে। তাহার উপরিভাগ সুবর্ণের পাত দিয়া মোড়া। এই জন্য ইহাকে স্বর্ণ-মন্দির বলে। পাষাণ নির্ম্মিত একটী সেতু অর্থাৎ পুল আছে, যাহা দিয়া ঐ মন্দিরে যাইতে হয়। সেই পুলটী দিয়া মন্দিরের নিকটে গেলে, দেখা যায় যে, যে সকল মার্বেল প্রস্তর দ্বারা সেতুটী ও মন্দিরটী নির্ম্মিত, তাহার অধিকাংশে অতি উৎকৃষ্ট কাজ। অনুসন্ধান করিলেই জানা যায় যে, মুসলমানদিগের সমাধিমন্দির ও ধর্ম্ম-

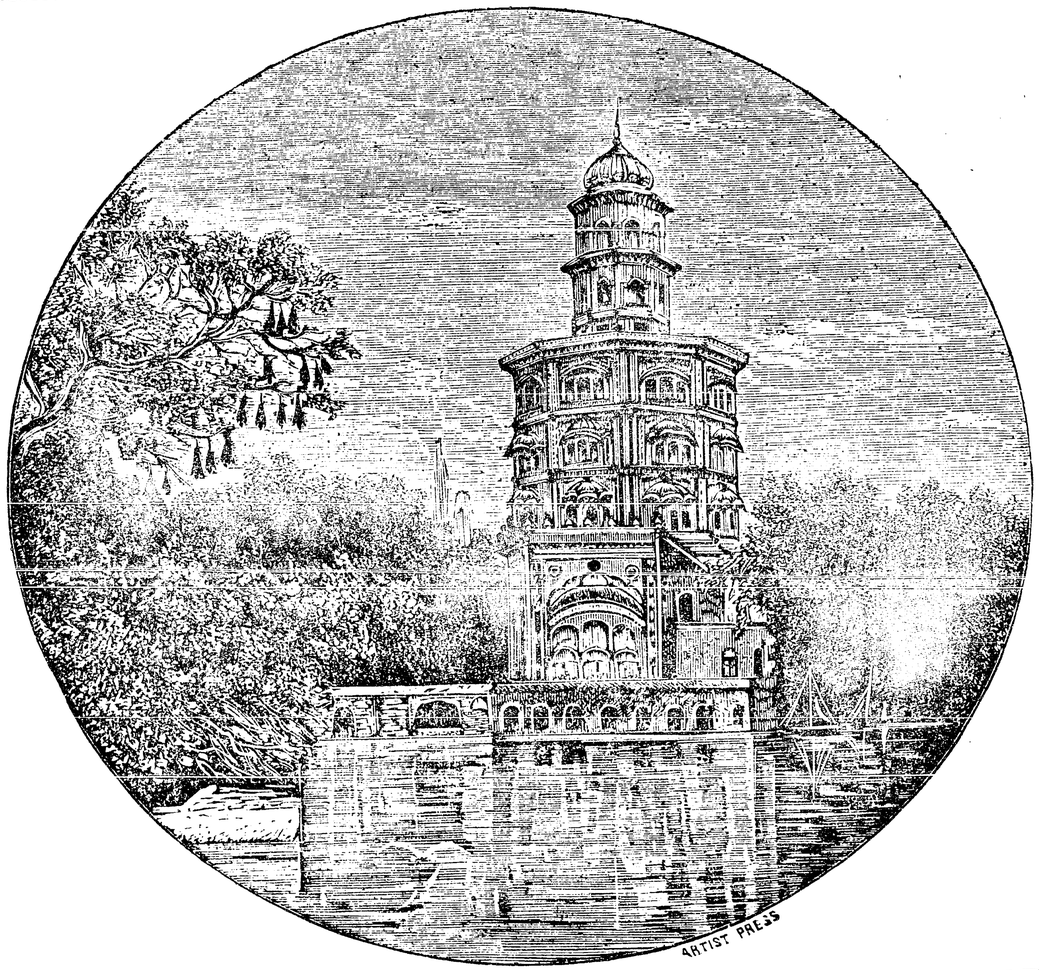

মন্দির হইতে হরণ করিয়া আনিয়া ঐ মন্দিরে বসান হইয়াছে। এক সময়ে মুসলমান রাজাগণ যেমন হিন্দুদের দেব-মন্দির ভাঙ্গিয়া মস্‌জিদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, মহারাজা রণজিৎসিংহ মুসলমানদিগের মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহার প্রস্তর হরণ করিয়া অমৃতসহরের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহার প্রতিশোধ দিয়াছেন।

যাহা হউক এই স্বর্ণ-মন্দির, এই সরোবর ও ইহার সংলগ্ন উদ্যান—এই সকলকে পঞ্জাবীরা গুরু-দরবার বলে। অর্থাৎ ইহা গুরু নানকের দরবার, বসিবার স্থান ছিল। ইহা শিখদিগের একটী প্রধান তীর্থ-স্থান। এই স্বর্ণ-মন্দিরে গুরুদিগের রচিত সংগীতের এক খানি পুস্তক আছে,সেই পুস্তককে শিখেরা দেবতার ন্যায় পূজা করে। তাহার ভোগ দেয় ও আরতি করে; তাহাকে চামর দিয়া বাতাস দেয়। এই গুরু-দরবারে ৩৬৫ দিন ২৪ ঘণ্টা উৎসব চলিতেছে। কি প্রাতে, কি সায়ংকালে, কি দিবা দ্বি প্রহরে, যখন যাও

লোকের ভিড়। সেখানে সমস্ত দিন কেবল ধর্ম্মের চর্চ্চা। সমস্ত দিন গান চলিতেছে; নানক গানের দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিতেন; এই জন্য শিখগণ অত্যন্ত সংগীত-প্রিয়। গুরু-দরবারে সমস্ত দিন গান চলিতেছে। একদল গায়ক উঠিয়া যাইতেছে,আর এক দল আসিতেছে, সংগীতের আর বিরাম নাই। বৈকালে সেখানে এক অপূর্ব্ব শোভা হয়। কোথাও একজন লোক দাঁড়াইয়া ধর্ম্ম কথা বলিতেছে, দশজন দাঁড়াইয়া শুনিতেছে; কোথাও একটী স্ত্রীলোক একখানি গ্রন্থ খুলিয়া পড়িতেছে, দশজন বসিয়া শুনিতেছে; কোথাও তিনজন সুগায়ক উপবেশন করিয়া ভক্তিরসপূর্ণ গান সকল গাইতেছে, দলে দলে লোক স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছে; কোথাও বা একজন বৃদ্ধ বসিয়া আপনার মনে বীণা বাজাইয়া ঈশ্বরের নাম করিতেছে, তাহার শ্বেত বর্ণ দাড়ি বহিয়া চক্ষের জল পড়িতেছে, অনেক গুলি পুরুষ ও স্ত্রীলোক মুগ্ধ হইয়া তাহা দেখিতেছে; কোথাও বা একজন ব্রাহ্মণ শাস্ত্র পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছে; এইরূপে প্রতিদিন বৈকালে সেই বাগানটীতে কেবল ধর্ম্মের চর্চ্চা চলিয়া থাকে। আর কোন কথা নাই। ছোট বড়, পুরুষ স্ত্রীলোক ভেদ নাই। সকলেরই ধর্ম্ম বিষয় বলিবার অধিকার আছে। যাহার যে মত, প্রচার কর নিষেধ নাই; শুনিয়াছি কেবল মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিতে নিষেধ আছে। নতুবা আর যাহার যাহা ইচ্ছা, প্রচার কর। সকলেই কাণ পাতিয়া শুনিবে। শিখেরা এক দিকে যেমন সাহসী আর একদিকে তেমনি বিনীত। তুমি দুইটী ধর্ম্মের কথা বল, তোমার পায়ের জুতা বহিয়া দিবে ও ভৃত্যের ন্যায় সেবা করিবে। গুরুদরবারের বাগানে বেড়াইতেছ, অমনি হয় ত দেখিবে একজন দীর্ঘকায় বীর পুরুষ একখানা পাখা হস্তে আসিয়া তোমাকে বাতাস করিতেছে, কেহ বা তোমাকে মসলা উপহার দিতেছে। গুরু-দরবার এইরূপ স্থান। পাঠক পাঠিকা! তোমরা যদি বড় হইয়া কখনও দেশ ভ্রমণ কর,তাহা হইলে অমৃতসহরে গিয়া এই গুরু-দরবার দেখিও, ইহা দেখিবার উপযুক্ত স্থান।

আশ্চর্য্য কর্ত্তব্য পরায়ণতা।

বালিকাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়ন করা একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম, মিথ্যা কথা না বলা, পরস্পরের সহিত সদ্ব্যবহার করা, পিতা মাতা গুরু জনের আদেশ প্রতিপালন করা, তাহাদিগের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করাও কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

তোমার নিকট যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইবে, তাহা সম্পন্ন করিতে তোমার প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত। যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিবে তাহা করিতেই হইবে। কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রতিপালন করিবার জন্য যে সামান্য লোকে প্রাণ পর্য্যন্তও সমর্পণ করে, তাহার একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে দিতেছি।

"অনেক বৎসর গত হইল ইংলণ্ডের অন্তঃপাতি চেতহাম (Chetham) নামক গ্রামের নয় মাইল

দূরবর্ত্তী কোন এক স্থান হইতে ট্যালবার্ট নামক একজন অল্প বয়স্ক ইংরাজ যুবক ডাক আনয়ন করিত। শীত কালে ইউরোপের অনেক স্থান বড়ই ভয়ানক, জলাশয়, পুষ্করিণী, নদনদী সকলের জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়, মেঘ হইতে যে সকল জল পড়ে তাহাও পড়িতে পড়িতে জমিয়া যায়, তুষার সকল বাতাসে উড়িয়া বেড়ায়। এই শীত কালেরএক দিন রাত্রে যখন সমস্ত স্থান বরফে আবৃত, তখন সেই বালক অশ্বে আরোহণ করিয়া ডাক লইবার জন্য উপস্থিত হইল। পোষ্ট মাষ্টার তাহাকে দেখিয়া বলিলেন;—"এই প্রকার দুর্দ্দিন আমরা শীঘ্র দেখি নাই—আমার মতে তোমার ইহার মধ্যে যাওয়া সঙ্গত নহে।" ট্যালবার্ট উত্তর করিল;—"ইহার মধ্য দিয়া না গেলে কল্য প্রাতে চেতহামের লোকেরা কি প্রকারে চিঠি পত্র পাইবে?" পোষ্টমাষ্টারের বারণ না শুনিয়া ট্যালবার্ট চিঠির ব্যাগ তাহার নিকট হইতে লইয়া পিঠের উপর ঝুলাইয়া দিল; এবং অশ্বারোহণ করিয়া চলিয়া গেল। এক মাইল দুই মাইল যতই যাইতে লাগিল ততই শীতে জড়ীভূত হইতে লাগিল।

এদিকে চেতহামে কয়েকজন লোক ট্যালবার্টের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন; আকাশ একটু পরিষ্কার হইয়াছে,চাঁদ অল্প অল্প দেখা যাইতেছে। এক জন বলিলেন,

"ট্যালবার্ট বোধ হয় আসিবে না"

"সম্ভবতঃ না; কয়টা বাজিয়াছে, আসিবার সময় কি অতীত হইয়াছে?" আর এক জন বলিলেন, "আসিলে শীঘ্রই পৌঁছিবে।"

এই প্রকার কথা বার্ত্তা চলিতেছে এমন সময় অশ্ব প্রবেশ করিল; পোষ্ট মাষ্টার ট্যালবার্টের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "এই প্রকারেই স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হয়। তোমার ব্যাগ দাও এবং ভিতরে আসিয়া গরমহও। কিন্তু কোনই উত্তর পাইলেন না। আবার ডাকিলেন কোনও উত্তর পাইলেন না।

অবশেষে দেখা গেল যে যুবক পথেই শীতে মরিয়াছে। পরের সুবিধার জন্য সে প্রাণত্যাগ করিল।"

উপরোক্ত গল্পটী ইংরাজী একখানি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের দেশে এইরূপ কোন ঘটনা সামান্য লোকের দ্বারা সম্পাদিত হইলে বোধ হয় কেহই কোন সংবাদ লইতেন না।

ভ্রম-সংশোধন।

গতবারের সখায় ১৮ পৃষ্ঠা, ২য় স্তম্ভে, ২৮ পংক্তিতে "পৃথিবীর যেমন বার্ষিক" স্থানে "পৃথিবীর যেমন দুই প্রকার গতি আছে, বার্ষিক গতির দ্বারা এক বৎসরে উহা সূর্য্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে এবং আহ্নিক" পড়িতে হইবে।

ধাঁধা।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

১। ৯+৮+৭+৬+৫+৪+৩+২+১=৪৫
১+২+৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯=৪৫
৮+৬+৪+১+৯+৭+৫+৩+২=৪৫

২। প্রতিধ্বনি।

নূতন।

১। বলত এমন প্রাণী কি আছে যে, প্রাতঃকালে চারিপায়ে, দুই প্রহরের সময়ে দুই পায়ে এবং সন্ধ্যাকালে তিন পায়ে হাঁটে?

স্থানাভাব বশতঃ মন পরীক্ষার কৌশল এবারে দেওয়া গেল না, অন্যবারে দেওয়া যাইবে।

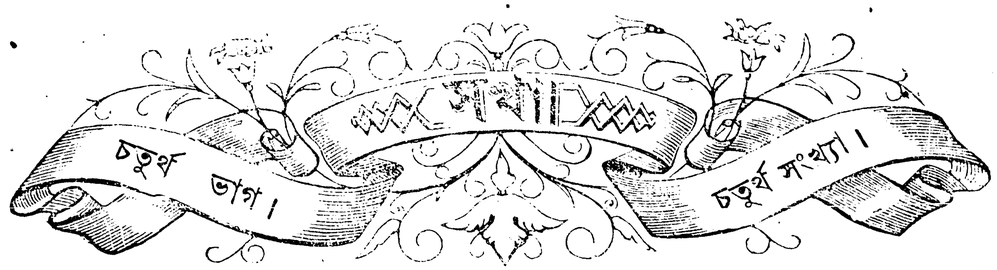

এপ্রিল, ১৮৮৬।

জোসেফ ম্যাট্‌সিনি।

ম্যাট্‌সিনি ইংলণ্ডে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন, তোমরা গত বারে এই পর্য্যন্ত শুনিয়াছ। ইংলণ্ডে তিনি ১৮৪১ সাল হইতে ১৮৪৮ সাল পর্য্যন্ত ছিলেন। এই ৭ বৎসর তিনি কি চুপ করিয়াছিলেন? আপনার দেশের প্রতি যার এতদূর ভাল বাসা সে ব্যক্তি কি চুপ করিয়া থাকিতে পারে? স্বদেশে তাঁহার ন্যায় যে সকল স্বদেশ-হিতৈষী যুবক পড়িয়াছিলেন তিনি গোপনে তাহাদিগকে চিঠি পত্র লিখিয়া সর্ব্বদা পরামর্শ দিতেন। তাহা ছাড়া তিনি আর একটি কাজ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে লণ্ডন নগরে অনেকগুলি গরিব ইটালীয় কারিকর বাস করিত। তাহারা সমস্ত দিন খাটিয়া খাইত। তাহাদের মধ্যে অনেকের বয়স অল্প, লেখা পড়া না জানাতে, ও সর্ব্বদা কুসঙ্গে থাকাতে, তাহাদের স্বভাবচরিত্র বড় মন্দ হইয়া যাইতেছিল, ম্যাট্‌সিনি স্বদেশের লোককে বড় ভাল বাসিতেন, তাই তাহাদের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণে বড় দুঃখ হইল। তিনি তাহাদের জন্য একটী স্কুল খুলিলেন। ঐ স্কুল রাত্রিকালে বসিত। সেখানে তিনি ও তাঁহার কয়েকজন বন্ধু বিনা বেতনে তাহাদিগকে পড়াইতে লাগিলেন। যাহারা কিছু জানিত না তাহারা লেখা পড়া শিখিতে লাগিল, যাহারা কুসঙ্গে বেড়াইয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছিল, তাহারা ভাল কথা শুনিয়া ও ভাল বাসা পাইয়া, শুধ্‌রাইয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে সাত বৎসরে অনেক গরিব লোককে মানুষের মত করিয়া দিলেন। জ্ঞান লাভ করিয়া তাহাদের এত আনন্দ হইল যে, তাহাদের অনেকে স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া এইরূপ গরিবদের জন্য অনেক স্থানে স্কুল করিল।

আগুন যেমন ধোঁয়াইতে ধোঁয়াইতে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তেমনি ইটালীর যুবকদিগের মনে যে স্বদেশ-হিতৈষিতার আগুন এত দিন ধোঁয়াইতেছিল, তাহা ১৮৪৮ সালে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! এক স্থানের অনেক গুলি লোক স্বদেশকে পরাধীনতা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রথমে ক্ষেপিয়া উঠিল। এই খবর যত দূর যায় তত দূর দলে দলে লোক ক্ষেপিয়া উঠে। ভদ্র লোকের ছেলেরা সকল কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে স্বদেশ রক্ষার জন্য সৈন্য দলে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন অষ্ট্রীয়া দেশবাসীগণ ইটালীর রাজা ছিলেন। তাঁহাদের রাজত্ব রক্ষা করা ভার হইল। ইটালীর যুবকেরা তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। কিন্তু এই জয়ের সুখ বেশী দিন থাকিল না। মিলান দেশের

একজন রাজার প্রতারণাতে শত্রুপক্ষ আবার জয় লাভ করিল। ম্যাট্‌সিনি দুঃখিত হইয়া আবার সুইজরল্যাণ্ডে গমন করিলেন। এক বৎসরের মধ্যে রোম নগরের প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, সে নগরের প্রভু পোপ প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন, রোমবাসী প্রজাগণ রাজাকে তাড়াইয়া নিজেরা রাজ্য শাসন করিতে লাগিল। ম্যাট্‌সিনি চির দিন প্রজার পক্ষ, তিনি শুনিবামাত্র রোম নগরে ফিরিয়া আসিলেন। রোমে প্রজাগণ রাজত্ব করিতে লাগিল। নগরবাসীগণ তিন জন প্রধান ব্যক্তিকে পছন্দ করিয়া তাহাদের প্রতি দেশ রক্ষার ভার দিলেন। ম্যাট্‌সিনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। শত শত ভদ্রবংশীয় যুবক সৈন্য-দলে প্রবেশ করিয়া দেশ রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু আবার এক নূতন শত্রু দেখা দিল। ফরাসি দেশের রাজা লুই নেপোলিয়ান রোমের তাড়িত প্রভু পোপের পক্ষ হইয়া রোমবাসীদিগকে পরাজিত করিবার জন্য একদল সৈন্য পাঠাইলেন। তাহারা আসিয়া রোমকে পরাস্ত করিল। ম্যাট্‌সিনি আবার সুইজরল্যাণ্ডে গমন করিলেন।

এই সময় হইতে ইটালীদেশে যে আগুন জ্বলিল তাহা আর নিবিল না, আজ এদেশ বিদ্রোহী হয়, কাল ওদেশ বিদ্রোহী হয়, এইরূপে প্রজারা কেবল আপনাদের দেশকে পরাধীনতা হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৮৫৭সালে দক্ষিণ ইটালীর নেপল্‌স নামক নগরবাসীগণ বিদ্রোহী হইয়া আপনাদের রাজাকে তাড়াইয়া দিল এবং নিজেরা দেশ শাসন করিতে লাগিল। গ্যারিবল্ডী নামক একজন বীর পুরুষ নেপল্‌স জয় করিয়া দিলেন। তিনি নেপল্‌সের সর্ব্ব প্রধান ব্যক্তি হইয়া দেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। ম্যাট্‌সিনি নেপল্‌সে ফিরিয়া আসিলেন এবং গ্যারিবল্ডীকে অন্যান্য দেশকে অষ্ট্রীয়ার দাসত্ব হইতে মুক্ত করিবার জন্য উৎসাহ দিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। গ্যারিবল্ডী ভিক্টর ইমানুয়েল নামক মিলান দেশীয় রাজার হস্তে নেপল্‌স রাজ্যের ভার দিয়া চলিয়া গেলেন। ম্যাট্‌সিনি পুনরায় ইংলণ্ডে গিয়া আশ্রয় লইলেন। এ দিকে ইটালী দেশে ক্রমে এক একটী দেশ অষ্ট্রীয়ার দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে লাগিল এবং ভিক্টর ইমানুয়েল প্রায় সমুদয় ইটালীর রাজা হইলেন।

ম্যাট্‌সিনির মনে বরাবর দুইটী ইচ্ছা প্রবল ছিল, প্রথম ইচ্ছা যে ইটালীর সকল দেশ এক হইয়া এক জাতি হইবে, দ্বিতীয় ইচ্ছা যে ইটালীতে প্রজাগণ স্বদেশ শাসন করিবে, কোন রাজার অধীন হইবে না। তাঁহার প্রথম ইচ্ছা পূর্ণ হইল। ক্রমে ক্রমে ইটালীর এক একটী দেশ বিদেশীয়-দের অধীনতা ত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিল এবং এক রাজার অধীন হইল। সমুদয় দেশে এক স্বাধীনতার ভাব ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় ইচ্ছাটী পূর্ণ হইল না। তিনি দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া আবার ইংলণ্ডে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অল্পদিন পরে সিসিলী নামক দ্বীপের লোকেরা প্রজাদিগের প্রভুত্ব স্থাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তিনি আর এক বার সিসিলী দ্বীপে আসিলেন। কিন্তু এইবারে একজন প্রবঞ্চক তাঁহাকে ধরাইয়া দিল। তাঁহাকে আবার কারাগারে বদ্ধ করিল। কিন্তু তখন ইটালী দেশের লোক তাঁহাকে এত ভালবাসে যে, তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে পারে। পাছে তাঁহাকে কষ্ট দিলে দেশে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয়—এই ভয়ে তাঁহার শত্রুগণ তাঁহাকে কারাগারে ক্লেশ দিতে পারিত না। এমন কি, কিছু দিন পরে

তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। তিনি আবার উৎসাহের সহিত তাঁহার মত প্রচার করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক বৎসর পরিশ্রম করিবার পর ১৮৮২ সালে তিনি আর একবার ইংলণ্ডে যাইবার জন্য বাহির হইলেন। তখন তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল; শরীরের সেইরূপ অবস্থায় আল্পস্ পর্ব্বত পার হওয়াতে, তাঁহার গুরুতর পীড়া জন্মিল। এই পীড়াতে কিছু দিন কষ্ট পাইয়া তিনি ১৮৮২ সালের ১৮ই মার্চ্চ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

সখার পাঠক পাঠিকাগণ! মনুষ আপনার দেশকে কতদূর ভাল বাসিতে পারে দেখিলে ত? বেচারা চির জন্মটা দেশ ছাড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেন; কত বার প্রাণসংশয় হইল; দুইবার কয়েদ হইলেন; বিদেশে পরের মধ্যে কত কষ্ট পাইলেন; তবু স্বদেশের প্রতি তাঁর ভালবাসা কমিল না বরং দিন দিন বাড়িত লাগিল। স্বদেশকে পরের দাসত্ব হইতে উদ্ধর করিব এই ইচ্ছার জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। পরের প্রতি তাঁহার কত ভালবাসা ছিল, তোমরা তাহা শুনিলে, গরিবের প্রতি কি দয়া ছিল তাহাও দেখিলে। যখন তিনি স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়া ইংলণ্ডে ছিলেন, তখনও তিনি কেমন নিজের দেশের গরিব লোকগিকে একত্র করিয়া পড়াইতেন। এমন লোক দেশে জন্মিলে দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়। তোরা যাহাতে ইহাঁর মত হইতে পার সেই চেষ্টা কর

দুটী-বোন্।

(১)

মধুর বসন্ত কাল
দিবা অবসান প্রায়,
রাঙ্গা রবি-ছবি খানি
ধীরে ধীরে চলে যায়।

(২)

মধুর বহিছে বায়ু
শীতল করিছে কায়,
ডালে বসি কত পাখী
সুমধুর গান গায়।

(৩)

দেখিয়া এ সুসময়
দুটী মেয়ে হাসি হাসি
হাত ধরা-ধরি করি
বাগানে বসিল আসি।

(৪)

সরলা সুশীলা বালা
বড় ভাব দু-জনায়,
দুটী ফুল গাঁথা যেন
একটী বোঁটার গায়।

(৫)

দেখি শোভা, দুটী বোনে
মহা পুলকিত-কায়,
বসিয়া বকুল-তলে
পরমেশ-গুণ গায়।

(৬)

পরেতে সুশীলা উঠি
হাসি হাসি মুখে বলে,

"আজ দিদি প্রাণ-ভ'রে
তোমারে সাজাব ফুলে।"

(৭)

এত বলি ছুটে গিয়া,
আঁচল-ভরিয়া কত
তুলি ফুল সযতনে
সাজাইল মনোমত।

(৮)

করতালি দিয়া তবে
হাসিয়া হাসিয়া কয়,
"আহা মরি দিদি আজ
কি শোভা হ'য়েছে হায়।"

(৯)

এত বলি সরলারে
ঘিরি ঘিরি বার বার
করতালি দিয়া দিয়া
গান করে, নাচে আর।

(১০)

সরলা উঠিয়া তবে
মধুর মধুর-হাসে,
বলে "বোন তোমারেও
সাজাইব মন-আশে।"

(১১)

বলিয়া ছুটিয়া গিয়া
কত শত ফুল তুলে,
থরে থরে সযতনে
সাজাইয়া দিল চুলে।

(১২)

গড়িয়া ফুলের বালা
পরাইয়া দিল করে;
গাঁথিয়া ফুলের-হার
গলে দিল থরে থরে।

(১৩)

হাসিয়া হাসিয়া তবে
আনি দুটী চাঁপা ফুল,
ধীরে ধীরে দুটী কাণে
পরাইয়া দিল দুল্।

(১৪)

হ'লে সাজ মনোমত
মুখ-খানি ধরি করে,
সোহাগের চুম দিয়া
বলিল মধুর-স্বরে।

(১৫)

"আহা মরি সুশীলারে,
কি শোভা হ'য়েছে তোর।
চিনিতে না পারি আমি
এই কি সুশীলা মোর?

(১৬)

চল বোন, চল চল
মায়েরে দেখাব আজ,
কতই হবেন সুখী
দেখিয়া তোমার সাজ।"

(১৭)

এত বলি সুশীলার
হাত খানি ধরি করে,
হাসি হাসি মুখ দুটী
চলিল দুজনে ঘরে।

(১৮)

মায়েরে ডাকিয়া বলে,
"দেখ মা এসেছে কারা
চিনিতে কি পার তুমি
তোমার মেয়ে কি এরা?"

(১৯)

হাসিয়া মা আসি কাছে
চুমিলেন গলা ধরি,
বলিলেন "মেয়ে নয়
আকাশের দুটি পরী!"

(২০)

শুনিয়া মায়ের কথা
লাজে মাথা নত ক'রে
মুখেতে মধুর হাসি
দুজনে পলায় ঘরে!

(২১)

আহা এই দুই বোনে
কি সুন্দর ভালবাসা!
দেখিলে জুড়ায় আঁখি
মেটেনা মনের আশা!

(২২)

সরলা সুশীলা মত
তোমরাও হও বোন্,
ভাল বাস পরস্পরে
পিতা মাতা সুখে রোন্!

উকিলের পরামর্শ।

ইউরোপ মহাদেশের মানচিত্রের দিকে চাহিয়া দেখিলে বিলাতের ঠিক দক্ষিণে সমুদ্রপারে যে দেশ দেখিতে পাইবে উহার নাম ফ্রান্স বা ফরাসিদেশ। এই দেশের উত্তর পশ্চিমাংশে, লয়ার নদীর তীরে ন্যাণ্ট্‌স্ নামে একটী বড় সহর আছে। ইহা ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত। এই সহরটী সমুদ্রের উপকূল হইতে ১৩।১৪ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে। কিন্তু মানচিত্রে অল্প স্থানের মধ্যে অনেক দেশ, নগর, গ্রাম, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র দেখাইতে হয়। কাজেই প্রকৃতপক্ষে যাহা ১৩।১৪ ক্রোশ, মানচিত্রে তাহা দুই এক অঙ্গুলি মাত্র। তোমরা যদি ম্যাপে ন্যাণ্ট্‌স্ নগর বাহির করিতে চাও তবে ফ্রান্সের উত্তর পশ্চিমে যেখানে লয়ার নদী সমুদ্রের সহিত মিশিতেছে সেই খান হইতে ঐ নদীর কাল দাগের উপর দিয়া তোমাদের সরু সরু আঙ্গুলের এক কি দেড় আঙ্গুল পূর্ব্ব দিকে আসিলেই ন্যাণ্ট্‌স্ নগর দেখিতে পাইবে। এই ন্যাণ্ট্‌স্ সহর সমুদ্র হইতে যতদূর, ন্যাণ্ট্‌স্ হইতে উত্তর দিকে তাহার কিছু কম দ্বিগুণ পথ চলিয়া গেলে রেন্ নামে একটী ক্ষুদ্র সহর দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা নিম্নে যে ঘটনার উল্লেখ করিতেছি তাহা উহারই সন্নিকটে ঘটিয়াছিল।

রেন্ কলিকাতার মত আধুনিক সহর নহে। সহরটী বহু কালের। এই স্থানটী ভাল ভাল উকিলের আবাসস্থল বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত। এমন কি ইহার নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রাম সমূহের লোকদিগের ধারণা এই যে, উক্ত সহরে গেলেই কোন উকিলের নিকট গিয়া যাহাহউক একটা পরামর্শ লওয়া অত্যাবশ্যক।

একদিন বার্নার্ড্ নামক একজন কৃষক কোন কার্য্যোপলক্ষে রেন্ সহরে গিয়াছিল। কার্য্য শেষ হইলে পর সে মনে মনে ভাবিল, "এখনও যে সময় রহিয়াছে তাহাতে আমি আরও দুই তিন ঘণ্টা এখানে অপেক্ষা করিতে পারি। তবে এমন সুযোগ ছাড়ি কেন? কোন ভাল উকিলের নিকট একটা পরামর্শ লইয়া যাই।"

বার্নার্ড্ রেন্ নগরে ফয় নামক উকিলের বিশেষ সুখ্যাতি শুনিয়াছিল। সকলে বলিত যে, তিনি যে পক্ষে থাকেন সে পক্ষের জয় নিঃসন্দেহ। কৃষক তাঁহার পরামর্শ লওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া তাঁহার কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইল। কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিলে পর উকিল তাঁহাকে আপনার বসিবার ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কৃষক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহাশয়ের অনেক সুখ্যাতি শুনিয়াছি। অদ্য সহরে আসিবার দরকার হওয়াতে ভাবিলাম, আপনার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া যাইব।"

উকিল বলিলেন, "তুমি বোধ হয় কাহারও নামে নালিশ করিতে চাও?"

সরল প্রকৃতি কৃষক উত্তর করিল, "না, মহাশয়! আমার কাহারও সহিত বিবাদ বিসম্বাদ নাই।"

উকিল। "তবে বুঝি কোন বিষয় আশয় বথ্‌রা করিবার জন্য পরামর্শ চাই?"

কৃষক। "না মহাশয়! যাহাদের এক কূয়া হইতে জল খাইতে হয় তাহাদের কি ভাগাভাগি করিলে চলে? আমাদের বংশে কখনও বিষয় ভাগ হয় নাই।"

উকিল। "তবে কি কোন বিষয় কেনা বেচা সম্বন্ধে পরামর্শ লইতে আসিয়াছ?"

কৃষক। "না, মহাশয়! আমার এত টাকা নাই যে বিষয় কিনি, আর আমি এত গরিব হইয়া পড়ি নাই যে, বিষয় বেচিতে হইবে।"

উকিল মহা ফাঁপরে পড়িয়া অবশেষে বলিলেন, তবে তুমি কি চাও, স্পষ্ট করিয়া বল দেখি।"

কৃষক উত্তর করিল, "সে ত আপনাকে আগেই বলিয়াছি। আমি আপনার পরামর্শ চাই। অবশ্য আমি আপনার ন্যায্য ফি দিতে প্রস্তুত আছি।"

কৃষকের ভাব গতিক দেখিয়া উকিলের মুখে একটু হাসি আসিল। অবশেষে তিনি কাগজ কলম হাতে লইয়া কৃষককে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন।

এতক্ষণে উকিল তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছেন মনে করিয়া, কৃষক বড়ই সন্তুষ্ট হইল। সে বলিল, "আমার নাম পিটার বার্নার্ড্।"

"তোমার বয়স কত বৎসর?"

"সাড়ে সাত গণ্ডা কি আট গণ্ডা।"

"তোমার পেসা?"

"সে কি?"

"তুমি কি কাজ কর্ম্ম কর?"

"ওঃ! তার নাম পেসা? তাই বলুন না। আমি চাস বাস করি।"

উকিল মহাশয় কাগজে দুই ছত্র কি লিখিয়া, কাগজ খানি মুড়িয়া সেই অদ্ভুত মক্কেলের হস্তে দিলেন।

কৃষক কাগজখানি পাইয়া বলিল, "ইহার মধ্যেই হইয়া গেল? ভাল, ভাল, আচ্ছা মহাশয়! আমাকে কত দিতে হইবে?"

"তিন ফ্রাঙ্ক (প্রায় দেড় টাকা)।"

উকিল বুঝিয়াছিলেন কিছু মূল্য না লইলে তাঁহার দত্ত পরামর্শের উপর তাঁহার মক্কেলের কখনই শ্রদ্ধা হইবে না। অযত্নলব্ধ পদার্থের প্রতি লোকের বড় একটা আদর দেখা যায় না।

কৃষক উকিলকে তিন ফ্রাঙ্ক দিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। সে যে রেন্ সহরে আসিয়া তথাকার প্রসিদ্ধ উকিলের পরামর্শ গ্রহণের সুবিধা ছাড়ে নাই, এই ভাবিয়া তাহার মনে যে কত আনন্দ হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না।

বার্নার্ডের বাড়ী ফিরিতে চারিটা বাজিল। পথশ্রমে তাহার শরীর বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে মনে করিল, "আজি আর কোন কাজ কর্ম্ম করিব না। অবশিষ্ট সময় বিশ্রাম করিতে হইবে।"

বার্নার্ডের শুষ্ক ঘাসের ব্যবসায় ছিল। আজি দুই দিন হইল মাঠের সমস্ত ঘাস কাটা হইয়া গিয়াছে। ঘাস শুকাইতেও বাকী নাই। ঘরে তুলিলেই হয়। এক জন কৃষাণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঘাস ঘরে তুলিয়া গাদা করা হইবে কি না। বার্নার্ডের পত্নী সেই সময়ে স্বামীর নিকটে বসিয়াছিল। সে কৃষাণের কথা শুনিয়া বলিল, "সে কি? এই সন্ধ্যা কালে ঘাস তুলিতে হইবে? কালিও ত ঘাস তোলা হইতে পারে, তবে আর এই অবেলায় কষ্ট করিবার দরকার কি?"

কৃষকের মন একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। একবার মনে হইল, ঘাস তুলিলেও হয়, আবার আলস্য বোধ হইতে লাগিল। এমন সময়ে তাহার স্মরণ হইল যে, তাহার পকেটে উকিলের পরামর্শের কাগজখানি আছে।

এই কথা স্মরণ হইবা মাত্র সে বলিয়া উঠিল, "একটু থাম। আমার কাছে উকিলের পরামর্শ

আছে। এ বড় সাধারণ পরামর্শ নয়। ইহার জন্য আমার তিন ফ্রাঙ্ক খরচ হইয়াছে। আমাদের এখন কি করা কর্ত্তব্য, ইহা হইতে নিশ্চয়ই জানা যাইবে।" এই বলিয়া বার্নার্ড্ পত্নীর হস্তে উকিলের লেখা কাগজখানি দিয়া বলিল, "তুমি এই লেখাটা পড় দেখি। আমার চেয়ে তুমি হাতের লেখা ভাল পড়িতে পার।"

কৃষক পত্নী কাগজখানি খুলিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা পাঠ করিল।

আজি যাহা করিতে পার, কল্যকার জন্য তাহা ফেলিয়া রাখিও না।

"ঠিক কথা!" বলিয়া বার্নার্ড্ উঠিয়া বসিল। তাহার মনে হইল যেন সহসা অন্ধকারের মধ্যে আলোক আসিল। "আয়রে ছেলেরা সকলে মাঠে যাই। লোকে যে বলিবে, 'বার্নার্ড্ তিন ফ্রাঙ্ক খরচ করিয়া পরামর্শ আনিয়া তাহার মত কাজ করিল না' তাহা কখনই হইবে না। আমি উকিলের পরামর্শ মত চলিব।"—এই বলিয়া বার্নার্ড্ মহোৎসাহে মাঠের দিকে চলিল। তাহার দৃষ্টান্তে সকলেই কাজে লাগিয়া গেল। শীঘ্রই সমস্ত ঘাস ঘরে তুলিয়া গাদা করা হইল। পরে যাহা ঘটিল তাহা দ্বারাই বার্নার্ডের সদ্বিবেচনা ও উকিলের বহুদর্শিতা বেশ বুঝা গেল।

ঐ রাত্রিতেই ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি হওয়াতে নদীর জল বাড়িয়া পথ ঘাট মাঠ প্লাবিত করিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া কৃষকগণ দেখে যে,যে সকল শুষ্ক ঘাস মাঠে পড়িয়াছিল সব ভাসিয়া গিয়াছে। যাহাদের ঘাস এইরূপে নষ্ট হইয়া গেল তাহারা হাহাকার করিতে লাগিল। বার্নার্ডের ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে আর যাহাদের জমি ছিল সকলেরই অত্যন্ত ক্ষতি হইল, কেবল বার্নার্ডের কোন ক্ষতি হয় নাই।

এই ঘটনা হইতে উকিলের প্রদত্ত উল্লিখিত পরামর্শের উপর তাহার শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গেল। সকল কার্য্যেই সে উকিলের পরামর্শ মত চলিতে লাগিল। ইহার ফল এই হইল যে, অতি অল্প দিনের মধ্যে বার্নার্ড্ তৎপ্রদেশের এক জন সমৃদ্ধিশালী কৃষকের মধ্যে পরিগণিত হইল।

সখার পাঠক পাঠিকাগণ! তোমাদিগকে কি বলিয়া দিতে হইবে যে প্রত্যেক কার্য্যে উপরিলিখিত উকিলের পরামর্শ অনুসারে চলা সকলের পক্ষেই কর্ত্তব্য?

অবাধ্যতার প্রতিফল।

প্রথম অধ্যায়।

ঠাকুরমা ও নাতি, নাতিনী।

বাঁয়পুরের দক্ষিণ পাড়ায় নদীর ধারে এক খানি অতি ছোট কুঁড়ে ঘর আছে। সেই ছোট বাড়ীখানির কাছেই আর কোন বাড়ী দেখা যায় না। এ বাড়ীটী দেখিতে অতি সুন্দর। যদিও বাড়ী খানি অতি ছোট, কিন্তু খুব পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন; বাড়ীর সাম্নে একখানি অতি সুন্দর ফুলের বাগান, আর বাড়ীর ভিতরে গৃহস্থের প্রয়োজনীয়

শাক সবজীর বাগান। এই ছোট কুটীর খানিতে বড় বেশী লোক থাকেন না। এক বৃদ্ধা ও তাহার দুটী নাতি নাতিনী, এই তিন জন সেই কুটীরে থাকেন। এই বৃদ্ধাটী অতি সৎ, ধর্ম্মপরায়ণা এবং বুদ্ধিমতী। কিরূপে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সুশিক্ষা দিতে হয়, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানেন। কিরূপে তাহাদের সৎপথে রাখিতে হয় তাঁহার ন্যায় অতি অল্প লোকই জানেন। যেমন গুণবতী ঠাকুরমা নাতি নাতিনী দুটীও তেমনি হইয়াছে। এমন ঠাকুরমার কাছে শিক্ষা পেলে কে আবার না ভাল হয়? নাতিটীর নাম অভয়, বয়স ১৩ বৎসর; নাতিনীটীর নাম কুসুম, সে দশ বৎসরের মেয়ে। ইহাদের দুজনের স্বভাব অতি ভাল।

কুসুমের মন খানি যেন দয়া মায়ায় গড়া। সে কখন কোন রূঢ় কথা বলে না, আর একটী উচ্চ কথা শুনিতেও পারে না। যদি কেহ তাহাকে বকে, অমনি সে কাঁদিয়া ফেলে। কাহার নিষ্ঠুর ব্যবহার তার প্রাণে বড় লাগে। সে কোন প্রকার অন্যায় সহ্য করিতে পারে না। পাছে কোন অন্যায় করে সেই জন্য সে সর্ব্বদাই ভীত। দাদা যদি কোন অন্যায় কাজ করে তবে সে কাঁদিতে বসে। আর কিসে দাদাকে ও ঠাকুরমাকে সুখী করিতে পারে কেবল সেই ভাবনা ভাবে। ঠাকুরমা কোন কাজ করিতে গেলে, অমনি ছুটিয়া যায় ও বলে "ঠাকুর মা তুমি সর আমি করি, তুমি বসে বসে দেখ। তুমি এতদিন করেছ এখন আমার পালা; আমি এখন বেশ কাজ কর্‌তে পারি, না ঠাকুর মা?" কুসুমের কথাগুলি বৃদ্ধার প্রাণে যেন মধু ঢেলে দেয়। মনে মনে বলেন "তুমি চিরদিন বেঁচে থেকে এমন মিষ্টি কথা বল; আমি শুনে প্রাণ জুড়াই।" অভয়ও খুব ভাল ছেলে। সে সাহসী, পরিশ্রমী, মিষ্টভাষী এবং সত্যবাদী। কিন্তু তাহার দোষের মধ্যে সে খেলার ঝোঁকে কখন কখন ঠাকুর মার কথা অবহেলা করে। সেজন্য তাহার অধিক কিছু শাস্তিও পেতে হয় না। কারণ তার ঠাকুর মা নাতি নাতিনী দুটীকে প্রায় বকেন না। যদি কখন কিছু বলিতে হয় তাহা অতি মিষ্ট কথায় বলেন। তবে কুসুম কখন কখন কাঁদ কাঁদ হয়ে বলে "দাদা তুমি ঠাকুর মার কথা শোন না কেন? আহা! তাতে ঠাকুর মার মনে কত কষ্ট হয়। ঠাকুর মা ত ভাল কথাই বলেন।" তখন অভয় বলে "না না! আমি আর কর্‌ব না। তুই কথায় কথায় অত কাঁদিস্ কেন? তোর কান্নার জ্বালায় বাঁচা ভার। তোর দোষের মধ্যে এই প্রধান দোষ।" কুসুম মনে মনে ভাবে "তাইত আমি কি বড় কাঁদি, আর কাঁদিব না।"এই যে বাড়ীর সাম্নের বাগানটী ইহা অভয় ও কুসুমের শ্রমের ফল। তারা দুটী ভাই বোনে প্রত্যহ বিকালে বাগানে খাটে। কুসুম পুকুর হতে ছোট কলসী করে জল এনে এনে বাগানে দেয়। অভয় মাটি খোঁড়ে ও গাছ বসায়। কুসুম বাগান পরিষ্কার করে। বাস্তবিকই বাগানটী দেখিতে যে কি সুন্দর তাহা আর বলিবার নহে। রোজ কত ফুল যে ফোঁটে তাহা বলা যায় না।

গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যাবেলা কেমন বেল, যুঁই ফুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠে। কুসুম রোজ ফুল তুলিয়া ঠাকুরমাকে দেয়। আবার এক দিন কুসুম ফুল তুলিয়া ঠাকুর মাকে সাজাইতে যায় "ঠাকুরমা তোমায় ফুল দিয়া সাজাই, চুল বেঁধে দি, আমার ভাল কাপড় পর তোমায় কেমন দেখায় দেখি। তোমায় খুব সুন্দর দেখাবে। তুমি পর পর, দুটী পায় পড়েছি।" ঠাকুর মা তার

কথা শুনে হাসিয়া বলেন—"দুর পাগ্‌লী দিদি আমায় পর্‌তে নাই। লোকে দেখ্‌লে হাস্‌বে। তুমিই পর। আমার কাজ নাই।" এইরূপ কুসুম সর্ব্বদাই ঠাকুরমাকে সুখী করিতে চায়। পাঠক পাঠিকাগণ হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পার ইহাদের মা বাপ নাই কি? আহা! তোমাদের শুন্‌লে বড় দুঃখ হবে, যখন এই ছেলে মেয়ে দুটী অতি ছোট তখন ইহাদের পিতা মাতার মৃত্যু হয়। তখন কুসুম কেবল দশ মাসের মেয়ে। বৃদ্ধার প্রাণে যে কি ব্যথা লেগেছে তাহা এ পৃথিবীতে কেহ জানে না। তাঁর একমাত্র ধন তাঁকে এ সংসারে একাকী ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। কুসুমের মা অতি লক্ষী মেয়ে ছিলেন। বৃদ্ধা বধুকে যে কি ভাল বাসিতেন তাহা বলিবার নয়। কুসুমের মার মৃত্যুর দুই তিন মাস পরেই তাঁহার পুত্রেরও মৃত্যু হয়। উঃ! এত শোক কি তাঁর সহ্য হয়! তাঁর প্রাণ যে কত কাঁদে তাহা কেহ জানে না। উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে, কেবল তাঁদের দুজনের কথা মনে পড়ে। কিন্তু প্রাণের দুঃখ প্রাণে চেপে রেখে হাসিমুখে বেড়াতে হয়। চোখের জল ফেলিবার সুযোগ তাঁর নাই। ওচোখে দুই ফোঁটা জল দেখিলে ভাই বোন্ অস্থির হইয়া উঠে। "ও ঠাকুরমা কাঁদ কেন, ও ঠাকুরমা কেঁদ না" বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলে! ঠাকুরমা তাদের চোখের জল দেখে অতি কষ্টে নিজের চোখের জল চোখেই থামাইয়া রাখেন। যখন বালক বালিকা দুটী ঘুমাইয়া পড়ে, তখন তাহাদের ঘুমন্ত পবিত্র মুখে বার বার চুম্বন করেন, আর হাত দুটী যোড় করিয়া ইষ্ট দেবতার কাছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন। মনে মনে ভাবেন "হায়রে এরা যদি না হত, তবে আমার আঁধার প্রাণে মাঝে মাঝে কে আলো এনে দিত? এদের ব্যবহার কি চমৎকার! এদের যত্নে, ভালবাসায় আমি কত সুখী। হায়! হায়! এরা অতি দুঃখী, কখন বাপ মায়ের ভালবাসা পায় নাই। এরা কাহাকেও চেনে না। আমিই এদের সর্ব্বস্ব। এরা আমাকে ছাড়া আর কাকেও জানে না। আহা! এরাও কি দুঃখী! বাছারা যে দুঃখী তাহা আদবেই বুঝে না। যত দিন এই ভাবে যায় তত দিনই ভাল, বুঝ্‌লে বড় কষ্ট পাবে। আমার ত এক দণ্ড এ পৃথিবীতে বাঁচ্‌তে ইচ্ছা করে না। এখনই মরিলে আর এক তিল বাঁচিতে চাই না; কিন্তু বাছাদের কথা ভাব্‌লে মনে হয়, আমি হাজার কষ্ট পাই না কেন, আমি গেলে এদের দশা কি হবে। বাপ্‌রে কাজ নাই, যতদিন ভগবান বাঁচিয়ে রাখেন তত দিন এদের সেবা করে সুখী হই।"

অভয় ও কুসুম দুজনার চোখ সর্ব্বদাই ঠাকুরমার উপর। আর ঠাকুরমার চোখ তাদের দুজনের উপর।

এক দিন বিকালে অভয় বাগানের কাজ কর্‌ছে আর ঠাকুরমার সঙ্গে গল্প কর্‌ছে; তখন ঠাকুরমা দরজায় বসে চর্‌কাতে সূতা কাট্‌ছেন। ঠাকুর মা নাতিতে কথা হওয়াতে ঠাকুরমা বলিলেন "দাদার আমার সব ভাল, সব দিকেই সোণার চাঁদ। কেবল দোষের মধ্যে মাঝে মাঝে আমার কথায় অবহেলা করে।"

অভয়। "ঠাকুরমা আমি আর কখন তোমার কথায় অবহেলা কর্‌ব না। তুমি যখন যা বল্‌বে তাই কর্‌ব। আমি ত তোমায় কষ্ট দিবার জন্য ইচ্ছা করে করি না—অমনি হয়ে পড়ে।"

ঠাকুরমা। "আচ্ছা দাদা! তোমায় আর কিছু বল্‌ছি না। দেখ যেন কথা রাখ্‌তে পার। আর যেন কালই কথা ভাঙ্গিতে না হয়।"

অভয়। "না ঠাকুরমা! আর হবে না। তুমি দেখ আমি রাখি কি না।"

ঠাকুরমা শুনে সুখী হলেন। আর কিছু বলিলেন না। পাঠক পাঠিকাগণ আমরাও দেখিব অভয় কেমন করে তাঁর কথা রাখে।

জোয়ার ভাঁটা।

(২য় পাঠ।)

তবারে দেখা গিয়াছে যে, চন্দ্র বা সূর্য্যের আকর্ষণেই জোয়ার ভাঁটা হইয়া থাকে। আজ ঐ বিষয়ের আরও অনেক গুলি কথা লিখিব। মন দিয়া পড়।

"পূর্ণিমা ও অমাবস্যা" নামক যে বিষয় ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে পড়িয়াছ যে, পূর্ণিমার দিন সূর্য্য যখন পশ্চিমে অস্ত যায় চন্দ্র তখন বড় গোলাকার থালাটীর মত পূর্ব্ব দিকে উদয় হইতে দেখা যায়। আবার অমাবস্যার দিন যখন সূর্য্য অস্ত যায় চন্দ্রও সেই সঙ্গে সঙ্গে অস্ত যায়, রাত্রির মধ্যে আর দেখা দেয় না। এরূপ কেন হয়, তা তোমরা সহজেই বুঝিতেছ। পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় একবার আপনি ঘুরে, সেজন্য ঐ সময়ের মধ্যে সূর্য্যকে পৃথিবীর চারিদিক ঘুরিয়া আসিতে দেখা যায়। সূর্য্য সমস্ত সৌর জগতের কেন্দ্র ও পৃথিবীর সম্বন্ধে স্থির। এজন্য উহা আজ ১২টার সময়ে মাথার উপর থাকে, কালও ১২টার সময়ে ঠিক মাথার উপর আসিবে। কিন্তু চন্দ্র সেইরূপ স্থির নহে; উহা পৃথিবীর চারি দিকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে, এজন্য আজ সন্ধ্যা বেলা যদি মাথার উপর দেখা যায়, কাল ঐ সময়ে মাথার খানিকটা পূর্ব্ব দিকে থাকিবে, পরশু আরও একটু,—এইরূপ। এই জন্য সূর্য্য ও চন্দ্র একত্রে চিরকাল থাকে না। এক মাসের মধ্যে এক দিন একত্রে থাকে, ঐ দিন অমাবস্যা, তার পর হইতে ক্রমে পেছিয়া পড়ে ও অবশেষে পূর্ণিমার দিন ঠিক বিপরীত দিকে উপস্থিত হয় এবং আরও ১৫ দিনে আবার একত্র হইয়া থাকে।

চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়েই সমুদ্র ও পৃথিবীকে আকর্ষণ করে, কিন্তু বল দেখি কাহার আকর্ষণের বল অধিক? নিশ্চয়ই বলিবে—সূর্য্যের। কেন না উহা পৃথিবী অপেক্ষা অনেক লক্ষ (১৪ লক্ষ) গুণে বড়, আর চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ছোট। সুতরাং ইহাই মনে হওয়া সম্ভব যে সূর্য্যের আকর্ষণে উৎপন্ন জোয়ার অপেক্ষা চন্দ্রের আকর্ষণে যে জোয়ার উৎপন্ন হয় তাহা অনেক কম হইবে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, বরং বিপরীত; চন্দ্রাকর্ষণেই জোয়ারের তেজ অধিক। আশ্চর্য্য হইও না, ধীরভাবে শুনিলেই বুঝিতে পারিবে।—গতবারেই দেখিয়াছ যে, আকর্ষণের মোট পরিমাণে জোয়ার হয় না। ধরাতলের এক অংশের উপর চন্দ্র বা সূর্য্যের যে আকর্ষণ তাহার অপেক্ষা দূরবর্ত্তী অপর কোন অংশের উপর উহাদের আকর্ষণের যে অল্পতা তাহারই উপর জোয়ার নির্ভর করে। এই নিয়মটী জোয়ার নিয়মের মূল। আবার বলি,—পৃথিবীর এক ভাগের জলকে

চন্দ্র বা সূর্য্য যত বলের সহিত আকর্ষণ করে, যদি তদ্বিপরীত দিকের জলকেও ঠিক সেই পরিমাণ বলের সহিত আকর্ষণ করিত, তাহা হইলে জোয়ার ভাঁটা হইতই না। কেবল এই দুই স্থানে আকর্ষণের পরিমাণ কম বেশী হয় বলিয়াই জোয়ার হইয়া থাকে। ইহা তোমরা গত বারের ছবিতেই বুঝিবে।

উক্ত কম-বেশীর উপরই যদি জোয়ার নির্ভর করিল, তবে সহজেই বুঝা যায় যে সূর্য্যের আকর্ষণে যদি এই তফাৎ চন্দ্রাকর্ষণের অপেক্ষা বেশী হয় তবে সূর্য্যের আকর্ষণেই জোয়ার বেশী হইবে। আর যদি চন্দ্রাকর্ষণে এই তফাৎ অধিক হয় তবে উহাতেই জোয়ার বেশী হইবে। বাস্তবিক শেষটী ঠিক। অর্থাৎ ক যদি সূর্য্য হয়, তবে ব নামক

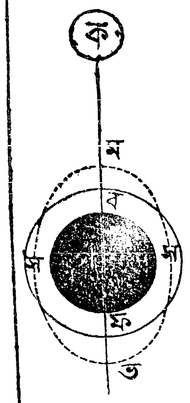

স্থানটীতে সূর্য্যের যত বল, তাহা অপেক্ষা ফ নামক স্থানটীতে উহার আকর্ষণের বল কম (দূর বলিয়া) মনে কর এই তফাৎ যেন A। তার পর, ক যদি চন্দ্র হয়, তবে ব নামক স্থানে উহার আকর্ষণের বল যত, তাহা অপেক্ষা ফ স্থানটীতে কম। মনে কর এই তফাৎ B। এখন কথাটী এই যে A বেশী, কি B বেশী? যদি A বেশী হয় তবে সূর্য্যের আকর্ষণে বেশী জোয়ার হইবে, আর যদি B বেশী হয় তবে চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার বেশী হইবে। দেখা যায় যে B বেশী। সুতরাং চন্দ্রের আকর্ষণেই জোয়ার বেশী প্রবল হইয়া থাকে।

তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, চন্দ্র সূর্য্য অপেক্ষা এত ছোট অথচ উহার আকর্ষণের তারতম্য (তফাৎ) বেশী কেন হয়? তাহার কারণ এই যে, চন্দ্র পৃথিবীর খুব কাছে আছে কিন্তু সূর্য্য বহুদূরে অবস্থিত। মোটামুটি এইটুকু বুঝাইয়াই আমাদিগকে থামিতে হইবে। আর উহার সূক্ষ্ম কারণ বুঝাইবার চেষ্টাও করিব না, কেন না সে গুলি একটু কঠিন ও জটিল। বড় হইয়া আপনারা বুঝিতে চেষ্টা করিও। একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিব, সেই তুলনায় একটা মোটা রকমের ধারণা করিতে যত্নবান হও। মনে কর ব নামক একটী বালককে ২০টী টাকা দিলাম, আর ফ নামক আর একটীকে ১৫টী টাকা দিলাম, তাদের তফাৎ ৫৲ টাকা হইল। আর তুমি ব কে ৫০০ টাকা দিলে আর ফ কে ৪৯৯৲ টাকা দিলে তাদের তফাৎ ১৲ একটী টাকা হইল। এখানে তোমার চেয়ে টাকা আমি অনেক কম দিলাম সত্য, কিন্তু তাদের মধ্যে তফাৎ আমার ৫৲, আর তোমার ১৲টাকা মাত্র। অর্থাৎ উপরিলিখিত Bটী A অপেক্ষা বেশী। কাজেই চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ারের তেজ বেশী হয়।

এখন, আর একটী দরকারী কথা বুঝিতে পারিবে। তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে জোয়ারের যত তেজ অধিক হয় অন্য তিথিতে তত হয় না। ষষ্ঠী সপ্তমীতেও জোয়ার হয়, কিন্তু সে জোয়ার তত বেগবান্ নহে। তাহার কারণ কি?

চন্দ ও সূর্য্য উভয়েই পৃথিবীর চারিদিকে সর্ব্বদা রহিয়াছে। উহারা যেখানেই থাকুক, পৃথিবী ও সাগরের কোন না কোন অংশকে সর্ব্বদাই আকর্ষণ করিতেছে। সূর্য্যের আকর্ষণে যে জোয়ার হয় তাহাকে "সৌর জোয়ার" বলা যায়, আর চন্দ্রের আকর্ষণে উৎপন্ন জোয়ারকে "চান্দ্র জোয়ার" বলে। এই উভয় প্রকারের জোয়ারই সদা সর্ব্বক্ষণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র কোথাও

না কোথাও উৎপন্ন হইতেছে। যে সাগরের উপর যখনই সূর্য্য উপস্থিত হয়, সেখানে ও তদ্বিপরীত ভাগে তখনই "সৌর জোয়ার" উৎপন্ন হয়। তদ্রূপ যেখানে যখনই চন্দ্র থাকে সেখানে ও তার বিপরীত দিকে তখনই "চান্দ্র জোয়ার" উৎপন্ন হয়। এবং তাহাদের উভয় পার্শ্বভাগে "সৌর ভাঁটা" ও "চান্দ্র ভাঁটা" যথাক্রমে হইয়া থাকে। কিন্তু "চান্দ্র জোয়ার" "সৌর জোয়ার" অপেক্ষা অধিক প্রবল দেখা যায়। "সৌর জোয়ার" স্বতন্ত্র ভাবে দেখাই যায় না।

অমাবস্যার দিন চন্দ্র ও সূর্য্য এক দিকে থাকে, এজন্য "চান্দ্র জোয়ার" ও "সৌর জোয়ার" একত্র উৎপন্ন হয় ও দেখা যায়। তখন উহার বল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; নাম—"ভরা কটালের জোয়ার"। আবার পূর্ণিমার দিনও চন্দ্র এবং সূর্য্য পরস্পর বিপরীত দিকে এক রেখায় অবস্থিতি করে, সুতরাং সে দিন চন্দ্রের নীচে সাগরের জোয়ার ও সূর্য্যের বিপরীত দিকের জোয়ার একত্র মিশে, এবং চন্দ্রের বিপরীত সাগরের প্রবল জোয়ার ও সূর্য্যের নীচের জোয়ার একত্র মিলিত হয়। এজন্য সে দিনও "ভরা কটালের জোয়ার" খুব প্রবল হইয়া থাকে।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমার পর হইতে চন্দ্র ও সূর্য্য ক্রমে এক রেখা হইতে সরিয়া যাইতে আরম্ভ করে এজন্য ক্রমে ঐ দুই জোয়ারও একত্র মিলিত অবস্থা হইতে সরিয়া যায়। ক্রমে ষষ্ঠী সপ্তমী তিথিতে সৌর ও চান্দ্র জোয়ার পরস্পরের ঠিক বিপরীত দিকে কার্য্য করে। অর্থাৎ চান্দ্র জোয়ার যেখানে হয় সেইখানে সৌর ভাঁটা পড়িয়া যায় আর সৌর জোয়ারের স্থানে চান্দ্র ভাঁটা পড়ে। কিন্তু এই বিপরীত কার্য্যে (পূর্ব্বে যে কারণ বুঝাইয়াছি তাহার জন্য) চন্দ্রেরই জিৎ হয়। চান্দ্র জোয়ারটীই দেখা যায়, সৌর জোয়ার দেখাই যায় না। কিন্তু চন্দ্রের জোয়ারেরও সেই সময়ে খুব কম জোর হইয়া থাকে। ইহাকেই মাঝীরা "মরা কটালের জোয়ার" কহে। ছবি দেখ।

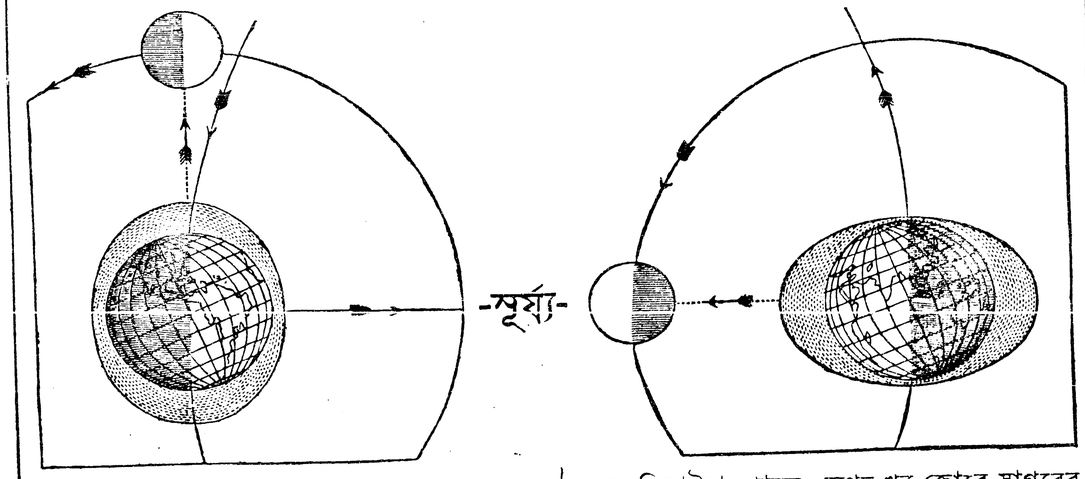

আর একটী কথা। বান্ ডাকে কেন? ভরা কটালের যখন ভাঁটা পড়ে, তখন খুব নীচে জল নামিয়া আসে। নদীর খোলের ভিতরে জলটুকু যেন মিলাইয়া থাকে, অথচ খুব জোরে সাগরের দিকে জল চলিতে থাকে। এমন সময়ে সাগরে প্রবল বেগে ভরা কটালের জোয়ার উঠিয়া সাঁ সাঁ

করিয়া ছুটিয়া নদীর মুখে প্রবেশ করে। এইখানে মহা গোল হয়। ভীষণ বেগে সাগরের প্রবল জোয়ারের জল নদীতে প্রবেশ করিতে যায়, নদীর খোলটাও ভাঁটাতে একেবারে খালি হইয়া রহিয়াছে। কাজেই ছোট একটী জলের পাহাড়, কি উচ্চ একটী জলময় দেয়াল যেন কল কল—সোঁ সোঁ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। সুমুখে যা পায় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসাইয়া ডুবাইয়া, তোলপাড় করিয়া বান্ ডাকে। কি ভয়ানক! কলিকাতার ষাঁড়াষাঁড়ীর বান্ দেখিবার জন্য কত লোক তীরে দাঁড়ায়। মাঝীরা সব ভয়ে আকুল হইয়া আপন আপন নৌকা লইয়া গভীর জলে গিয়া দাঁড়ায়; কেন না, সেখানে কিনারা অপেক্ষা বানের তেজ কম। যেখানে বড় চড়া পড়িয়াছে, সেই খানেই বানের তেজ খুব ভয়ানক।

জোয়ার সম্বন্ধে তোমাদিগকে আর একটী মাত্র কথা বলিব। নদীতে জোয়ার আসিলে জল যেমন সাঁ সাঁ করিয়া উপর দিকে চলিতে থাকে, সাগরে কিন্তু সেরূপ হয় না। তথায় জল কেবল জোয়ারের সময় উচ্চ হইয়া ফুলিয়া উঠে আর ভাঁটার সময় নীচু হইয়া পড়ে। এই উঁচু নীচু হওয়া আর স্রোতের মত চলা খুব তফাৎ। ইহা ঠিক যেন শস্যক্ষেত্রের ঢেউএর মত। ধান্যক্ষেত্রে বাতাস লাগিলে গাছগুলি যেমন ঢেউ খেলায় কিন্তু চলে না, সাগরের জলে জোয়ারের গতিও ঠিক সেই রকম। সেখানকার জল সেইখানেই থাকে, তথাকার জাহাজও সব ঠিক থাকে কেবল একবার খানিকক্ষণ জলটা উচ্চ হইয়া উঠে আর খানিক সময় নীচু হইয়া পড়ে। কেবল চড়াতে বা নদীর মুখেই জোয়ারের জল বেগবান হইয়া গতিপ্রাপ্ত হয়।

ভোঁদড়।

নেক স্থানেই ভোঁদড় দেখিতে পাওয়া যায়। তোমাদের অনেকেই কলিকাতার পশুশালায় গিয়াছ; সেখানে একটা গোল চৌবাচ্ছায় যে কয়েকটা ভোঁদড় রাখা হইয়াছে তাহাদের কাছে ১০।৫ মিনিট দাঁড়াইয়াছ কি? আমি যত দিন সে গুলিকে দেখিতে গিয়াছি, এক দিনও তাহাদের কোনটাকে স্থির হইয়া বসিতে দেখি নাই। এক বার ডুব দেওয়া আর কিছু দূর গিয়া মুখ ভাসাইয়া পুনরায় ডুব দেওয়া,—কাযের মধ্যে তো এই; ইহা লইয়াই বেচারারা এত ব্যস্ত যে দেখিলে বোধ হয় ঐ জলটুকুর প্রত্যেক পরমাণুর সহিত তাহাদের পরিচয় থাকার উপরই ব্রহ্মাণ্ড নির্ভর করিতেছে। তোমরা ইহা দেখিয়া হয় ত মনে করিয়াছ যে ঐরূপ করিয়া তাহারা জলের ভিতর মাছ খোঁজে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মাছ খুঁজিতে হইলেও ঐরূপ করা সম্ভব বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময় কেবল আমোদ করিবার জন্যই ইহারা ঐরূপ করিয়া থাকে।

ভোঁদড়গুলি অত্যন্ত আমোদপ্রিয়। স্বাধীন অবস্থায় তাহাদের বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী জলার ধারে পরিবারস্থ সকলে মিলিয়া যখন খেলা করে, তখন তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয় যেন পৃথিবীতে তাহাদের চাইতে সুখী জীব আর নাই। আমি বন্য ভোঁদড়ের খেলা কখনও স্বচক্ষে দেখি নাই, কিন্তু যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে তাহার চাইতে আমোদজনক দৃশ্য

বড় অধিক নাই। দিনের বেলায় কিন্তু ইহারা তত মন খুলিয়া আমোদ করিতে পারে না; সূর্য্য অস্ত গেলেই তাহাদের আনন্দের সময় হয়। তাহাদের খেলার একটা বেশ নিয়ম আছে। প্রথমে সংগীত, তার পর ব্যায়াম। কোন কোন সময় ব্যায়াম এবং সংগীত এক কালেই চলিতে থাকে। তাহারা কোন্ রাগিণী কোন্ তাল অবলম্বন করিয়া কি গান গায়, তাহা আমি বলিতে সক্ষম নহি; তবে ব্যাপারটা কিরূপ হয় তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। অনেক ছেলের গান গাইবার একটা বাতিক আছে। তাহাদের গানে পৃথিবীর সকল প্রকারের রাগিণী এবং সকল প্রকারের তালই এক সময়ে ব্যবহার হয়। মনে কর এইরূপ কুড়িজন ছেলে তিন রাত্রি বাহিরে বসিয়া চ্যাঁচাইল, আর হিম লাগিয়া তাহাদের গলা বসিয়া গেল——এখন কথা কহিতে গেলে কেবল একটা সাঁই সাঁই শব্দ মাত্র শুনিতে পাওয়া যায়। এখন যদি এই কুড়িজন ছেলে রাত্রিতে নদীর ধারে কোন নির্জ্জন বনে গিয়া গান গায়, আর ম্যাও ম্যাও করে, আর শেয়ালের ডাক ডাকে, আর কাশে, আর নাকে কাঠি দিয়া ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করিয়া হাঁচে, তবে ভোঁদড় পরিবারের গানের কতকটা নকল করিতে পারে। ইহাদের ব্যায়াম উল্টাবাজি। তোমাদের ব্যায়াম-শিক্ষক হয়ত তোমাদিগকে দুই তিনজনে মিলিয়া মাটির উপর উল্টাবাজি করিতে হইলে কিরূপ করিতে হয় তাহা বলিয়া দিয়াছেন। না দিয়া থাকিলেও আমাদের দেশী বাজিকরদিগকে ঐরূপ করিতে অবশ্যই দেখিয়াছ। ভোঁদড়েরা ২০। ২৫টী মিলিয়া একটা পিণ্ডের আকার ধারণপূর্ব্বক ঐ বাজি করে। তবে তোমাদের উল্টাবাজিতে আর তাহাদের উল্টাবাজিতে একটু তফাৎ আছে। তোমরা সমান জমির উপর উল্টাবাজি কর, তাহারা ডাঙ্গার উপর হইতে উল্টাবাজি করিয়া গড়াইয়া জলে পড়ে।

আমি যখন খুব ছেলে মানুষ ছিলাম, তখন

আমাদের বাড়ীতে একটী ভদ্রলোক থাকিতেন। তাঁহার বাড়ীর কাছে অনেক ভোঁদড় আছে। তাঁহার কাছে শুনিয়াছি যে ভোঁদড়ের প্রতিহিংসা লইবার বৃত্তিটা বড় প্রবল। কাহারও উপর কোন কারণে চটিলে তাহাকে সহজে ছাড়িয়া দিতে চাহে না। ঐ ভদ্রলোকটীর মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি প্রায়ই রাত্রিতে ছোট নৌকায় উঠিয়া মাছ ধরিতে যাইতেন। এক দিন নৌকার সম্মুখে একটা ভোঁদড় দেখিতে পাইয়া তাহাকে এক খণ্ড বাঁশ দিয়া গুঁতা মারিলেন। গুঁতা খাইয়া ভোঁদড়টা ক্যাঁচম্যাচ করিয়া উঠিল; আর অমনি নৌকার চারি ধারে কতকগুলি ভোঁদড় মাথা জাগাইল। তিনি বলিয়াছেন যে "সৌভাগ্যের বিষয় সেখানে অনেকগুলি ভোঁদড় ছিল না, সুতরাং তাহারা নৌকা আক্রমণ করিতে সাহস পায় নাই, নতুবা সে দিন তাঁহার প্রাণ লইয়া ঘরে আসাই দায় হইত।"

ভোঁদড়েরা মাছ ধরিয়া খায়; মাছ ধরিতে ইহারা এত পটু যে, কোন কোন দেশের জেলেরা ইহাদের সাহায্যে মাছ ধরিয়া বিস্তর পয়সা উপার্জ্জন করে। ভোঁদড়ের সাহায্যে মাছ ধরাটা খুব সহজ ব্যাপার মনে করিও না। ভোঁদড় মাছ ভাল ধরিতে পারে সত্য; কিন্তু ধরিলে কি হইবে, পেটুক দুষ্টু ছেলের হাতে সন্দেশ দিলে যেরূপ হয়, অশিক্ষিত ভোঁদড়ের উপর মাছ ধরিবার ভার দিলেও সেইরূপই হয়। ভোঁদড় মাছ পাইলেই খাইয়া ফেলে। খাইতে খাইতে পেট ভরিয়া গেলেও মাছ ধরিতে ছাড়ে না। পেট ভরিলে মাছ খায় না, কিন্তু ধরিয়া তাহাকে দাঁতে টুক্‌রা টুক্‌রা করে। সুতরাং তখন ভোঁদড় মাছ না খাইলেও ওরূপ জন্তুকে মাছ ধরিতে দিয়া মৎস্য-ব্যবসায়ীর লাভ অতি অল্পই হয়।

ভোঁদড়কে দিয়া মাছ ধরাইবার ইচ্ছা থাকিলে খুব ছোট ছানা ধরিয়া আনিতে হয়। সেই ছানাকে মাছ খাইতে দিবে না; কেবল নিরামিষ খাওয়াইয়া তাহাকে পুষিবে। ভোঁদড় সহজেই কুকুরের মতন পোষ মানে। কোন জিনিস ছুড়িয়া ফেলিলে কুকুরের ন্যায় ভোঁদড়ও তাহা আনিয়া দিতে শিখিতে পারে। প্রথমতঃ তাহাকে ঐরূপে নানাপ্রকারের জিনিস আনিয়া দিতে শিখাইতে হয়। এই বিষয়টা খুব ভালরূপ শিক্ষা হইলে শুক্‌নো মাছ দিয়া পরীক্ষা করিতে হয়। মাছের ছালের ভিতর খড় পুরিয়া তাহাদ্বারা প্রথমতঃ পরীক্ষা করিলে আরো ভাল হয়। শুক্‌নো মাছ আনিয়া দিতে শিক্ষা হইলে অর্থাৎ যদি দেখ যে ভোঁদড় সেই শুক্‌নো মাছটাকে খাইয়া ফেলিবার মত কোন ভাব প্রকাশ না করে —তাহা হইলে তাহাকে মরা মাছ আনিতে দিবে। মরা মাছের পাঠ ভালরূপ শিক্ষা হইলে তাহাকে নির্ভয়ে জলে ছাড়িয়া দিতে পার।

ভোঁদড়ের লোম অতি কোমল। এই জন্য অনেক লোকে ভোঁদড় মারিয়া তাহার ছাল বিক্রয় করে। সেই ছালে বড়লোকের পা রাখিবার আসন তৈয়ারি হয়; আরো অনেক জিনিস তৈয়ারি হয়।

অনেক স্থানে দেখিয়াছি নদীর পার ঢালু হইলে ছেলেরা তাহাকে জল দিয়া পিছল করিয়া লয়, এবং তাহার উপর দিয়া জলে পিছ্‌লাইয়া পড়িয়া খেলা করে। কানাডা দেশীয় ভোঁদড়গুলিও এই খেলা জানে। সেখানে ঢালু ও মসৃণ বরফের উপর উপুড় হইয়া ভোঁদড়গুলি খেলা করিয়া থাকে। অনেক সময় তাহারা এইরূপে ৪০ হাত পর্য্যন্ত পিছলাইয়া যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—স্থানাভাব বশতঃ এবারে 'বেলুনের প্রবন্ধ' প্রকাশিত হইল না।

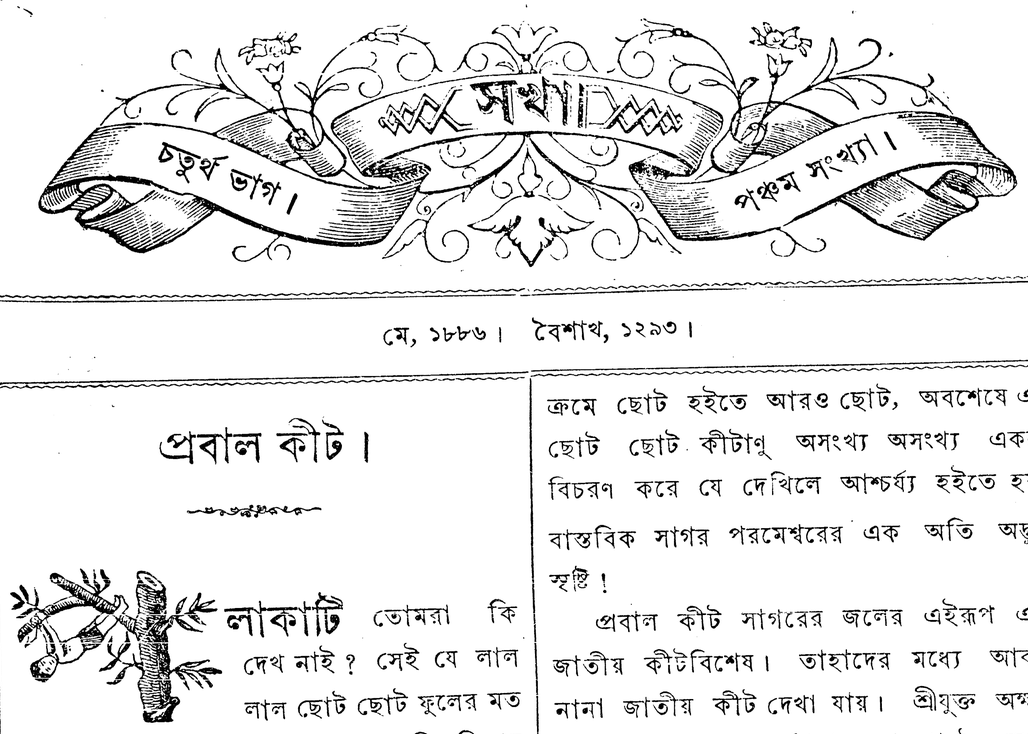

মে, ১৮৮৬। বৈশাখ, ১২৯৩।

প্রবাল কীট।

পলাকাটি তোমরা কি দেখ নাই? সেই যে লাল লাল ছোট ছোট ফুলের মত গাঁথিয়া লোকে মালা করে। ফকিরদিগের গলাতে অনেক সময় দেখা যায়। ঐ পলাকাটি কিরূপে জন্মে তাহার বিবরণ কি জান? প্রথমে সেই দ্বীপনির্ম্মাণকারী প্রবালের বিষয় কিছু বলিব; পরে লাল পলাকাটি সংগ্রহের বিবরণ প্রকাশ করা যাইবে।

তোমরা সকলেই জান যে পুকুরে মাছই কেবল থাকে না, অন্য অনেক রকম পোকা মাকড়ও জলের মধ্যে বাস করে। কত প্রকারের ঝিনুক, শামুক, গুগ্‌লী ও অন্যান্য নানা রকম কীট জলে থাকে। নদীর জলেও সেইরূপ হাঙ্গর, কুম্ভীর ও বড় বড় মাছের সহিত লক্ষ লক্ষ রকমের জীব বাস করিয়া থাকে। কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে যে কত রকম জীব জন্তু আছে কে তাহার গণনা করিতে পারিবে? একদিকে যেমন প্রকাণ্ড পাহাড়ের মত তিমি মাছ সকল সাগরের মধ্যে ডুবিয়া, ভাসিয়া, খেলিয়া বেড়াইতেছে আর একদিকে আবার ক্রমে ছোট হইতে আরও ছোট, অবশেষে এত ছোট ছোট কীটাণু অসংখ্য অসংখ্য একত্রে বিচরণ করে যে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বাস্তবিক সাগর পরমেশ্বরের এক অতি অদ্ভুত সৃষ্টি!

প্রবাল কীট সাগরের জলের এইরূপ এক জাতীয় কীটবিশেষ। তাহাদের মধ্যে আবার নানা জাতীয় কীট দেখা যায়। শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার চারুপাঠে কয়েক জাতীয় কীটের ছবি দিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক ইহাদের মধ্যে অনেক জাতি দেখা যায়। সাধারণতঃ ইহারা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর কীট; এমন কি অনেক অংশে ইহাদিগকে কীট না বলিয়া উদ্ভিদ বলিলেও বলা যায়। কীটদিগের দেহের গঠন প্রণালীর মধ্যে রীতিমত অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকে, তাহাদের দেহে রক্ত সঞ্চালনের ও শ্বাস প্রশ্বাসের নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা দেখা যায় কিন্তু ইহাদের প্রায়ই তাহা নাই। ইহাদের পাকস্থলীর গঠন ও কার্য্যপ্রণালী ঠিক কীটদিগের মত নয়, এবং কীটদিগের স্নায়ু ও শিরাসমূহের যেরূপ সুব্যবস্থা দেখা যায় ইহাদের দেহমধ্যে তাহারও কোন চিহ্ন দেখা যায় না। প্রবাল জাতীয় কীটগুলি অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর কীট, অথবা কেহ কেহ বলেন যে কীট ও উদ্ভিদের মাঝামাঝি এক প্রকার সৃষ্ট বস্তু।

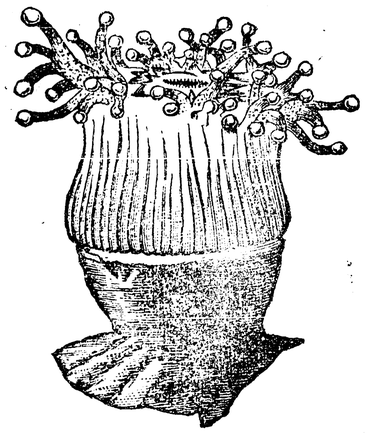

উপরে একটী প্রবাল কীটের ছবি দেওয়া গেল। এই জাতীয় কীটেরাই দ্বীপ নির্ম্মাণ করে। অন্যান্য যে সকল কীট ইংলণ্ড বা অন্য দেশে সচরাচর দেখা যায় তাহারা দ্বীপ নির্ম্মাণ করিতে পারে না। তাহাদের ঐ টবের মত কঠিন আবরণটী থাকে না। তাহাদের শরীরের সমস্তই একটা শক্ত মাংসের মত বা রবারের মত পদার্থে নির্ম্মিত। অর্থাৎ ঝিনুক বা শামুকের দেহ যেরূপ চট্‌চটে ও শক্ত মাংসের দ্বারা তৈয়ারী, সাধারণতঃ এই সকল কীটেরও তাই। তাহারা শৈবালাদির ন্যায় এক স্থানেই চিরদিন লাগিয়া থাকে। কোন কারণে স্থানচ্যুত হইলে শামুকেরা যেমন নিজেদের দেহ কুঞ্চন করিতে করিতে চলে, ইহারাও সেইরূপ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে মাটি বা পাথরের গা বহিয়া বহিয়া যাইতে পারে। শামুকের যেমন দুটী শুঁড় থাকে, ও মাঝখানে একটা বড় রকমের গর্ত্ত থাকে, ইহাদেরও সেইরূপ অনেকগুলি শুঁড় (লেবুফুলের মত, ছবি দেখ) থাকে ও মধ্যস্থলে একটু বড় রকমের একটী গর্ত্তও দেখা যায়। ঐ গর্ত্তটা ইহাদের মুখ আর শুঁড়গুলি ইহাদের ইন্দ্রিয়ের মত। যদি একটু কিছু কঠিন বস্তু তাহাতে লাগে, অমনি সমস্ত শুঁড়গুলি ঝাঁ করিয়া বুজিয়া যায়, আর কীটকে তখন জন্তু বলিয়াই বুঝা যায় না; মনে হয় যেন একটা ছোট দোয়াৎ কি অন্য কিছু পড়িয়া রহিয়াছে। ঐ মুখের মধ্যে যে সকল অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ কীট বা অন্য কোন খাদ্য সামগ্রী পড়ে তাহাই ইহাদের আহার হয়। মুখ দিয়া ক্রমে পেটের ভিতর প্রবেশ করে ও তথায়ই হজম হইয়া খাদ্যের সারভাগ দুধের মত এক রকম জিনিস হইয়া কীটের শরীর পোষণ করে; অবশিষ্ট অসার ভাগ মুখ দিয়াই আবার বাহিরে আসে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সাধারণতঃ এই সকল কীটের দেহ কেবল রবারের মত এক প্রকার কঠিন মাংসে নির্ম্মিত। ইহারা কিন্তু দ্বীপ নির্ম্মাণে সমর্থ হয় না। তাহাদের মধ্যে এক জাতীয় কীটের অঙ্গের নিম্নভাগে এক এক প্রকার কঠিন আবরণ হয় (ছবি দেখ) ইহারাই যথার্থ প্রবাল দ্বীপ নির্ম্মাণকারী কীট। ইহাদের শরীরে দুধের মত যে এক প্রকার পোষণকারী পদার্থ থাকে তাহার সাহায্যে সাগরের লোণা জল হইতে ঐ প্রকার কঠিন আবরণ প্রস্তুত হয়। মানব শিশুদিগের দেহে যেমন রক্তের সাহায্যে দুধ হইতে হাড় প্রস্তুত হয়, ইহাদেরও সেইরূপ দুগ্ধবৎ রক্তের সহিত সাগরের জলের যোগে এই কঠিন আবরণ হইয়া থাকে। ছবিতে যে কীটটী দেখিতেছ তাহার নিম্নের ঐ টবের মত বস্তুটীই এই আবরণ। তদুপরি শুঁড় ও মুখ এবং তাহার মধ্যে উহার উদর ও অন্যান্য অংশ। লাল প্রবাল আর এক জাতীয়।

এইরূপে প্রবালকীট জীবন ধারণ করে। ইহাদের বংশবৃদ্ধির প্রণালীও আশ্চর্য্য। তিন প্রকারে প্রবালকীটদিগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এক একটা কীট অসংখ্য ডিম্ব প্রসব

করে; ঐ সকল ডিম্ব হইতে ছানা বাহির হইয়া ইতস্ততঃ ভাসিয়া ছড়াইয়া পড়ে ও নানা স্থানে পড়িয়া নূতন নূতন কীট হইয়া লাগিয়া থাকে ও ক্রমাগত উক্তরূপে বাড়িয়া উঠে ও আবার প্রত্যেকটা অসংখ্য ডিম পাড়ে! এইরূপে অসংখ্য কোটি প্রবাল কীট জন্মিতেছে, ও বাড়িতেছে। আবার কখন কখন এরূপও দেখা যায় যে, একটা কীট হঠাৎ দুভাগে বিভক্ত হইয়া ফাটিয়া যায় এবং উহার প্রত্যেক অংশ স্বতন্ত্র কীট হইয়া দাঁড়ায়। তোমরা অনেকে পুরুভূজের কথা চারুপাঠে পড়িয়াছ, তাহার অঙ্গের কোন অংশকে ছিন্ন করিলেই তাহা আবার একটী স্বতন্ত্র পুরুভূজ হইয়া উঠে। সেই রূপ একটা প্রবাল দুখানা হইয়া দুটা আলাদা আলাদা প্রবাল রূপ ধারণ করে। আবার সেই দুটা চারিটা হয় ইত্যাদি। এইরূপে, আরও এক উপায়ে প্রবালেরা বর্দ্ধিত হয়। গাছে যেমন কুঁড়ি হয়; ইহাদেরও সেইরূপ কুঁড়ি হইতে দেখা যায়। একটা প্রবালের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক কুঁড়ি হইয়া তাহাদের প্রত্যেকটা আবার স্বতন্ত্র কীট হইয়া উঠে, কিন্তু তাহারা ছড়াইয়া যায় না। প্রথমটীর গায়ে লাগিয়া থাকে। এইগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর। গাছের ডালে পানার মত হইয়া চারিদিকে কুঁড়ি বিস্তার করে এবং চমৎকার দেখায়। বোধ হয় তোমরা এই আকারের প্রবাল অনেক স্থলে দেখিয়া থাকিবে। এই রূপে ডিম ছড়াইয়া, ফাটিয়া ও কুঁড়ি ফুটাইয়া একটী মাত্র প্রবাল অল্প সময়ের মধ্যে কত গুলির উৎপত্তি করে একবার ভাবিয়া দেখ। বস্তুতই এই কীটেরা যদিও আকারে অতি ক্ষুদ্র, তবু এইরূপ নানা উপায়ে এতই অসংখ্য কীট এক স্থানে জমা হয় যে দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। এইরূপে তাহাদের দেহ একত্র জমা হইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দ্বীপ হইয়া রহিয়াছে।

প্রবাল কীট যখন মরিয়া যায়, তখন উহার শুঁড় গুলি ক্রমে পচিয়া গলিয়া পড়ে; ভিতরের অন্যান্য নরম অঙ্গও থাকে না। কেবল নিম্নের এই কঠিন আবরণটী মাত্র মাটি বা পাথরের গায় শক্ত হইয়া লাগিয়া থাকে। তখন উহার আকার নীচের ছবির মত দেখায়।

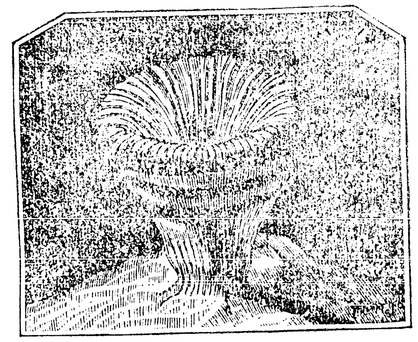

দেখ প্রবাল কীট জীবিত অবস্থায় যেমন সুন্দর, মরিলেও তেমনি সুন্দর; তবে মৃত্যুর পর পৃথিবীর কত উপকার হয় তাহা পরে বুঝিবে।

প্রবালকীটদিগের দ্বীপ নির্ম্মাণ বুঝিতে গেলে আগে নিম্নলিখিত মত তাহাদের কয়েকটী প্রকৃতি বুঝিতে হইবে। বিশেষ মন দেওয়া চাই। (১) ইহারা অধিক শীতে বাঁচে না। যে সকল স্থানে খুব শীতকালেও অন্ততঃ ৬৮° ডিগ্রী উত্তাপ থাকে, সেই সব স্থানে ইহারা বাস করে। তাহাতে দেখা যায় যে বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বে প্রায় ৩০° ডিগ্রী (অর্থাৎ ২১০০ মাইল দূর) পর্য্যন্ত দুটী রেখা টানিলে তাহাদের মধ্যে যে ভূভাগ হয়, ইহারা তাহারই মধ্যে দৃষ্ট হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যভাগে, আরব ও পারস্য উপসাগরে এবং ভারত বর্ষ ও আফ্রিকার মধ্যস্থিত অংশেই ইহাদের খুব আধিপত্য। (২) ইহারা বেশী গভীর

জলে বাঁচে না। ৯০ ফিট গভীর জলেই তাহাদের সাধারণের জীবনের উপযোগী স্থান, কখন কখন ১২০ কি ১৮০ ফিট নিম্নেও বাঁচে, কিন্তু তাহার নীচে আর প্রবাল জীবিত থাকে না। (৩) নদীর মোহানার কাছে ইহারা থাকে না; কারণ ঘোলা জল ও লবণ শূন্য জল তাহাদের জীবনেব বিরোধী। (৪) ইহারা ঢেউ বড় ভাল বাসে এজন্য যেখানে ও যেদিকে সাগরের খুব তুফান বেশী, সেইখানে ও সেই দিকে খুব আনন্দে ইহারা বাড়ে। (৫) যেখানে জোয়ারের সময় জল উঠে না, তত উচ্চ স্থানে বাঁচে না অর্থাৎ ইহারা জলজন্তু; জল না পাইলে মরিয়া যায়। ক্রমশঃ।

রামকান্তের ঘোড়া।

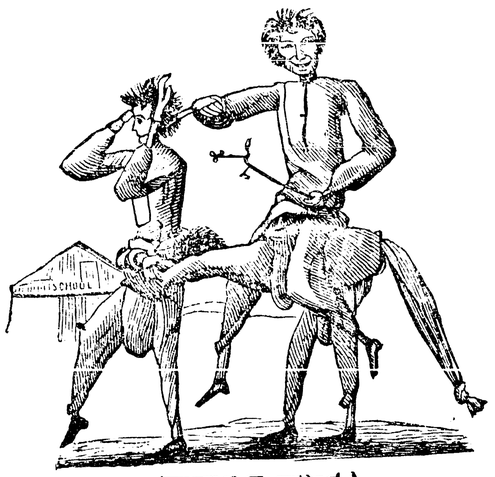

রামকান্তের ঘোড়া!

পক্ষীরাজ ঘোড়া আর তালপত্র সিপাই,
শুনেছত সকলেই, কভু দেখ নাই।
ওই দেখ অশ্বপৃষ্ঠে রামকান্ত বীর,
নবাবের মত বসে আনন্দে অস্থির!

ঘন ঘন কশাঘাত হেট হেট মুখে
লম্বা লম্বা পা দুখানি দোলাইয়া সুখে;
তোমরা অনেক ঘোড়া দেখিয়াছ সবে,
এমন মজার ঘোড়া কে দেখেছ কবে?
যেমন ঘোড়ার রূপ তেমনি সোয়ার,
ঠমকে ঠমকে চলে আনন্দ অপার।

রামকান্তের মাষ্টার।

সহসা পশ্চাতে কেহ কাণ পাকড়িল,
"কে রে" বলে রামকান্ত ফিরিয়া দেখিল;
দেখে সেই রুদ্রমূর্ত্তি ইস্কুলের ঘরে,
যাহার হুঙ্কারে প্রাণ কাঁপে থর থরে;
উড়িল অর্দ্ধেক প্রাণ মুখে কথা নাই,
কাণ নিয়ে টানাটানি এবড় বালাই!
ইস্ক্রুপের মত পেঁচ যত লাগে কাণে,
হাঁ করে রামকান্ত সেই টানে টানে।
সোয়ার পড়িল ধরা ঘোড়া দুইখান;
দ্রুতপদে দুইজনে করিছে প্রস্থান।
উলটি পালটি উঠি দুই শিশু ধায়,
ছট্ ফট্ রামকান্ত কাণের জ্বালায়।
হে শিশু! এরূপ ঘোড়া তুমি যদি চাও,
তবে কাণ মলে মলে কাণটা পাকাও।

নারীর বীরত্ব।

মরা হয় তো জান ইংরাজের পূর্ব্বে মুসলমানেরা আমাদের দেশের রাজা ছিলেন; তাঁহাদের রাজত্ব কালের কথা আজ তোমাদিগকে কিছু বলিব।—

ভারতবর্ষের মধ্যে রাজপুতনা বীর প্রধান স্থান। রাজপুতনার মধ্যে আবার মিবারে যত বীর জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এত বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন প্রদেশে এক সময়ে দেখা গিয়াছে কিনা সন্দেহ। এখানে যুবা বীরত্ব দেখাইয়াছেন, রমণী গৃহের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন; তাঁহাদের তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে শত শত যবন প্রাণ হারাইয়াছে; অনেক সময় শত্রুদিগকেও তাঁহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। ছোট ছোট বালক বালিকাগণও আপনার দেশ হইতে শত্রুদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ হারাইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এখানে কত শত মহাত্মা আত্মত্যাগ, প্রভুভক্তি ইত্যাদির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন!

উদয় সিংহ ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার বাল্য-জীবন আশ্চর্য্য ঘটনাপূর্ণ। উদয় সিংহের পিতার নাম রাণা সঙ্গ (মিবারের রাজাদিগকে রাণা বলে)। রাণা সঙ্গ যখন মুসলমানদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে হত হন, তখন উদয় সিংহের বয়স ৪। ৫ বৎসরের অধিক হইবে না। রাণা সঙ্গের মৃত্যুর পর তিন জন মিবারে রাজত্ব করেন; তৃতীয়ের নাম বনবীর, ইনি দাসী-পুত্র, ইহাঁর মিবারের সিংহাসনে কোন প্রকার অধিকার ছিল না। কিন্তু উদয় সিংহ নাবালক, তাই সকলে কয়েক বৎসরের জন্য বনবীরকে মিবারের সিংহাসন প্রদান করেন। প্রথমতঃ বনবীর রাজা হইতে অস্বীকার করেন কিন্তু শেষে নানা প্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া সম্মত হন।

বনবীর যে দিন মিবারের রাজা হইলেন সেই দিন হইতেই তাঁহার মনোমধ্যে কুবুদ্ধি রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল। রাজ-সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া সততই চিন্তা করিতে লাগিলেন কি করিলে তাঁহার সেই ক্ষমতা চিরস্থায়ী হয়, কি করিলে তিনি আজীবন রাজ-ক্ষমতা ভোগ করিতে পারেন। অনেক চিন্তার পর ঠিক করিলেন যে, রাণা সঙ্গের নাবালক পুত্র উদয় সিংহকে কোন প্রকারে বিনাশ করিয়া তাঁহার পথের কণ্টক দূর করিবেন।

একদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় বনবীর তীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিল। অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া একে একে রাণা সঙ্গের পরিবারস্থ লোকদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। তখন একজন চাকর যে গৃহে বালক উদয়সিংহ শয়ন করিয়াছিলেন তথায় প্রবেশ করিল, এবং শুশ্রূষাকারিণী ধাত্রীর নিকট সমস্ত ঘটনা বলিল। ধাত্রী তাহার কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল; কি প্রকারে এই উপস্থিত বিপদ হইতে রাণা সঙ্গের বংশ রক্ষা করিবে ভাবিতে লাগিল। বালক উদয় সিংহ নিদ্রিত ছিলেন, এই বিপদের বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিলেন না। ধাত্রী ভৃত্যের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটী ঝাঁকার ভিতরে নিদ্রিত বালককে রাখিয়া তদুপরি কতকগুলি আবর্জ্জনা

দিয়া ঝাঁকা ভৃত্যের মস্তকোপরি উঠাইয়া দিল এবং তাহাকে কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে বলিল। ভৃত্য নিদ্রিত বালককে মাথায় করিয়া রাজ বাড়ীর বাহিরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া গেল। সৌভাগ্য বশতঃ বালকের রাজ বাড়ীর মধ্যে নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। এই ধাত্রীর নাম পান্না। উদয় সিংহের সমবয়স্ক পান্নার একটী পুত্র ছিল। ধাত্রী মিবারের রাজপুত্রকে এই প্রকারে চোরের মত গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়া উদয় সিংহের বিছানায় স্বীয় পুত্রকে শোয়াইয়া রাখিল। কিয়ৎকাল পরে বনবীর রক্তাক্ত কলেবরে তীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে গৃহে প্রবেশ করিল, এবং বালক উদয় সিংহ কোথায় শুইয়া আছেন ধাত্রীর নিকট জিজ্ঞাসা করিল। ধাত্রী কিছুই উত্তর দিতে পারিল না, কেবল মাত্র ইঙ্গিত করিয়া যে শয্যায় স্বীয় পুত্রকে শোয়াইয়া রাখিয়াছিল তাহা দেখাইয়া দিল। উন্মত্ত, পাষণ্ড, নারকী বনবীর রাজক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার আশায় হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া দাসী-পুত্রকে উদয় সিংহ মনে করিয়া স্বীয় হস্তস্থিত তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা বিনাশ করিল। ক্ষমতা-প্রিয় রাজা এই প্রকার বিগর্হিত কার্য্যে বিষন্ন হওয়া দূরে থাকুক বরং প্রফুল্লচিত্তে গৃহ হইতে বহির্গত হইল।

পাঠক পাঠিকাগণ! ধাত্রীর প্রভুভক্তির বিষয় তোমরা শুনিলে। এখন যাহার জন্য পান্না তাহার পুত্রকে হারাইল তাহার পরিণাম কি হইল তাহাই অতি সংক্ষেপে বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

বনবীর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলে পর দাসী স্বীয় হৃদয়ের ধন মৃত পুত্রকে লইয়া বাটীর বাহিরে গেল এবং কোন একস্থানে তাহার সৎকার করিয়া ভৃত্যের সঙ্গে গিয়া মিশিল। ধাত্রী এবং ভৃত্য উদয় সিংহকে সঙ্গে লইয়া অনেক ভদ্রলোকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিল, কিন্তু কেহই বনবীরের ভয়ে তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইল না। অবশেষে আশা শাহ নামক এক বণিকের নিকট উপস্থিত হইয়া সাহায্য ভিক্ষা করিলে তিনি অগত্যা আশ্রয় দিতে স্বীকার করিলেন। পান্না সেখানে থাকিলে পাছে বনবীর উদয় সিংহের পলায়ন জানিতে পারে এই ভয়ে সে অন্যত্র গিয়া বাস করিতে লাগিল।

উদয় সিংহ আশা শাহ বণিকের গৃহে লালিত পালিত হইয়া ক্রমে বড় হইতে লাগিলেন। মিবারের সৈন্য সামন্তগণ এবং ভদ্র লোক সকল উদয় সিংহের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই কোন কোন ঘটনায় বনবীরের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন এক্ষণে সুযোগ পাইয়া বনবীরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তৎস্থানে উদয় সিংহকে স্থাপন করিলেন। উদয় সিংহ ১৩ বৎসর বয়সে পিতৃ সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। তিনি মিবারের সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু মিবার শাসনের উপযুক্ত গুণ তাঁহার কিছুই ছিল না। কোন প্রকারে কয়েক বৎসর রাজত্ব করিলেন।

এই সময়ে আকবর সাহ দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া মিবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। সেই যুদ্ধে উদয় সিংহ পরাজিত হইয়া মুসলমানদিগের নিকট বন্দী হন। তাঁহার জনৈক পত্নী মিবারের রাণা মুসলমানদিগের নিকট বন্দী হইয়াছেন শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন; আপনাদিগের সৈন্য সামন্তদিগকে ভৎর্সনা করিলেন এবং অবশেষে কতক গুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অসংখ্য মুসলমান যোদ্ধা সেই বীর-রমণীর অস্ত্রাঘাতে হত হইল; স্বয়ং আকবর সাহ

বীর-নারীর আসাধারণ যুদ্ধ কৌশল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে মুসলমানেরা পরাজিত হন। রাণা মুক্ত হইলেন। পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠবীর আকবর সাহ একজন রাজপুত রমণীর নিকট পরাজিত হইলেন। আরও অনেকবার মুসলমানেরা রাজপুত রমণীর নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছেন।

আকবর সাহ এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আবার মিবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। ভীরু উদয় সিংহ আকবরের আগমন বার্ত্তা শুনিয়াই পলায়ন করিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া মিবার অরক্ষিত ছিল না; চতুর্দ্দিক হইতে রাজপুত নৃপতিগণ স্বীয় স্বীয় সৈন্য সামন্ত লইয়া মিবার রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন; মিবার বীর পরিপূর্ণ হইল। যে সকল বীর নানা স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে পুত্ত ও জয়মল্ আশ্চর্য্য বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখাইয়াছিলেন। পুত্তের মাতা যবনদিগের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া স্বীয় সন্তানকে আপন হস্তে যুদ্ধসজ্জায় সাজাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিলেন; পুত্রের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে যে আপনার বংশ একেবারে লোপ হইবে, তাহা একবারও চিন্তা করিলেন না। কেবল মাত্র সন্তানকে যুদ্ধে পাঠাইয়া মাতা সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না; নিজে পুত্রবধূ সহ যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন; তাঁহাদের সঙ্গে আরো অনেক মহিলা ছিলেন। অদ্য সকলে সুন্দর সুন্দর ভূষণ ও অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে কঠিন লৌহনির্ম্মিত অস্ত্র হস্তে ধারণ করিয়াছেন; সুকুমার শরীরে কঠিন লৌহ বর্ম্ম পরিধান করিয়াছেন। যাঁহারা কোন দিন গৃহের বাহির হন নাই তাঁহারা অগণিত যবন সৈন্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনেক যবন বীর এই রমণীদিগের হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজপুতগণ মাতা স্ত্রী ও ভগিনীদিগের অপূর্ব্ব যুদ্ধকৌশল দেখিয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা আকবরের অসংখ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধে কিছুতেই জয়লাভ করিতে পারিলেন না। যুদ্ধে রাজপুতদিগের পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখিয়া রমণীগণ স্বীয় স্বীয় অসিদ্বারা নিজ নিজ মস্তক ছেদন করিলেন।

তোমাদিগকে আর একটী কথা বলিব। এই যুদ্ধে যে সকল ব্রাহ্মণ হত হইয়াছিলেন তাঁহাদের যজ্ঞোপবীত একত্রে ওজন করিয়া ৭৪॥ মণ হইয়াছিল। তোমরা অনেকেই পত্রপৃষ্ঠে ৭৪॥ লিখিয়া থাক তাহার অর্থ এই—যে কেহ ঐ পত্র খুলিবে তাহার যতগুলি ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত একত্র করিলে ৭৪॥ মণ হয় ততগুলি ব্রাহ্মণহত্যার পাপ হইবে।

নানা প্রসঙ্গ।

(১)

একটী ছোট দীপের নীচে একটী বড় দীপ ধর। ছোট দীপটী নিবিয়া যাইতে চাহিবে কেন, জান? দীপ জলাতে অঙ্গারাম্ল নামক এক প্রকার বায়ু জন্মে সেই বায়ু প্রদীপের শিখার মুখ হইতে বেগে ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায়। বাতাসে অম্লজান নামক বায়ু আছে, তাহা আছে বলিয়াই

আগুন জ্বলিতে পারে। বড় দীপটী ছোট দীপের নীচে ধরিলে, তাহা হইতে অঙ্গারাম্ল বায়ু উঠিয়া ছোট দীপটীকে ঘিরিয়া ফেলে, আর বাতাসের অম্লজান আসিয়া তাহাকে জ্বালাইতে পারে না। কাজেই সে নিবিয়া যায়।

ছোট দীপটী নিবিয়া যাওয়া মাত্রই তাহার জ্বলন্ত পলিতাটী আনিয়া বড় দীপের নীচে (খুব কাছে, কিন্তু একটু ব্যবধান রাখিয়া) ধর; যেন, ছোট দীপের পলিতা হইতে যে ধূম এখনও বাহির হইতেছে তাহা বড় দীপটায় লাগিতে পারে। এখন দেখিবে বড় দীপ হইতে একটু আগুন নামিয়া আসিয়া ছোট দীপটীকে পুনরায় জ্বালাইয়া দিবে। ইহাতে এই বুঝা যায় যে পলিতা হইতে যে ধোঁয়া গিয়া বড় দীপটার গায় লাগিয়াছিল, তাহাতে এমন কিছু জিনিস ছিল যাহা জ্বলে। এই জিনিসটা পলিতার ভিতর হইতেই বাহির হইতেছিল; অত্যন্ত গরম লাগিলেই জিনিসটা বাহির হয়। এই জিনিসটা শূন্যে উঠিয়া যাইবার সময় জ্বলে, আর তাহাকে আমরা দীপের শিখা বলি। গরমে এই জিনিসটা বাহির হইয়া গেলে অনেক সময় আর কতগুলি জিনিস পড়িয়া থাকে, তাহাকে আমরা অঙ্গার, ভস্ম ইত্যাদি নাম দিই।

কাঠের কয়লা জ্বালাইলে তাহা হইতে শিখা বাহির হয় না, পাথর কয়লা জ্বালাইলে তাহা হইতে শিখা বাহির হয়। যে জিনিসটা জ্বলিয়া শিখা হয়, কাঠ জ্বলিবার সময়ই সেই জিনিসটা ফুরাইয়া গিয়াছে—তার পর কয়লা পাইয়াছ। কাজেই কাঠের কয়লায় সেই জিনিসটা নাই, আর তাহা জ্বলিবার সময় শিখাও দেখা যায় না। পাথর কয়লায় কিন্তু সেই জিনিসটা আছে, সুতরাং পাথর কয়লা জ্বলিবার সময় শিখা দেখা যায়। পাথর কয়লার এই পদার্থটা কৌশল ক্রমে বাহির করিয়া তাহা দ্বারা কলিকাতার রাস্তায় রাত্রিকালে আলো দেওয়া হয়। তাহাকে তোমরা গ্যাসের আলো বল। পাথর কয়লা হইতে গ্যাস বাহির করিয়া ফেলিলে যাহা থাকে, তাহার নাম কোক্ কয়লা। কোক্ কয়লা হইতে পাথর কয়লার ন্যায় শিখা বাহির হয় না। তাহার কারণ এই যে, যে জিনিসটা জ্বলিয়া শিখা হয়, তাহার অধিকাংশ অগ্রেই বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে।

দুই পয়সা দিয়া সাহেবদের তামাক খাইবার একটা চীনা মাটির পাইপ ক্রয় কর। তাহার বাটীটীর ভিতরে একখণ্ড পাথর কয়লা পূরিয়া বাটীর মুখ অতি উত্তম রূপে শিব গড়িবার মাটি দিয়া বন্ধ করিয়া দেও। এখন সেই কয়লাপূর্ণ পাইপের মাথাটী আগুনে ফেলিয়া দেও, নলটী যেন আগুন হইতে বাহির হইয়া থাকে। কিছুকাল পরে ঐ নলের মুখে আগুন দিলে সুন্দর গ্যাসের আলো জ্বলিবে।

এই গুলি তোমরা সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। কেবল আমরা বলিতেছি বলিয়া ভাল মানুষের মত মানিয়া লইবার কোন প্রয়োজন নাই। ছোট দীপ আর বড় দীপের পরীক্ষাটী করিবার সময় দেখিবে যেন ছোট দীপটী বড় দীপ অপেক্ষা অনেক ছোট হয়, আর দীপগুলি যেন না কাঁপে।

---

(২)

অনেক দিন হইল একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক আয়র্লণ্ড দেশ দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানে একটী ছেলে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া নানা স্থানে লইয়া গিয়াছিল। বাড়ী আসিয়া সাহেব ঐ ছেলেটীকে কিছু পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করিলেন। সাহেব মদ খাইতে ভাল বাসিতেন সুতরাং পকেট হইতে একটী বোতল বাহির করিয়া তাহাকে কিছু মদ খাইতে দিলেন; ছেলেটী মদ খাইতে চাহিল না। সাহেব তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন তোমাকে আট আনা দিব, তুমি খাও। সে খাইতে অস্বীকার করিল। তারপর সাহেব এক টাকা, তারপর ক্রমে দশটাকা দিতে চাহিলেন, ছেলেটী কোন মতেই মদ খাইতে রাজি হইল না। সে অতি গরিব ছেলে, তাহার গায়ের জামা ছেঁড়া ছিল, কিন্তু সে এত প্রলোভনেও বিচলিত না হইয়া পকেট হইতে একটী মেডেল বাহির করিল; সেটী মদ্যপাননিবারিণী সভার মেডেল। সেই মেডেলটী সাহেবকে দেখাইয়া বলিল "আমি মদ খাইব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আপনার যত টাকা আছে তাহা সমস্ত দিলেও আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না"। এই ছেলেটীর বাপ অত্যন্ত মদ খাইতেন; শেষে মদ্যপান নিবারিণী সভার যত্নে তিনি মদ খাওয়া ছাড়িয়া ভাল লোক হইয়াছিলেন। মরিবার সময় এই মেডেলটী তিনি ছেলেটীকে দিয়া গিয়াছিলেন। বালকের কথা শুনিয়া সাহেব মদের বোতল নিকটবর্ত্তী একটা পুকুরে ফেলিয়া দিলেন, এবং "নিজে আর কখনও মদ খাইব না" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, যাহাতে অন্যেরাও মদ না খায় সেই চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করিলেন।

বেলুন।

গত মাসের সখায় বেলুনের একটা ছবি দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে একটা নঙ্গর আঁকা ছিল। কেহ কেহ আমাদিগকে প্রশ্ন করিয়াছেন "ঐ নঙ্গরটা ওখানে কেন আসিল?"

নঙ্গরটা ওখানে নঙ্গরের কার্য্য করিতেই আসিয়াছে। নৌকার নঙ্গর জলে ফেলিলে নৌকা যেমন আর চলিতে পারে না, বেলুনের নঙ্গরও সেইরূপ। অনেক সময় বাতাসে ঠেলিয়া বেলুনটাকে এমন স্থানে লইয়া যাইতে চাহে যে বেলুনের আরোহী তাহা পছন্দ করেন না। তখন ঐ নঙ্গর নীচে নামাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ করিয়া যদি নঙ্গরটাকে নিম্নস্থ কোন গাছ বা অন্য কিছুতে আট্‌কাইয়া দেওয়া যায় তবেই বেলুন আর চলিয়া যাইতে পারে না।

সম্প্রতি পারিস নগরে এক প্রকার বেলুন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাকে জাহাজের ন্যায় যেখানে ইচ্ছা সেই খানে চালাইয়া নেওয়া যায়। এই বেলুনের আকৃতি ময়রার দোকানে যে চম্‌চম্ বিক্রী হয় তাহার ন্যায়। চম্‌চম্‌টাকে থালের উপরে যে ভাবে কাৎ করিয়া রাখে এই বেলুনও শূন্যে ঠিক্ সেই ভাবে থাকে। বাতাসের ভিতর দিয়া চলিবার সময় যাহাতে বিশেষ বাধা না পায় তাহার জন্যই এরূপ করা হইয়াছে। এই চম্‌চমের এক মাথায় একটী হা'ল। আরোহীদের বসিবার দোলা চম্‌চমের গায় ঝুলিতেছে।

সেই দোলায় বেলুন চালাইবার কল। কলটী তাড়িতের বলে চলে। এই বেলুন চালাইতে তিনটী লোকের আবশ্যক। একজন হা'ল ধরে; আর একজন কল চালায়; আর একজন বালির বস্তাগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখে———অর্থাৎ বেলুন নামিয়া পড়িতে চাহিলে বালির বস্তা খালি করিয়া তাহাকে হাল্‌কা করে।

গরিলা।

আফ্রিকা দেশে গরিলার বাড়ী। গরিলারা বনে থাকে। সে সকল বনে মানুষের বড় একটা চলা ফেরা নাই। সভ্য লোকেরা তো সে স্থানে যাইতে চাহেনই না, সে দেশবাসী অসভ্যেরাও গরিলার ভয়ে সেই সকল বন হইতে দূরে থাকে। শ্রীরামচন্দ্রের সৈন্যদিগের মধ্যে হনুমান মহাশয় যেরূপ ছিলেন, সেদেশী জন্তুদের মধ্যে গরিলাও সেইরূপ। রামায়ণে হনুমানের কথা যাহা পড়িয়াছি তাহাতে তাহার উপর এক প্রকার ভাল ভাবই জন্মিয়াছে। আমি অনেক সময় ভাবিয়া থাকি যে হনুমান এত বড় লোক (থুড়ি, বড় বাঁদর) ছিলেন, কিন্তু হনুমান বলিলে আমরা এত চটি কেন? এ বিষয়ে হনুমান বেচারার একটু বিশেষ দুর্ভাগ্যই ছিল বলিতে হইবে, নতুবা হনুমান খাইয়াছেন বলিয়া কলার মৌথিক আদর কমিল কেন? মৌথিক বলিতেছি, কারণ খাইতে দিলে কাহারও যত্নের ত্রুটি দেখা যায় না। যাহা হউক এ বিষয়টী আমার আলোচনার সামগ্রী নহে। আমি গরিলাদের কথা বলিতেছি, তোমরা তাহাতে মনোযোগ দেও। আমি বলিতেছিলাম হনুমান খুব মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু গরিলা এত প্রধান জীব হইলেও তাহার আচার ব্যবহার গুলি ভাল নহে।

জাতিতে হুকু—নিবাস আফ্রিকা; এই দুই বিষয়ের মধ্যে বিশেষ আশাপ্রদ কিছুই নাই। এর পরেই চেহারা। এ বিষয়ে আমি আর অধিক কি বলিব, যে ছবিখানি দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেই প্রকাশ পাইবে। আমি এরূপ বলিতেছি না যে, আমরা মানুষ, সুতরাং আমরা সুন্দর, আর গরিলা হুকু, সুতরাং সে কুৎসিত। সুন্দরই হউক আর কুৎসিতই হউক, দেখিতে যে অত্যন্ত ভয়ানক সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

গরিলা যে বনে বাস করে, সেই বনে এক প্রকার বাদাম জন্মে; এই বাদামই গরিলার প্রধান আহার। এই বাদাম এত শক্ত যে, একটা হাতুড়ি দিয়া খুব জোরের সহিত ঘা না মারিলে তাহাকে ভাঙ্গা যায় না। ইহারই আধ মণ ত্রিশ সের পরিমাণ অক্লেশে উদরস্থ করিয়া গরিলা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। এই বিষয়টী ভাবিলেই ইহাদের শরীরে যে কি ভয়ানক বল তাহা বুঝিতে পার। এর পর আবার তাহার স্বভাবটী। সেটী বাঘ ভল্লুকেরও অনুকরণের সামগ্রী। গরিলার দেশের লোকেরা তাহার নামেই ভয় পায়। ইহাদের উৎপাতের সম্বন্ধে বিস্তর গল্প বলা হইয়া থাকে। একবার নাকি এক দল গরিলাতে আর সে দেশের কতকগুলি

মানুষেতে একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধে গরিলারা জয়লাভ করিল, এবং কতকগুলি মানুষকে ধরিয়া লইয়া গেল। কয়েক দিন পরে এই লোকগুলি ঘরে ফিরিয়া আসিল;—গরিলারা তাহাদের পায়ের আঙুল ছিঁড়িয়া রাখিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে!

সে দেশীয় লোকের বিশ্বাস যে গরিলারা এক কালে মানুষই ছিল। কালক্রমে তাহাদের আচার ব্যবহার অধোগামী হওয়াতে তাহারা অসভ্যতা প্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ ঘৃণাজনক আকার পাইয়াছে।

পুরুষ গরিলার হাতে অনেক সময় একটী ছোট মুগুর থাকে। সে দেশের লোকেরা বলে যে এই মুগুর লইয়া গরিলা হাতীর সহিত যুদ্ধ করে। তোমরা মনে করিতে পার যে হাতী নিরীহ ভাল-মানুষ, তাহার সঙ্গে গরিলার শত্রুতা হইবার কি কারণ থাকিতে পারে? কারণ বিশেষ কিছুই নাই, কিন্তু গরিলা মনে করে যে যথেষ্ট কারণ আছে। হস্তীর এক অপরাধ—গরিলা যাহা খায়, সেও তাহা খায়। হস্তীর বৃহৎ শরীর দেখিলেই গরিলা ভয় পায়, হয়ত মনে করে যে এত বড় জানোয়ারের আহারের পর তাহার জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। এই কারণেই সে হাতীর উপর এত চটা। এই কারণেই সে হাতী দেখিবামাত্র লাঠি হাতে তাড়া করে। প্রাণপণে হাতীর শুঁড়ের উপর একটী আঘাত করিলে আর দ্বিতীয় আঘাতের দরকার হয় না, হাতী ফ্যাঁ ফ্যাঁ শব্দ করিয়া পলায়ন করে।

সে দেশের লোকেরা হাতীর হাড় খুঁজিতে মাঝে মাঝে বনে যায়। তখন তাহাদের একটী ভয় বড়ই প্রবল থাকে—পাছে জঙ্গলে কখনও একটা গরিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। গরিলা পথের ধারে গাছের পাতার ভিতরে লুকাইয়া থাকে। দৈবাৎ কোন হতভাগ্য লোক যদি সেই পথ দিয়া যায়, তবে আর তাহার রক্ষা নাই। দুই পায়ে গাছের ডাল শক্ত করিয়া ধরিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে হাত বাড়াইয়া তাহাকে গাছে তুলিয়া লয়, তাহার পরক্ষণেই দুই হাতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া প্রচণ্ড বলের সহিত তাহাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরে আর তাহার পাঁজর চূর্ণ করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয়।

মাঝে মাঝে কেহ কেহ গরিলা মারিতে চেষ্টা করেন। এক গুলিতে যদি গরিলা মরিল, তবে ভালই! কিন্তু যদি গুলি খাইয়াও তাহার শরীরে প্রাণ থাকে, তবেই বিপদ। এ সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। একবার একটা গরিলা মরিবার সময় একটা বন্দুকের নল বাঁকাইয়া এবং দাঁতে চ্যাপ্টা করিয়া ফেলিয়াছিল।

দুশেলু নামক এক সাহেব গরিলার কথা শুনিয়া তাহাকে দেখিবার জন্য আফ্রিকায় গিয়াছিলেন, তিনি প্রকাণ্ড এক গ্রন্থে তাঁহার অভিজ্ঞতা লিপি-বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই পুস্তকে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প লেখা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তোমাদিগকে তাহার দুই একটার অধিক উপহার দিতে সাহস পাইতেছি না। উইনউড্-রীড্ নামক এক সাহেব দুশেলুর কিছু পরে আফ্রি-কায় গিয়াছিলেন। দুশেলুর কথাগুলি কতদূর সত্য তাহা জানিবার জন্য তিনি বিস্তর অনুসন্ধান করেন। দুশেলুর পুস্তকে যে সকল লোকের উল্লেখ আছে, তিনি তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাদের সহিত এ সম্বন্ধে অনেক আলাপ করেন; তাহাতে তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, দুশেলুর সকল কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। রীড সাহেব গরিলার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া তারপর গরিলা সম্বন্ধে দুই একটী গল্প বলিয়া আমরা শেষ করিব।

ক্রমশঃ।

মাতার প্রশ্ন।

সরোজিনী আর বিজয় প্রত্যহ সন্ধ্যা-কালে তাহাদের মার নিকট গল্প শুনিয়া থাকে। তিনিও গল্প বলিতে ভাল বাসেন; কিন্তু প্রত্যেক গল্প শেষ হইলেই তাহা-দিগকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। আজ আগ্রহের সহিত মাতা তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, ছোট ছোট দুইটী গল্প বলিতেছি, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর ঠিক চাই, নতুবা আর গল্প শুনিতে পারিবে না।

প্রথমটী শুন:—রামা বলিয়া একটী ধূর্ত্ত শেয়াল মধুপুরের বনে বাস করিত। তাহার একটী ছোট ভাই ছিল; সে অত্যন্ত ধার্ম্মিক। এক দিন দুই ভাই শিকারে বাহির হইল, ছোট ভাই একটী পাখী ধরিল, কিন্তু বড় ভাই কিছুই পাইলেন না। রামা একটু লজ্জিত হইল কিন্তু ক্ষুধায় পেট জ্বলিয়া উঠাতে মনে মনে ভাবিল "কোন মতে চালাকি করিয়া পাখীটি লইতে পারিলে আমার খোরাকের যোগাড় হয়।"

শেয়ালদের মধ্যে একটী বেশ নিয়ম আছে। প্রত্যহ প্রত্যুষে সকলকেই তাহাদের গুরুর নাম করিয়া আটবার প্রণাম করিতে হয়। রামা দেখিল যে তাহার ছোট ভাই সে দিন গুরুর নামে প্রণাম করে নাই, সুতরাং তাহার পুরোহিতের নিকট নালিস করিলে পাখীটি সে পাইতে পারে।

ঘটনাক্রমে পথেই পুরোহিতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রামা তৎক্ষণাৎ তাহার নালিস রুজু করিল। ছোট ভাই পাখীটি মাটিতে রাখিয়া, মৃদুস্বরে বলিল "আমি বাড়ী যাইয়াই প্রণাম করিব।" পুরোহিতও "এত দেরীতে," "এত দেরীতে" বলিয়া চীৎকার করিবামাত্র, রামা পাখীটি মুখে ধরিতে গেল। কিন্তু পুরোহিত মুখভঙ্গি করিয়া রামাকে জিজ্ঞাসা করিল "বাপু হে, তুমি কখন প্রণাম করিয়াছ, শুনি?"

উগরের দিকে চাহিয়া রামা বলিল "কি বলেন মশাই, আমি কি কখন ভুলি; রাত্র শেষ না হতেই আমি প্রণাম করিয়াছি।" "এত শীঘ্র," "এত শীঘ্র" বলিয়া পুরোহিত আবার চীৎকার করিল এবং বলিল "তোমরা দুজনের কেহই পাখীটি পাইতে পার না, কারণ যথা সময়ে কেহই উপাসনা কর নাই; অতএব ইহা পুরোহিতের প্রাপ্য;" এই বলিয়া পুরোহিত পাখীটি লইয়া চলিয়া গেলেন। রামারা দুই ভাই বোকা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল।

বিজয়, বল দেখি গল্পটী শুনিয়া কি উপদেশ পাইলে?

বিজয়। "অতি চালাকের গলায় দড়ি।" রামা যদি সরল মনে পাখীর ভাগ চাহিত, তবে ছোট ভাই, বড় ভাইকে না দিয়া কখনই খাইত না। আমার মতে মনের ভাব সরলভাবে জানান উচিত; কখন প্রকৃত ভাব গোপন রাখিয়া, কাজ করা উচিত নয়।

মাতা। বেশ; সরো বল।

সরোজিনী। নিজে পাপী অথচ পরের পাপ বাহির করিবার জন্য ব্যাকুল হওয়া পাগলের কার্য্য। রামার এটা বুঝা উচিত ছিল যে, সে নিজে দোষী, নালিস করিলে তাহার পাওয়ার কি অধিকার? তারপর ছোট ভ্রাতার উপর ভালবাসা দূরে থাকুক, এমন দ্বেষ! আমি তো বিজয়ের উপর এমন নীচ, জঘন্য ভাব কখনও প্রকাশ করি নাই; ঈশ্বর না করুন কখন করিবও না।

গুলি পরিস্কার এবং অন্যান্য সামগ্রী দেখিলে নূতন বলিয়া বোধ হইত। মনোরমা তাহার পিতার সঙ্গে উদ্যানে কার্য্য করিত, বাগানের কাজ করিতে সে কখন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িত না। যে সময়ে সে পিতার সহিত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিত, সে সময়ে দীননাথ নানা প্রকার চমৎকার গল্প বলিত বলিয়া, মনোরমা পরিশ্রম করিয়া ক্লেশ বোধ করিত না। কখন কখন সে গল্প শুনিবার জন্য এত ব্যাকুল হইত যে পিতা কখন বাগানের কাজ করিতে ডাকিবেন তাহারই অপেক্ষা করিত। মনোরমা বাল্য কাল হইতেই বৃক্ষ লতার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে শিখিয়াছিল। কোন স্থানে একটী নূতন চারা বা ফুল দেখিলে মনোরমার উল্লাসের আর সীমা থাকিত না। দীননাথ তাহার কন্যার এই মনোগত ভাব বুঝিয়াছিল; এবং প্রতিবৎসর নানা স্থান হইতে মনোরমার জন্য নূতন গাছ, বীজ সংগ্রহ করিয়া আনিত। একটী নূতন চারা রোপিত হইলে, মনোরমা প্রতিদিন তাহাতে জল সেচন করিত এবং প্রতিদিন সেই চারাটী কতদূর বর্দ্ধিত হইতেছে তাহা পরীক্ষা করিত। গাছে কুঁড়ি ধরিলে কবে ফুল ফুটিবে সতৃষ্ণ চক্ষে তাহারই অপেক্ষায় থাকিত। আহা! যখন, হরিত বর্ণ গাছগুলিতে ফুল দেখা দিত তখন মনোরমার আহ্লাদ আর দেখে কে? একদিন দীননাথ কহিল "মনোরমে, বাগানের কাজ কত চমৎকার, ইহার ন্যায় পবিত্র ও নির্দ্দোষ আমোদ আর নাই, লোকে কত দাম দিয়া তাহাদের পুত্র কন্যার জন্য কাপড় ও গহনা কিনিয়া দেয়, কিন্তু আমি তাহাদের অনেক অল্প ব্যয়ে তোমায় নূতন নূতন চারা ক্রয় করিয়া দি। বল দেখি, তাহাদের পুত্র কন্যারা অধিক আনন্দ পায়, না তুমি অধিক পাও।"

সে বলিল, "বাবা, কাপড় বা গহনায় এত আমোদ নাই, যখনই একখানা ভাল নূতন কাপড় পরা যায় তখনই একটু আহ্লাদ হয় বটে, কিন্তু সে আহ্লাদ অধিকক্ষণ থাকে না। কিন্তু একটী চারা অল্প মূল্য দিয়া বাগানে বসাইলে নিত্য নূতন আমোদ। বাবা! বলিতে কি জগতের আর কোন আনন্দই ইহার সহিত তুলনা হয় না।"

দীননাথ কন্যার এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ক্রমশঃ।

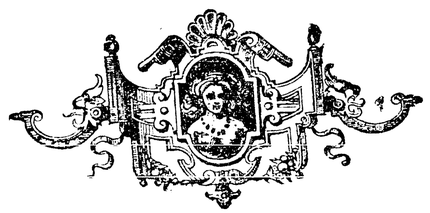

ধাঁধা।

গত মর্চ্চ মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। মনুষ্য।

নব বর্ষের ধাঁধা।

সখা।
চতুর্থ ভাগ। ষষ্ঠ সংখ্যা।

জুন, ১৮৮৬।

কলের জাহাজ।

তোমরা অনেকেই বোধ হয় কলের জাহাজ দেখিয়াছ; এবং কেহ কেহ হয়ত কলের জাহাজে চড়িয়াছ! কিন্তু কে কোথায় এবং কবে প্রথমে ইহার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার সংবাদ বোধ হয় অনেকেই রাখ না। আমরা এই প্রবন্ধে সেই বিষয় তোমাদিগকে কিছু বলিব।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইউনাইটেড্‌ষ্টেটের অন্তর্গত পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া প্রদেশে কলের জাহাজের উদ্ভাবন কর্ত্তা রবার্ট ফুল্টনের জন্ম হয়। তিনি বাল্যকাল হইতেই ছবি আঁকিতে ও নানা রকমের কল প্রস্তুত করিতে ভাল বাসিতেন; কিন্তু প্রথম প্রথম ছবি আঁকিয়াই তাঁহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হইত। তখনকার প্রসিদ্ধ চিত্রকর মেঃ ওয়েষ্টের নিকট হইতে ভালরূপে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন, এবং সেইখানে থাকিবার সময়, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলের জাহাজ চালাইবার একটী উপায় মনে মনে বাহির করেন। তখন তাঁহার বয়স আটাইশ বৎসর মাত্র। তাহার পর হইতে তিনি অবসর পাইলেই এই বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা ও অনুসন্ধান করিতেন। তের বৎসর কাল এইরূপে কাটিয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে তিনি ফ্রান্সেও গিয়াছিলেন। ফ্রান্সে তখন প্রথম নেপোলিয়ন রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য পাইবার আশা নাই দেখিয়া, ১৮০৬

খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ফুল্টন স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। ইংলণ্ডে থাকিবার সময় তিনি ব্রিজওয়াটারের ডিউককে খাল কাটাইবার উৎকৃষ্ট প্রণালী সম্বন্ধে পরামর্শ দেন এবং মারবল প্রস্তর চিরিবার জন্য এক কলের করাত, ছাল্‌টির সূতা পাকাইবার ও কাছি প্রস্তুত করিবার কল, এবং যুদ্ধের সময় বিপক্ষদিগের জাহাজ বিনষ্ট করিবার জন্য এক প্রকার টরপিডো প্রস্তুত করেন।

সে যাহা হউক ঠিক্ কোন্ সময়ে যে বাষ্পের বলে জাহাজ চালাইবার কথা প্রথমে ফুল্টনের মনে উদয় হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি মনে মনে যে পন্থা স্থির করেন, তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে বলিয়া বিশ্বাস ছিল। তাঁহার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে যে কিছু চেষ্টা হইয়াছিল তাহাতে বিশেষ কিছু কাজ হয় নাই। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে মেঃ লিভিংষ্টন নামক এক ব্যক্তি নিউইয়র্কের পার্লিয়ামেণ্ট হইতে এই অনুমতি পান যে, যদি তিনি এক বৎসরের মধ্যে এমন একখানি পোত প্রস্তুত করিতে পারেন যাহা বাষ্প বা আগুনের বলে ঘণ্টায় অন্ততঃ চারি মাইল করিয়া চলিবে, তাহা হইলে ঐ সময় হইতে কুড়ি বৎসর কাল নিউইয়র্কের অধীনস্থ নদী সাগরাদিতে তিনি ভিন্ন আর কেহ ঐরূপ পোত চালাইবার অধিকার পাইবে না। যখন লিভিংষ্টন প্রথমে এই প্রার্থনা করেন তখন যিনি নিউইয়র্কের পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন তাঁহাকে যে কত উপহাস বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু লিভিংষ্টন প্রথমে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইহার পর লিভিংষ্টন ইউনাইটেড্ ষ্টেটের প্রতিনিধি স্বরূপে ফ্রান্স গমন করেন। সেইখানে ফুল্টনের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। উভয়ের উদ্দেশ্য এক বলিয়া ক্রমে এই আলাপ বন্ধুতায় পরিণত হইল এবং তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া পুনরায় ঐ বিষয়ের জন্য চেষ্টা করিতে মনস্থ করিলেন। ফুল্টনের উপর সমস্ত কার্য্যভার অর্পিত হইল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ফুল্টন স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। দেশে আসিয়াই তিনি ৮৬ হাত দীর্ঘ, ১২ হাত প্রশস্ত ও ৫ হাত উচ্চ একখানি প্রকাণ্ড নৌকা গঠন আরম্ভ করিলেন। নৌকা কতক প্রস্তুত হইলে দুই বন্ধুতে দেখিলেন যে তাঁহারা যত মনে করিয়াছিলেন তদপেক্ষা অনেক অধিক অর্থ চাই। এই জন্য তাঁহারা তাঁহাদের কারবারের এক তৃতীয়াংশ বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু সকলেই মনে করিয়াছিল যে তাঁহাদের কলের জাহাজ চালাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে, এই জন্য কেহ সাহস করিয়া অংশ কিনিতে অগ্রসর হইল না। সে যাহা হউক ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে ঈষ্ট রিভার (পূর্ব্ব নদী) নামক নদীতে এই বৃহৎ পোত ভাসান হইল। তাহার পর তাহার উপর বাষ্পীয় কল খাটান হইতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে অনেকে কোনরূপ বাষ্পীয় কলই দেখে নাই। তাহারা হাঁ করিয়া এই সমস্ত কাণ্ড দেখিতে লাগিল। ক্রমে কল বসান শেষ হইল। জাহাজের দুই পার্শ্বে প্রায় ৩১ হাত পরিধি বিশিষ্ট দুই চাকা ঝুলান হইল; তাহাতে জল টানিবার জন্য সারি সারি তক্তা লাগান। লোকে সন্দেহ মিশ্রিত কৌতূহলের সহিত এই মহা ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিল। পরে যখন সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন বাহির হইল যে ৪ঠা আগষ্ট শুক্রবার প্রাতে সাড়ে ছয়টার সময় নূতন কলের জাহাজ ক্লারমণ্ট, নিউইয়র্ক নগরের কর্টল্যাণ্ড

ষ্ট্রীটের নিকট হইতে আরোহী লইয়া দেড় শত মাইল দূরস্থিত আল্‌বানি নামক স্থানে যাত্রা করিবে, তখন সকলেই অবিশ্বাসের হাসি হাসিতে হাসিতে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, ঐ জাহাজে করিয়া আল্‌বানি যাইতে সম্মত হইতে পারে এমন নির্ব্বোধ কেহ আছে কি না।

মানুষ সহজে কোন একটা নূতন ব্যাপারে হাত দিতে চায় না। কলম্বস যখন প্রথমে আট্‌লাণ্টিকের পরপারে গিয়া স্থল আবিষ্কার করিবার কথা উত্থাপন করেন তখন লোকে তাঁহাকে কতই না উপহাস করিয়াছিল; সাহায্যের জন্য তাঁহাকে কত দেশ বিদেশেই না ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনায় সপ্রমাণ হইল, কলম্বসের ভুল কি তাঁহাকে যাহারা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল তাহাদের ভুল। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপে কেবল কলম্বসের নাম করিলাম। কিন্তু ইতিহাস অন্বেষণ করিলে দেখা যায় যে, যাঁহারা নূতন কিছু বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় অনেকেই অপরের নিকট হইতে সাহায্য ও উৎসাহের পরিবর্ত্তে বিপক্ষতা ও উপহাস ভিন্ন আর কিছুই প্রাপ্ত হন নাই। অনেক লাঞ্ছনা, অনেক কষ্টভোগ করিয়া তবে তাঁহারা আপনাদের কার্য্য সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কলের জাহাজের উদ্ভাবক ফুল্টনের বেলাও তাহাই হইয়াছিল। ক্লারমণ্ট নামক কলের জাহাজ প্রস্তুত করিতে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল! তাহার উপর আবার সাধারণের উপহাস। তাঁহার অতুল অধ্যবসায়ের শেষ ফল কি হইল তাহা আমরা পরে পাঠক পাঠিকাদিগকে জানাইব।

গরিলা।

দুশেলু সাহেব নিম্ন লিখিত গল্পটী বলিয়াছেন।—"আমরা একটা অন্ধকারময় উপত্যকার দিকে চলিলাম। গ্যাম্বো (দুশেলুর আফ্রিকা দেশীয় ভৃত্য) বলিয়াছিল, সেখানে শীকার (গরিলা) মিলিবে। * * * আমাদের দলের লোকেরা পৃথক হইয়া চলিল। গ্যাম্বো আর আমি একত্র থাকিলাম। একজন সাহসী লোক একা একদিক পানে চলিল, সে মনে করিয়াছিল সেই দিকে গেলে গরিলা পাওয়া যাইবে। অবশিষ্ট তিন জন অন্য এক দিকে চলিল। এইরূপে পৃথক হইয়া আমরা একঘণ্টা কাল ছিলাম, এমন সময়ে গ্যাম্বো আর আমি আমাদের অতি অল্পদূরে একটা বন্দুকের শব্দ শুনিলাম। তার পরক্ষণেই আর একটা আওয়াজ হইল। আমরা অবিলম্বে সেই দিক লক্ষ্য করিয়া চলিলাম; আমরা মনে করিয়াছিলাম যে একটা মরা গরিলা দেখিতে পাইব। এই সময়ে ভয়ানক শব্দে বন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। গ্যাম্বো অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া আমার বাহু ধরিল। আমরা খুব তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলাম, মনে অত্যন্ত ভয় হইতে লাগিল। বেশী দূর যাইতে না যাইতেই দেখিলাম, আমরা যাহা ভয় করিতেছিলাম তাহাই হইয়াছে। যে বেচারা সাহস করিয়া একাকী চলিয়া গিয়াছিল, তাহাকে সেই স্থানে পতিত দেখিলাম। তাহার রক্তে সেইস্থান ভাসিয়া যাইতেছিল। প্রথমে বোধ হইয়াছিল যেন তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহার নাড়িভুড়ি পেট ফাটিয়া বাহির হইয়া

পড়িয়াছে। পাশেই বন্দুকটা পড়িয়া আছে—বন্দুকের কাঠের অংশটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, নলটা চ্যাপ্টা হইয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। গরিলার দাঁতের দাগ তাহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। আমরা তাহাকে তুলিলাম। আমার কাপড় ছিঁড়িয়া তাহার ঘায় পটি বাঁধিয়া দিলাম। একটু ব্রাণ্ডি খাইতে দিলে পর তাহার চৈতন্য হইল—অতি কষ্টে সে কথা কহিতে লাগিল। সে বলিল যে হঠাৎ সে গরিলাটার সামনে পড়িয়া গিয়াছিল; তখন সেটা পলাইতে চেষ্টা করে নাই। সেটা একটা মস্ত পুরুষ গরিলা; দেখিতে ভয়ানক হিংস্র বলিয়া বোধ হইল। জঙ্গলের সে স্থানটা অন্ধকার ছিল, বোধ হয় অন্ধকারের জন্য তাহার লক্ষ্য ঠিক হয় নাই। সে বলিল যে সে খুব মনোযোগ পূর্ব্বক সন্ধান করিয়াছিল, এবং কেবল মাত্র আটফিট দূর হইতে গুলি করিয়াছিল। গুলিটা এক পাশে লাগিয়াছিল। গুলি খাইয়াই সেটা বুক চাপড়াইতে লাগিল আর ভয়ানক রাগিয়া তাহার দিকে আসিতে লাগিল। দৌড়িয়া পালান তখন অসম্ভব, দশ পা যাইবার পূর্ব্বেই তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে। সে দাঁড়াইয়া রহিল, এবং যত শীঘ্র সম্ভব পুনরায় বন্দুক ভরিল। পুনরায় গুলি করিবার জন্য যেই সে বন্দুক উঠাইতেছিল, অমনি গরিলাটা তাহার হাত হইতে সেটাকে কাড়িয়া লইয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। পড়িবার সময় সেটা ছুটিয়া গেল। তারপর ভয়ানক শব্দ করিয়া সেই জানোয়ারটা তাহার পেটে আঘাত করিল। সেই আঘাতেই পেট কাটিয়া নাড়িভুড়ির কিয়দংশ বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। রক্তাক্ত শরীরে সে মাটিতে পড়িয়া গেল। গরিলাটা তাহাকে ছাড়িয়া বন্দুকটাকে ধরিল—ইহা দেখিয়া সে বেচারা মনে করিল যে বুঝি বন্দুক দিয়া তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া দিবে। কিন্তু গরিলা বোধ হয় সেটাকেও শত্রু মনে করিয়াছিল—সুতরাং সে তাহাকে দাঁতে চিবাইয়া চ্যাপ্টা করিয়া দিল।"

আর এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন—"আমরা নিঃশব্দে যাইতেছিলাম, হঠাৎ একটা শব্দ শুনিতে পাইলাম, আর তখনই একটা স্ত্রী-গরিলাকে দেখিলাম। একটী অতি শিশু গরিলা তাহার বুকে ঝুলিয়া দুধ খাইতেছে। মাতা তাহার পিঠ চাপড়াইতেছিল আর স্নেহের সহিত তাহাকে চাহিয়া দেখিতেছিল। দেখিয়া আমার এত ভাল বোধ হইল এবং আমার প্রাণে এত লাগিল যে আমি সহসা গুলি করিতে চাহিলাম না। আমি ইতস্ততঃ করিতেছি, এমন সময় আমার সঙ্গের একজন শীকারি তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিল, সেটা অমনি পড়িয়া গেল। মাতা পড়িয়া গেলে ছানাটী তাহাকে জড়াইয়া ধরিল আর চীৎকার করিয়া তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিল। আমি সেই স্থানে গেলাম। আমাকে দেখিয়া বেচারা তাহার মায়ের বুকে মাথা লুকাইল। ছানাটী চলিতেও পারিত না; কামড়াইতেও শিখে-নাই; সুতরাং আমরা সহজেই তাহাকে ধরিতে পারিলাম। আমি সেটীকে লইয়া চলিলাম; সঙ্গের লোকেরা তাহার মায়ের শরীরটা বাঁশে করিয়া বহিয়া আনিল। যখন আমরা গ্রামে আসিলাম, তখন আর এক দৃশ্য দেখা গেল। লোকেরা মরা গরিলাটাকে মাটিতে রাখিল, আমি ছানাটীকে কাছে রাখিলাম। তাহার মাকে দেখিবামাত্র সে হামাগুড়ি দিয়া তাহার কাছে গেল এবং দুধ খাইতে চেষ্টা করিল। দুধ না পাইয়া হয়ত মনে করিল যে একটা কিছু

হইয়াছে। তখন সে অতিশয় দুঃখের সহিত 'হূ হূ হূ'! বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, আমার প্রাণে বড়ই দুঃখ হইল। সে দুধ ছাড়া আর কিছুই খাইতে পারিত না, আমিও দুধের যোগাড় করিতে পারিলাম না। সুতরাং দুইদিন পরে বেচারা মরিয়া গেল।" পশুদের প্রতি কি নির্দ্দয় ব্যবহার! সখার পাঠক পাঠিকা শুনিয়া হয়ত তোমাদের মনে ঘৃণা জন্মিতেছে। ঘৃণা জন্মিবারই কথা।

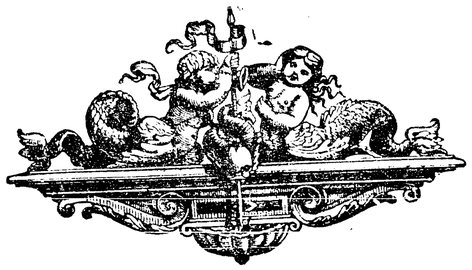

ভিখারিণী মেয়ে।

১

দিনমান যায় যায় প্রায়,
গেল রোদ গাছের আগায়।
কে গাইছে পথে বসি এমন সময়—
না না না আমারি ভুল, গান ও তো নয়;
আপন প্রাণের ব্যাথা ক'য়ে,
কাঁদে এক ভিখারিণী মেয়ে!

২

কত দুখে—আহা রে! না জানি
শুকায়েছে সোণামুখ খানি!
ছেঁড়া বাস যুড়ে তেড়ে ঢাকিয়াছে কায়,
কত দিন তেল বুঝি মাখেনি মাথায়!
আমার স্নেহের ভাই বোন!
কি ব'লে সে কাঁদে ঐ শোন।

৩

"এ জগতে কেউ মোর নাই
আমি হায় ভিখারিণী তাই;
লোকের দুয়ারে যাই ভিক্ষা দে'মা' ব'লে,
ঘর নাই, তাই রেতে থাকি তরুতলে!
কিছু আর নাহিক সম্বল
সবে ধন নয়নের জল।

৪

"ছেলে মেয়ে পথ বেয়ে যায়,
এ দুখিনী নীরবে তাকায়;
ঘৃণা করে পাছে, ভেবে কথা বলি নাই,
তারা কেউ নয় মোর আপনার ভাই!—
তাই তারা আমাকে ডাকে না,
মোর কথা ভুলেও ভাবে না!

৫

"ত্রিসংসারে কে আছে আমার
কে মোরে ভাবিবে আপনার
আপনা আপনি কাঁদি, কেউ নাহি শোনে,
আমারে জগতে বুঝি কেউ নাহি চেনে!
এ দেশে তো এত আছে লোক
মোর তরে কেবা করে শোক?"

৬

"হায় বিধি, আমার কপালে
মরণ আছে কি কোন কালে?—
বাবা গেছে, দাদা গেছে, মাও গেছে, চলে
একা আমি পড়ে আছি এত সব ব'লে;
ধনী, গুণী তাড়াতাড়ি মরে
আমাদের যমেও না ধরে!

৭

"তিন দিন ভাত নাই পেটে
চলিতে পারিনে পথ হেঁটে!

আকাশে উঠিছে মেঘ, উড়িছে পরাণ ;
যদি আসে ঝড় জল, কোথা পাব স্থান ?
এই মাত্র ভিক্ষা দাও হরি !
আজি যেন একেবারে মরি।

৮

"দারুণ দুঃখের জ্বালা সয়ে
বেঁচে আছি আধ-মরা হয়ে,
এখন বাসনা শুধু মরণ মরণ!
মরণের কোলে থাকি করিয়া শয়ন।
এ জগতে কেউ যার নাই
মরণ ! তুমি রে তার ভাই !" !!

৯

কচি মুখে এ বিষাদ গান
শুনে কার ফাটে না পরাণ !
বালক বালিকা আয় মোরা ছুটে যাই,
দুঃখিনীর আঁখি জল যতনে মুছাই ;
ওরে যার দয়া নাহি হয়,
কেনরে সে দেহ ভার বয় !

১৯

চল চল ওর হাত ধরে
আমরা আনি গে ডেকে ঘরে ;
এ জগতে কেউ ওর আপনার নাই
কেউ হব বোন মোরা, কেউ হব ভাই
তাহ'লে ও বেদনা ভুলিবে ;
তাহ'লে ও কতই হাসিবে !

নানা প্রসঙ্গ।

নং ১

দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল।

একটা জানোয়ারের এক এক প্রকার দুর্ব্বলতা থাকে। একজন শুনিল যে গায়ের পিরাণ খুলিয়া ফেলিবার মতন করিয়া পা উল্টাইয়া মাথার উপর পর্য্যন্ত আনিয়া, তার পর মাথা নোঙাইয়া পেছনের দিকে হাঁটিয়া কুকুরের কাছে গেলে বড় ভয়ানক কুকুরটাও ভয় পায়। এই ব্যক্তির প্রতিবেশীর একটী সুন্দর ফলের বাগান ছিল। প্রতিবেশী অতিশয় কৃপণ স্বভাব ছিল। তাহার বাগানের দরজায় আবার এক প্রকাণ্ড কুকুর বাঁধা থাকিত। সুতরাং ফলগুলি দেখিয়া তাহার ক্ষুধাই বাড়িত, কিন্তু তাহার নিবৃত্তি হইবার কোন আশা ছিল না। সে কুকুর সম্বন্ধে এই কথা শুনিয়াই ভাবিল যে এইবার প্রতিবেশীর ফলের বাগানে যাইতে হইবে। যাহা ভাবিল, কাজেও তাহাই করিল। আস্তে আস্তে কুকুরের দিকে পশ্চাৎপাদ হইতে লাগিল আর ভাবিতে লাগিল বুঝি কুকুর পলাইয়াছে—বুঝি এইবার বাগানের ভিতর আসিয়াছি। কুকুর কিন্তু ভয় পায় নাই ; তাহার গলায় বাঁধা শিকলটা লম্বা ছিল না বলিয়া সে এতক্ষণ চুপ্ মারিয়াছিল। উল্টোদিকে উল্টোদিকে হাঁটিতে হাঁটিতে যাই ইনি তাহার কাছে আসিয়াছেন, অমনি সে ইহাঁর পাছা হইতে একবারের জলযোগের মতন এক টুকরা মাংস কামড়াইয়া লইল।

অন্যায় কাজ করিতে গেলে তাহারই শাস্তি পাওয়া যায়।

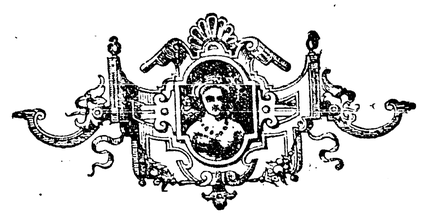

নং ২

আশ্চর্য্য প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব।

একজন স্পানিয়ার্ড আফ্রিকা দেশে পাখী মারিতে গিয়াছিল। পাখী শীকার করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় পথে একটা সিংহ আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। পশুরাজের মুখভঙ্গী দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিল যে কেবল মাত্র কুশল জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাঁহার আগমন হয় নাই। তাহার বন্দুক পাখী মারিবার জন্য প্রস্তুত করা ছিল। ইহা ভিন্ন আর গুলি বারুদ তাহার সঙ্গে ছিল না। গুলি করিলে সিংহ মরিবে না, কেবল মাত্র বিপদ বাড়িবে। সুতরাং সে অন্য উপায়ে রক্ষা পাইবার পথ দেখিতে লাগিল। তাহার মাথার টুপিতে অনেকগুলি উটপক্ষীর পালক বাঁধা ছিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে টুপী মুখে করিয়া লইল। পালকগুলি কেশরের মতন হইয়া তাহার বুক মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। ভিতর হইতে চক্ষু দুটী মিট মিট করিতে লাগিল। এইরূপ চেহারা করিয়া সে হামাগুড়ি দিয়া সিংহের দিকে যাইতে লাগিল। সিংহ ভাবিল যে এরূপ জানোয়ারতো সে কোন দিন খাইতে যায় নাই ;—তবে বা এটাই তাহাকে খাইতে আসিল। সুতরাং এরূপ 'কিম্ভূত কিমাকারের' সামনে অধিকক্ষণ থাকা নিতান্তই আশঙ্কাজনক মনে করিয়া সে ইহাপেক্ষা নিরাপদ স্থানে যাইবার পন্থা দেখিল।

একজন লোক নানা প্রকার শব্দ ও "বিদ্‌ঘুটে" মুখভঙ্গী করিতে পারিত। এই লোকটাকে একবার সিংহে তাড়া করিল। সে বেচারা প্রাণপণে দৌড়িয়াও দেখিল যে আর বাঁচিবার আশা নাই, এবারে নিশ্চয়ই সিংহ তাহাকে ধরিবে। এমন সময় সে হঠাৎ থামিল। থামিয়াই সিংহের দিকে তাকাইল—আমরা যে রকম করিয়া একে অন্যের পানে তাকাই সেরূপ করিয়া তাকাইল না, সিংহের দিকে পৃষ্ঠদেশ রাখিয়া মাথা নোঙাইয়া দুই ঠ্যাঙের মধ্যস্থ ফাঁক দিয়া তাকাইল ; আর তখন মুখের এমনি একখানা চেহারা করিল যে তেমন চেহারা আর সে কখনও করে নাই। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই ভয়ানক শব্দগুলির ভিতর হইতে বাছিয়া, যে শব্দটী সকলের চাইতে অস্বাভাবিক, সেই শব্দটী করিল। সিংহ থামিল এবং একটু চিন্তান্বিত হইল ; আর এক মুখ বিকৃতি, আর এক চীৎকার—সিংহ ভয় পাইল এবং ফিরিল। আর এক চীৎকার—সিংহ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইল।

হঠাৎ কোন স্থানে বিপদে পড়িলে ভয়ে জড়সড় না হইয়া বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় মনে মনে ভাবা উচিত।

নং ৩

অভিমানী রাজপুত্র।

রুষিয়ার যুবরাজের পুত্র সকালে উঠিয়া মুখ ধুইতে চাহিতেন না। একদিন তাঁহার মাষ্টার আসিয়া নালিশ করিল "ছোট কর্ত্তা মুখ ধুইতেছেন না।"

যুবরাজ বলিলেন "বটে? আচ্ছা দেখা যাবে, এর পর সে কেমন করিয়া মুখ না ধুইয়া থাকে।"

রাজপরিবারের ছেলে বুড়ো সকলকেই পাহারাওয়ালারা সেলাম করিবে, এরূপ নিয়ম। পর দিন চারি বৎসরের শিশু কর্ত্তাটী মাষ্টারের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইলেন। একজন পাহারাওয়ালার কাছ দিয়া তাঁহারা গেলেন; সে তালগাছপানা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, সেলাম করিল না।

যুবরাজের ছেলেকে সকলেই সেলাম করিয়া থাকে, স্থতরাং তিনি ইহাতে একটু বিরক্ত হইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। একটু পরেই তাঁহারা আর একজন পাহারাওয়ালার নিকট দিয়া গেলেন। এই ব্যক্তিও কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করিল না। যুবরাজনন্দন অত্যন্ত চটিয়া মাষ্টারকে বলিলেন। এইরূপ বেড়াইবার সময় অনেক সিপাহীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, কেহই তাঁহাকে সেলাম করিল না। তিনি দৌড়িয়া যুবরাজের কাছে গিয়া বলিলেন ঃ—

"বাবা! বাবা! তোমার বরকন্দাজগুলিকে চাবুক মার। আমি যাইবার সময় এরা আমাকে সেলাম করিতে চাহে না।"

যুবরাজ বলিলেন "বাছা, তাহারা ভালই করে। পরিষ্কার সিপাহীরা কখনও অপরিষ্কার ছোট কর্ত্তাকে সেলাম করে না।" এর পর হইতে যুবরাজনন্দন প্রত্যহ প্রাতে স্নান করিতেন।

যুবরাজপুত্রের অভিমানই তাহার কু-স্বভাব সংশোধন করাইল।

সার উইলিয়ম জোন্স।

সখার পাঠক পাঠিকা! মানুষ নিজের পরিশ্রম, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও যত্নের গুণে কত উন্নতি করিতে পারে তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত আজ তোমাদিগকে দেখাইব। তোমরা কি সার উইলিয়ম জোন্সের নাম শুনিয়াছ? তিনি প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় সুপ্রিম কোর্টের জজ ছিলেন। এখন হাইকোর্ট নামে কলিকাতাতে যে সর্ব্বপ্রধান আদালত আছে তখন তাহার নাম সুপ্রিম কোর্ট ছিল, তিনি তাহারই একজন বিচারপতি ছিলেন। কিন্তু বড় পদস্থ লোক ছিলেন বলিয়াই যে তাঁহার জীবনচরিত তোমাদিগকে বলিতে যাইতেছি তাহা নহে। তিনি নিজ পরিশ্রমে কতদূর উন্নতি করিয়াছিলেন তাহাই দেখান উদ্দেশ্য।

১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে উইলিয়ম জোন্সের জন্ম হয়। তাঁহার বয়স যখন তিন বৎসর মাত্র তখন তাহার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যু হইলে তাঁহার সুশিক্ষিতা মাতার উপরেই তাঁহার শিক্ষার ভার পড়ে। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি একজন অসাধারণ বিদ্যাবতী স্ত্রীলোক ছিলেন। অতি শৈশব কাল হইতে তিনি উইলিয়ম জোন্সের পাঠে রুচি জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। জোন্স যখন দুই তিন বৎসরের বালক তখন কোন নূতন বিষয় দেখিয়া তাহার বিবরণ জানিবার জন্য মাতার নিকট আসিলেই তিনি বলিতেন "পড়, পড়িলেই জানিতে পারিবে।" মায়ের মুখে এইরূপ বার বার শুনিয়া শিশু জোন্সের পড়াতে অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিল। ৭ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার মাতা তাঁহাকে স্কুলে দিলেন। ১৭৬৪ সালে তিনি স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। অক্সফোর্ডে পড়িবার সময় তিনি এত পরিশ্রম করিতেন, এবং নিজের ক্লাসের পাঠ্য বিষয়ের অপেক্ষা এত অধিক বিষয় শিক্ষা করিতেন যে, তাহা দেখিয়া তাহার একজন শিক্ষক সর্ব্বদা বলিতেন "জোন্সকে যদি বস্ত্রহীন করিয়া একাকী মরুভূমির মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া যায় তবু সে একটা বড়লোক হইয়া উঠিবে।"

বালক কাল হইতেই তাঁহার নানা ভাষা শিক্ষা করিবার দিকে মনের ঝোঁক ছিল। অক্সফোর্ডে

তিনি গ্রীক ও লাটীন ভাষা উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন নিজের যত্নে ইটালীয়, স্পেনীস, পোর্ত্তুগীজ ও ফরাসিস্ এসকল ভাষাও শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষা শিখিবার জন্য তাঁহার এতদূর আগ্রহ ছিল যে তিনি এই সময়ে আলিপো নগরবাসী একজন লোককে অনেক টাকা বেতন দিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার নিকট পারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষা করিতেন।

একদিকে এত ভাষা শিখিতেন তাহা বলিয়া যে তাঁহার কালেজের পাঠের কোন ব্যাঘাত হইত তাহা নহে; সেখানেও অতি উৎকৃষ্ট রূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ১৭৬৫ সালে তিনি ইংলণ্ডের একজন ধনী সন্তানের শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া জর্ম্মনি দেশে গমন করেন। সেখানে অবস্থিতি কালে জর্ম্মণ ভাষা অতি উৎকৃষ্ট রূপে শিক্ষা করেন। জর্ম্মনি দেশ হইতে তিনি যখন ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন তখন পারস্য ভাষায় লিখিত নাদির শাহের একখানি জীবন চরিত সংগ্রহ করিয়া আনেন। ইংলণ্ডে আসিয়া সেই বই খানি ফরাসি ভাষাতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলেন।

ইহার পর কয়েক বৎসর তিনি ইংলণ্ডে থাকিয়া অনেক বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। দিন দিন তাঁহার যশ চারি দিকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া লোকে চমৎকৃত হইতে লাগিল। কিন্তু এই সকল কাজের মধ্যে জোন্সের প্রাণে একটী বাসনা প্রবল ছিল। সেইটী কিরূপে চরিতার্থ হইবে তিনি সর্ব্বদা সেই চিন্তা করিতেন। সেটী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার ইচ্ছা। অবশেষে তাঁহার সে বাসনাও পূর্ণ হইল। ১৭৮৩ সালে তিনি কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন। সে সময়ে কেহই সহজে বিলাত হইতে এদেশে আসিতে চাহিত না। এখন সুয়েজ যোজককে কাটিয়া দেওয়াতে যেমন ২০।২১ দিনের মধ্যে জাহাজ এদেশে পৌঁছে তখন সেরূপ ছিল না। তখন জাহাজ সকলকে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া আসিতে হইত। তাহাতে আবার তখন কলের জাহাজ ছিল না, জল বায়ুর অবস্থা দেখিয়া জাহাজ সকলকে আস্তে আস্তে আসিতে হইত। আসিতে অনেক দিন লাগিত ও পথে অনেক ক্লেশ হইত। এখন এদেশে অনেক ইংরাজ আসিয়াছেন এবং তাঁহারা সহর গুলিকে অনেক স্বাস্থ্যকর করিয়াছেন। এখন এক জন ইংরাজ আসিলে তাঁহার থাকিবার অসুবিধা হয় না। তখন এ দেশে ইংরাজ ছিল না বলিলে হয়। ইংলণ্ডের লোকের এই ধারণা ছিল যে ভারতবর্ষে গেলে ফেরা দুর্ঘট সুতরাং বিলাতে করিয়া খাইতে পারিলে কেহ আর এদেশে আসিতে চাহিত না। উইলিয়ম জোন্স ইংলণ্ডে থাকিতেই যেরূপ যশস্বী হইয়াছিলেন, তাঁহাতে সেখানে থাকিলে তাঁহার করিয়া খাইবার অপ্রতুল হইত না। কিন্তু তাঁহার সংস্কৃত শিখিবার বাসনা এত প্রবল ছিল যে ঐ পদ পাইবা মাত্র তিনি আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিলেন এবং ঐ বৎসর অর্থাৎ ১৭৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। আসিবার সময় তাহাকে সম্মান পূর্ব্বক 'সার' উপাধি দেওয়া হইল।

এখানে আসিয়া তাঁহাকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির কাজ করিতে হইত। তখন সুপ্রিম কোর্টের কাজ কর্ম্ম বড় জটিল ছিল। বিচারপতিদিগের সুবিচার করিবার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইত। এখানকার জল বায়ু অতিশয় অস্বাস্থ্যকর ছিল, তাহাতে গুরুতর শ্রম করিতে হইত, ইহাতে সার উইলিয়ম জোন্সের শরীর বার বার অসুস্থ হইয়া পড়িত। কিন্তু তথাপি তিনি নানা ভাষা শিক্ষা করিতে ছাড়িতেন না। যাহা একটু সময় পাইতেন তাহা সংস্কৃত শিক্ষাতে দিতেন। আদালত যখন বন্ধ হইত তখন তিনি মনের আনন্দে সংস্কৃত পড়িতেন। তিনি পূর্ব্বদেশীয় ভাষা সকলের চর্চ্চার উন্নতি করিবার জন্য "এসিয়াটিক্ সোসাইটী" নামে একটী সভা স্থাপন করিলেন। ঐ সভা অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

এইরূপ শুনা যায় হুগলীর নিকটস্থ ত্রিবেণী নগরে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন নামে এক মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। সার উইলিয়ম নাকি তাঁহার নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন। ১৭৯৪ সালে তিনি কালিদাসের প্রণীত অভিজ্ঞান শকুন্তলা নামক সংস্কৃত গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলেন। ১৭৯৪ সালে মনুসংহিতার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইল, ইহা একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। এতদ্দ্বারা বিচার কার্য্যের অনেক সাহয্য হইয়াছে। কিন্তু এরূপ গুরুতর শ্রম অধিক দিন সহিল না। তাহার শরীর ভঙ্গ রুগ্ন হইয়া পড়িল। ১৭৯৪ সালে কোন গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার বয়ক্রম ৪৮ বৎসরের অধিক হয় নাই। একজন ইংরাজের পক্ষে ৪৮ বৎসর যৌবন কাল বলিয়া গণ্য; সুতরাং তিনি অতি অল্প বয়সেই পরলোক গমন করিয়াছেন। আরও দীর্ঘ কাল বাঁচিয়া থাকিলে আরও কত কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিতেন।

তাঁহার জীবন চরিত লেখক বলেন যে, কতক গুলি বিশেষ গুণে সার উইলিয়ম জোন্স এত উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম গুণ এই ছিল যে তিনি উন্নতি করিবার সুবিধা ও সুযোগ পাইলে ছাড়িতেন না, সকল কাজের মধ্যে তাঁহার আত্মোন্নতির দিকে প্রখর দৃষ্টি থাকিত। দ্বিতীয়তঃ তিনি বলিতেন অন্যে যাহা করিয়াছে আমি কেন তাহা করিতে পারিব না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সদ্‌গুণ এই ছিল যে তিনি সময় বিভাগ করিয়া যে সময়ে যে কাজ করিবার তাহা করিতেন, এই কারণে দশ কাজের মধ্যে তাঁহার পাঠের ব্যাঘাত হইত না। এই সকল গুণ থাকাতে তিনি আশ্চর্য্য উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন; তাঁহার সম কালে তাঁহার ন্যায় এত ভাষাভিজ্ঞ লোক ছিল না বলিলে হয়।

ফুলের সাজি।

প্রথম অধ্যায়।

গত সংখ্যার পর।

নাথ গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার সময়ে মনোরমাকে সঙ্গে লইয়া বাগানের পার্শ্বস্থিত প্রান্তরের নিকট একটী বটবৃক্ষতলে বসিয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিত। বালিকা পিতার পার্শ্বে বসিয়া নিবিষ্ট

চিত্তে পিতার কথা শুনিত এবং পিতা কোন প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর দিত।

একদিন সন্ধ্যাসমীরণ সেবন করিতে করিতে বৃদ্ধ তাহার কন্যাকে বলিল, "মনোরমে ভাবিয়া দেখ দেখি ঈশ্বরের কি অপার দয়া! এই সূর্য্য এতক্ষণ প্রখর রশ্মি বিস্তার করিয়া জগৎকে দগ্ধ করিবেন, ইহাঁর দ্বারা পরমেশ্বর জগতের কত উপকার করাইতেছেন। তাঁহারই প্রসাদে শস্য-ক্ষেত্রে শস্য, বৃক্ষে ফুল ও ফল জন্মিতেছে। তিনি মানবকে যে কত ভালবাসেন তাহা মানুষ ধারণা করিতে পারে না। আমাদের সুখের জন্য তাঁহার কি অদ্ভুত চেষ্টা! বৎসে তোমার কি এমন দয়াময় হরিকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা হয় না?"

মনোরমা। হাঁ বাবা, আমি আগে এই সকল ভাবিয়াছিলাম, যখনই আমরা কোন বিপদে পড়ি, তখনি তিনি আমাদিগকে তাহা হইতে উদ্ধার করেন। আমার পীড়া হইলে তুমি যেমন কিসে আমি আরোগ্য হব তাহারই জন্য ব্যস্ত থাক ঈশ্বরও তেমনি জগৎশুদ্ধ লোকের জন্য ব্যস্ত।

এই কথা বলিয়া সে দৌড়িয়া গিয়া একটী বড় গোলাপ লইয়া পিতাকে উপহার দিল।

দীননাথ ফুল পাইয়া কহিল "মনোরমে, গোলাপ ফুল দেখিতে কেমন সুন্দর, এই ফুলটী যেন বিনয়ের প্রতিকৃতি, কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর একটী সুন্দর ফুল আছে সেটী লজ্জাশীলা সচ্চরিত্রা বালিকার সুকোমল বদনমণ্ডল। বিনয়ী বালিকা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুল। এই গোলাপটীতে কর্দ্দম লাগিলে, ইহা যেমন শ্রীহীন হইয়া পড়ে, বালিকার মুখে লজ্জা ও বিনয় না থাকিলে তাহাও বিশ্রী দেখায়। দেখিও যেন তোমার মুখে মলিনতা না স্পর্শ হয়।

আর দুটী একটী কথা বলিলেই মনোরমার বাগানের অধ্যায় শেষ হয়। মনোরমার পিতা উদ্যানের ঠিক মধ্যস্থলে কন্যার জন্মদিনে একটী আম্র বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল, গাছটী মনোরমার বড় প্রিয়, সে যত্নের সহিত প্রতিদিন তাহাতে জল সেচন করিত। গাছটী যেন দেখিতে একটী গোলাপের তোড়া। আমরা যে বৎসরের কথা বলিতেছি তাহার পূর্ব্ব বৎসরে মনোরমার গাছে এত আম হইয়াছিল যে তাহার আহ্লাদের পরিসীমা ছিল না। কিন্তু এ বৎসর মনোরমা দেখিল যে বৃক্ষটী শুকাইয়া যাইতেছে; তখন সে দুঃখিত মনে পিতাকে বলিল "হায় আমার এমন চমৎকার আমের গাছটী মরিয়া যাইতেছে।"

দীননাথ বলিল, মা রৌদ্রের প্রখর উত্তাপ সহিতে না পারিয়া গাছটী শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। পাপের প্রভাবে মানবগণও এই রূপে শুষ্ক হইয়া যায়। যাহাদের উপর কত আশা, কত ভরসা এমন বুদ্ধিমান্ যুবকেরাও পাপাসক্ত হইয়া অকালে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেয়। কেবল যুবকেরা কেন অনেক রমণীও অল্প বয়সে পাপপ্রলোভনে পড়িয়া শেষে আপনার জীবনকে নষ্ট করিয়া ফেলে। অতএব সাবধান! সর্ব্বদা প্রলোভন হইতে দূরে অবস্থিতি করিবে। প্রলোভন নিকটস্থ হইলে তাহাকে দূরীভূত করিয়া দিবে। বৎসে, সাবধান কখন মন্দ কার্য্য বা চিন্তা করিও না। সর্ব্বদা কায়মনে পবিত্রতার জন্য প্রার্থনা করিবে, ঈশ্বর আমাদের পরম সহায়। দেখ, তুমি তোমার গাছটীর দশা দেখিয়া যেমন দুঃখিত হইতেছ, আমার যেন তোমায় বিপথগামিনী দেখিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে সেইরূপ দুঃখ করিতে করিতে চিতা-

রোহণ না করিতে হয়।

বৃদ্ধ বলিতে বলিতে ভাবোচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া ফেলিল, তাহার কথাগুলি মনোরমার প্রাণের মধ্যে বিদ্ধ হইল, সে কথাগুলি চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিল।

সাধু পিতার সহিত সহবাসে মনোরমার মন দিন দিন উন্নত হইতে লাগিল।

বৃদ্ধ দীননাথ তাহার বৃক্ষ সকলের শোভা দেখিয়া মোহিত হইত বটে কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কন্যার সাধুতায় তাহার মন অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-রসে অভিষিক্ত হইত। ঈশ্বর প্রসাদে দীননাথের এত যত্নে কন্যাপালন ব্রত সুফল প্রদান করিল।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জন্মদিনের উপহার।

মনোরমা ও তাহার পিতা যে গ্রামে পরম সুখে কালক্ষেপণ করিত, সেই গ্রামে গৌড়েশ্বরের একটী বাগানবাড়ী ছিল। এই বাগানে রাজা, রাজমহিষী ও তাঁহাদের একমাত্র কন্যা হেমলতা গ্রীষ্মকালে বাস করিতেন। রাজধানীতে অনেক লোকের সমাগম বলিয়া গ্রীষ্মকালে পল্লীগ্রামে বাস করা অত্যন্ত সুখজনক। একদিন মনোরমা কোন পুষ্করিণী হইতে কতকগুলি পদ্মফুল তুলিয়া তাহার দুই ছড়া মালা গাঁথিয়া বাড়ী আসিতেছে এমন সময়ে অট্টালিকার গবাক্ষ হইতে রাজকুমারী তাহাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি, মনোরমার হস্তে মনোহর পদ্মমালা দেখিয়া, তাহাকে ডাকিবার জন্য কোন পরিচারিকাকে পাঠাইয়া দিলেন। পরিচারিকা মনোরমার নিকট আসিয়া তাহাকে রাজকন্যার আহ্বান জানাইল। মনোরমা কি করিবে ভাবিয়া পাইল না, অগত্যা ধীরে ধীরে পরিচারিকার সঙ্গে রাজকুমারী হেমলতার নিকট উপস্থিত হইল।

হেমলতা দেখিতে সুশ্রী, তাঁহার হৃদয় অহঙ্কারশূন্য। তিনি মনোরমার পবিত্র মুখখানি দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। এবং তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে অভিলাষিণী হইলেন। ধন্য সরলতা, ধন্য পবিত্রতা, তোমরা দরিদ্র কন্যাকে রাজকুমারীর মনহরণ করাও, কুরূপাকে সুন্দরী কর, মূর্খকে জগৎমান্য করাও!

হেমলতা বলিলেন, "ভাই তোমার নাম কি? তোমার বাড়ী কোথায়?"

মনোরমা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "কুমারি আমি আপনাদের অন্নে প্রতিপালিত দীননাথের কন্যা, আমার নাম মনোরমা, এই উদ্যানের অনতিদূরেই আমার পিতার বাসস্থান, যদি কৃপা করিয়া এই মালা ছড়াটী গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হই।"

এই বলিয়া সে এক ছড়া মালা তাঁহার করে অর্পণ করিল। হেমলতা পরম আদরের সহিত তাহা গ্রহণ করিলেন। এমন সময়ে রাজমহিষী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি হেমলতার মুখে মনোরমার বিষয় জানিয়া ও তাঁহাকে সুশীলা দেখিয়া পরম আনন্দিতা হইলেন। মনোরমা তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া হাতের অপর

মালা ছড়াটী তাঁহার পদতলে স্থাপন করিল।

রাজমহিষী মনোরমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে পুরস্কার প্রদান করিবার জন্য পাঁচটী মুদ্রা বাহির করিলেন।

মনোরমা সবিনয়ে কহিল "মা আমি কি পুরস্কার না লইয়া এই মালা আপনাদিগের চরণে উপহার দিলে আপনারা তাহা গ্রহণ করিবেন না?"

মহিষী মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "মনোরমে, হেমলতা পদ্মফুলের মালা বড় ভালবাসে, যতদিন ফুল পাইবে তত দিন প্রত্যহই হেমের জন্য এক এক ছড়া মালা আনিবে।"

মনোরমা "যে আজ্ঞা," বলিয়া উত্তর দিল, সে দিন হইতে প্রতিদিন সে মালা আনিয়া রাজকুমারী হেমলতাকে প্রদান করিত। হেমলতা, মনোরমার কথায় ও ব্যবহারে ক্রমশঃ এত আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন যে, তাহাকে পাইলে অল্পে ছাড়িতেন না। তিনি, তাহাকে রাজপরিবারের মধ্যে বাস করিতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু মনোরমা তাহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিল। সে পিতার সঙ্গে থাকিয়া ও কথোপকথন করিয়া ও তাহার সেবা করিয়া যে বিমল সুখ পাইত তাহা রাজভবনে কোথায় মিলিবে? এইরূপে দেখিতে দেখিতে অনেক দিন অতিবাহিত হইল। হেমলতার সঙ্গিনীরা, রাজকুমারীকে মনোরমার প্রতি অনুরক্তা দেখিয়া ঈর্ষাপরবশ হইল।

ক্রমশঃ।

৺ অক্ষয়কুমার দত্ত।

সখার পাঠক পাঠিকাগণ! তোমরা হয়ত আজও শোন নাই যে তোমাদের দেশের একটী অতি প্রাচীন হিতৈষী বন্ধু ইহ সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তোমরা বোধ হয় আজও বিস্মৃত হও নাই যে অক্ষয় বাবু কে? বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের সচিত্র জীবনী আমরা তোমাদিগকে গত বর্ষের ফেব্রুয়ারি মাসে উপহার দিয়াছি। তিনি গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, রাত্রি ৩ টার সময়ে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। মৃত্যুর বহু পূর্ব্ব হইতেই তিনি এরূপ রুগ্ন হইয়াছিলেন যে তিনি যেন জীবিত অবস্থায়ই মৃত্যুর কোলে শয়ান ছিলেন। তাঁহার সামাজিক জীবন এক প্রকার লোপ হইয়াছিল বলিলেই হয়, তিনি এক প্রকার সাধারণ লোকের নিকট মৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু তোমরা কি জান তিনি তোমাদের জন্য, তোমাদের জন্মভূমির জন্য কি কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তোমরা আজ কাল কত ভাল ভাল পুস্তক পড়িতে পাও, কত ভাল ভাল সংবাদপত্র দেখিতে পাও, তোমরা কত নীতিপূর্ণ সুন্দর সুন্দর গল্প, কত বিজ্ঞানের কথা পড়িতেছ, তোমরা সখা পাইয়াছ কিন্তু তোমরা কি জান কোন্ মহাত্মার প্রসাদে তোমরা এই সমস্ত সুখের অধিকারী হইয়াছ? অক্ষয় বাবুর পূর্ব্বে তোমাদের দেশে এ সকলের সূত্রপাতও হয় নাই—তিনিই এ সমস্ত প্রথমে দেশে প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে দেশে যে সমস্ত ছিল তাহার বিষয় আর তোমাদিগকে জানিয়া কাজ নাই, অশ্লীল কথা, অশ্লীল গল্প, অশ্লীল ভাবই

তাহার প্রাণ। যে কয়েকখানি সংবাদপত্র ছিল তাহাদের অবস্থাও তদনুরূপ। সাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য তাহাতে কিছুই থাকিত না—থাকিত কেবল সাধারণের কুরুচির স্রোতকে সহায়তা করিবার জন্য কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল গল্প ও ব্যক্তিগত গালিগালাজ। অক্ষয় বাবু সর্ব্বপ্রথমে তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার সাহায্যে এই জাতীয় কুরুচির স্রোতকে বাধা প্রদান করেন। তাঁহারই অসাধারণ সত্যানুরাগ, তাঁহারই অসাধারণ নৈতিক চরিত্রের মহিমা দেশের দুরবস্থাকে অনেক উন্নত করিয়াছিল তাই আজ তোমরা এই সকল সুখের অধিকারী হইয়াছ। মহাত্মা রাজা রামমোহনের পর দেশত পুনরায় কুপথে যাইতেছিল, অক্ষয় বাবুই এমত সময় বাঙ্গালা সাহিত্যে নৈতিক শক্তি প্রদান করিয়া দেশকে রক্ষা করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে দেশে বিজ্ঞানের নাম পর্য্যন্ত ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনিই দেশীয় লোকদিগকে বিজ্ঞান চর্চ্চার আবশ্যকতা এবং উপকারিতা বুঝাইয়া দিলেন। তিনিই বুঝাইয়া দিলেন যে বিজ্ঞান চর্চ্চা আরম্ভ না হইলে দেশের দুরবস্থা দূর হইবে না, দেশ কখনই উন্নত হইবে না। কিন্তু তিনি আর যে একটি জিনিস দিয়া গিয়াছিলেন তাহার নিকট এসকলও অতি সামান্য। তিনি আমাদিগকে মানুষ হইতে শিখাইয়া গিয়াছেন, প্রকৃত মনুষ্যত্বের আদর্শ আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন। স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন ভাব ও স্বাধীন কার্য্যের ইচ্ছা মানবের অন্তরে প্রবিষ্ট না হইলে মানুষ যে মানুষ হইতে পারে না, মানুষ যে কেবল অপরের হস্তে পুত্তলিকা তাহা তিনি আমাদিগকে বিশেষ রূপে শিখাইয়া গিয়াছেন। যে স্বাধীনতার জন্য আজ আমরা লালায়িত যে স্বাধীন ভাব দেশে প্রবেশ করিয়া আজ কাল দেশীয় যুবকদের মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে, দেশকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছে সেই স্বাধীন ভাব সর্ব্ব প্রথমে বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের মনে প্রবিষ্ট হয়। আজ তিনি পরলোকে গমন করিয়াছেন আইস ভাই বোন্, আজ আমরা তাঁহার স্মৃতি আমাদের প্রধান অলঙ্কার করিয়া হৃদয়ে ধারণ করি।

ধাঁধা।

—:o:—

গত বারের সচিত্র ধাঁধার উত্তর।

১। নব বরষে থাক হরষে
সখা পড়গো কষে

———

নূতন ধাঁধা।

১। ১ হইতে ৯ কে এমন তিন লাইনে বসাও যে লম্বভাবে, পাশাপাশি বা কোণাকোণী ভাবে অঙ্কগুলি যোগ করিলে যোগ ফল ১৫ হইবে।

নূতন প্রকারের ধাঁধা।

উপরোক্ত ছবিটী অবলম্বন করিয়া একটী রচনা লেখ; যাহার রচনা ভাল হইবে তাহার রচনা সখায় প্রকাশিত হইবে।

সখা

চতুর্থ ভাগ। সপ্তম সংখ্যা।

জুলাই, ১৮৮৬।

প্রবাল দ্বীপ।

ত মে মাসের সখাতে প্রবাল কীটদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গিয়াছে। এবারে উহারা যে আশ্চর্য্য দ্বীপ সমূহ নির্ম্মাণ করিয়া জগতের কত কল্যাণ করিতেছে, তাহাদের বিবরণ কিছু দিব। ঐ সকল কীট দ্বীপ নির্ম্মাণ করে, একথা বলা ঠিক নহে। উই পোকারা বল্মীক নির্ম্মাণ করে, বাবুই পাখী চমৎকার কৌশলে বাসা নির্ম্মাণ করে, বীবরেরাও অতি আশ্চর্য্য বাসস্থান নির্ম্মাণ করে, এবং মানুষেরা আপনাদের বুদ্ধি কৌশলে কত কি অদ্ভুত পদার্থ সকল প্রস্তুত করিয়া থাকে; কিন্তু এই সকল কীট সে রূপে কিছুই করে না। ইহাদের কর্ত্তৃত্ব একটুও নাই! দ্বীপ নির্ম্মাণকর্ত্তা স্বয়ং ঈশ্বর। ইহাদের দেহের ধ্বংসাবশেষ দ্বারা তিনি আপনিই দ্বীপ প্রস্তুত করিতেছেন। তাঁহারই আশ্চর্য্য কৌশল সর্ব্বত্র দেখা যায়। এখানেও তাই।

যে সকল ডাকাত বা খুনী আসামীর চিরজীবনের মত দ্বীপান্তরিত হওয়ার সাজা হয় তাহাদিগকে ভারত মহাসাগরের আণ্ডামান প্রভৃতি দ্বীপে চালান দেওয়া হয়, তাহা বোধ হয় তোমরা অনেকেই জান। ঐ সকল দ্বীপের অনেকগুলি প্রবালকীটদিগের দেহের পূর্ব্ব লিখিত কঠিন অংশে নির্ম্মিত। মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ প্রভৃতি ভারত মহাসাগরের অনেক দ্বীপ এবং প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যেও বিস্তর দ্বীপপুঞ্জ এই রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রবাল দ্বীপগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর; কোথাও একটী দ্বীপ বা সাগরের ধারের কোন দেশের কিনারায় সাদা ধপ্‌ধপ্‌ কচ্ছে। প্রবাল দেহ রাশি জোয়ারের সময়ে সব ডুবিয়া যায়; চারিদিকে নীল জল অসীম, অকূল, উপরে অনন্ত নীল আকাশ, আর সুমুখে শুভ্রবর্ণ প্রবাল দেহ সকল ভাঁটার সময়ে যখন উচ্চ হইয়া দেখা দেয়, তখন কি চমৎকারই শোভা হয়! কল্পনা করিলেও প্রাণে কত আনন্দ হয়!

প্রবাল কীটের দেহ দ্বারা যে নূতন জমি প্রস্তুত হয়, তাহা তিন প্রকার। এক প্রকার দেখা যায় যে, তাহারা কোন দ্বীপের চারিদিকে বা উপকূলস্থিত কোন দেশের ধারে ধারে বাস করে। ঐ দ্বীপ বা দেশের যে যে দিকে নদী নাই এবং বাতাস বহিয়া জলে খুব ঢেউ হয় ও সাগরের স্রোত খুব প্রবল, সেই দিকেই প্রবালদিগের বাস করিবার বড় সুবিধা হয় ("প্রবাল কীট" দেখ।) তাহারা মনের আনন্দে বাড়িতে থাকে। এক দল মরিয়া যায়, আর এক দল

তাহাদের কঙ্কালময় দেহের উপরে বসিয়া আবার আনন্দে জীবন কাটায় ও প্রত্যেকে শত শত নূতন কীট উৎপন্ন করিয়া আপনারা প্রাণত্যাগ করে। এইরূপে দলে দলে প্রবাল কীটেরা যখন উপর্য্যুপরি বাড়িতে থাকে, তখন ক্রমে ঐ প্রবাল-নিবাস উচ্চ হইয়া উঠে। অবশেষে যখন এমন হয় যে, তাহাদের দেহ ভাঁটার সময়ে জল ছাড়াইয়া উঠে আর জোয়ারে ডুবিয়া যায়, তখন তাহাদের কিছু ক্লেশ হইতে আরম্ভ হয়। কেন না যতক্ষণ জলের উপরে থাকে ততক্ষণ তাহারা মৃত প্রায় হইয়া যায়। ক্রমে এই রূপে উপরের কীটগুলি প্রাণত্যাগ করে ও জলাভাবে তাহাদের দেহের উপর আর অন্য কীট জন্মিতে পারে না। সুতরাং তাহার উচ্চতা ঐ অবধিই এক প্রকার বন্ধ হয়। তবু বাতাসে ও স্রোতের জোরে জীবিত বা মৃত প্রবাল-দেহ বিস্তর ভাসিয়া বা চালিত হইয়া তাহার উপর পড়ে ও ক্রমে ঐ স্থান পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ হইতে থাকে। এবং যত ঘাস ও অন্যান্য ছোট ছোট চারা গাছ জন্মিয়া জমি শক্ত হইয়া উঠে, ততই উহা স্থায়ী হইতে থাকে। এই প্রকারের প্রবাল নির্ম্মিত স্থানকে ইংরাজীতে Fringing Reef বা উপকূলস্থ প্রবালাবাস কহে। (ছবি দেখ) ক—একটী দ্বীপ, তাহার চারিধারে খ—শ্বেতবর্ণ প্রবালাবাস দ্বারা ঘেরা, তার পর সাগর। মাডাগাস্কার দ্বীপ ও আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে এই জাতীয় প্রবালাবাস বহুদূর ব্যাপিয়া আছে।

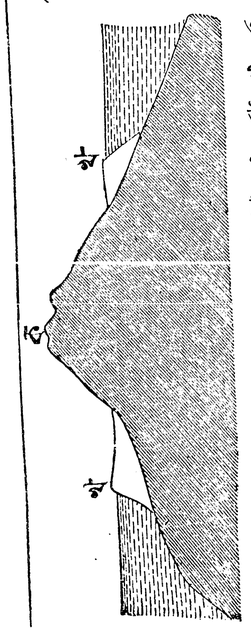

(২য়তঃ) আর এক জাতীয় প্রবালাবাস দেখা যায়, তাহা আর একটু আশ্চর্য্য। তাহা দ্বীপ বা দেশের গায়ে লাগিয়া থাকে না। উপকূল হইতে অনেক দূরে চারিদিকে ঘিরিয়া থাকে। এই জাতীয় প্রবালাবাস হইতে উপকূল ৫।১০ কখন কখন ২০।৩০ মাইল দূরে থাকে। মধ্যে যে জলভাগ তাহার গভীরতা খুব অল্প, তথায় স্রোত ও তুফান কম এবং তাহার তলা হইতে মাটি তুলিলে তাহাতে প্রবালদিগেরই মৃত দেহ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জলভাগের পর প্রবালদিগের বাসস্থান চারিদিকে ঘিরিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের উত্তর পূর্ব্ব ভাগে উপকূল হইতে প্রায় ২০।৩০ মাইল দূরে ১২০০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রকাণ্ড একটী প্রবালাবাস আছে। তথা হইতে উপকূল পর্য্যন্ত ঐ যে ২০।৩০ মাইল সাগর, তাহার গভীরতা এত কম যে তাহাকে সাগর না বলিয়া Inner passage অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী জল-প্রণালী কহে; বস্তুতই উহার গভীরতা কোথাও ১০০ হাতের অধিক নহে, বরং অনেক স্থলে কম। কিন্তু ঐ প্রবালাবাসের বাহিরেই সাগরের গভীরতা একেবারে অনেক বেশী। এরূপ কেন হয় পরে বলিব। এই জাতীয় প্রবাল নির্ম্মিত স্থানকে ইংরাজীতে Barrier Reef বারীয়ার রীফ্ কহে। (ছবি দেখ); ক—দ্বীপ, খ—এই জাতীয় প্রবালাবাস, গ—মধ্যস্থ জলপ্রণালী, দুই পার্শ্বে অতলস্পর্শ সাগর।

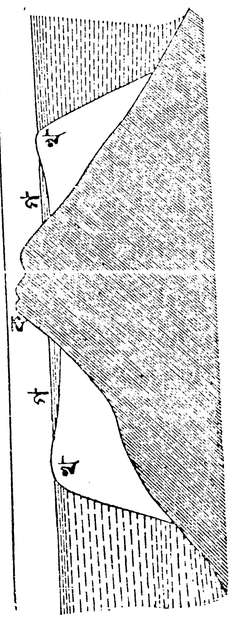

(৩য়তঃ) উপরে যে দুই জাতীয় প্রবালাবাস বর্ণিত হইল, তাহারা কেহই বাস্তবিক প্রবাল দ্বীপ নহে। কিন্তু যথার্থই লাক্ষাদ্বীপ, মালদ্বীপ, চেগোস্ দ্বীপপুঞ্জ, কেরোলাইন দ্বীপপুঞ্জ, লো দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি অনেক স্থানে প্রবাল দ্বীপের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাহারা যথার্থই দ্বীপ। চারিদিকে অকূল সাগর, মধ্যে ১০০ শত মাইল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রবালদের নির্ম্মিত গোলাকার দ্বীপ। এই জাতীয় দ্বীপ বড় আশ্চর্য্য। ইহারা অন্যান্য দ্বীপের মত নহে। ইহাদের সকলেরই মধ্যস্থলে এক একটী প্রকাণ্ড হ্রদ বা জলাশয়, আর তাহারই চারিদিকে জমি। একটা থালায় জল রাখিয়া তাহাতে একটী সোণার বালা রাখিলে যেমন হয়, চারিদিকে জল ভিতরেও জল মাঝখানে উচ্চ সোণার বালা;—তেমনি চারিদিকে নীল সাগর, মাঝখানে দ্বীপের ভিতরেও সাগরের জল স্থানে স্থানে ভাঙ্গা পথদিয়া প্রবেশ করিতেছে ও খেলিতেছে, আর তাহারই চারিদিকে কোথাও আধ পোয়া, কোথাও একপোয়া (অর্দ্ধ মাইল) চওড়া প্রবাল দ্বীপ উচ্চ হইয়া রহিয়াছে। তাহার উপর নারিকেল গাছ ও অন্যান্য চারা গাছ সকল হইয়া অতি সুন্দর দেখাইতেছে, আবার মানুষ তথায় ঘর বাড়ী করিয়া বাস করিতেছে! কি আশ্চর্য্য! (ছবি দেখ।)

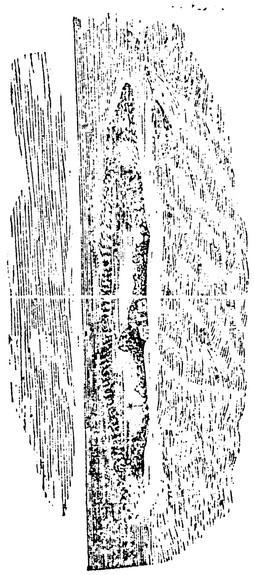

এই জাতীয় প্রবালাবাসই বস্তুতঃ প্রবাল-দ্বীপ;—ইংরাজীতে ইহাদিগকে Atoll কহে। ইহাদের ভিতরের যে হ্রদ তাহার গভীরতা অত্যন্ত অল্প, কিন্তু বাহিরের দিকে সাগরের গভীরতা হঠাৎ অপরিমেয়।

এখন তিন জাতীয় প্রবালাবাস কিরূপ তাহা বুঝিলে। কিন্তু কিরূপে ইহারা যে নির্ম্মিত হয়, তাহা বুঝা তত সহজ নহে। বড় বড় পণ্ডিতেরা নানা উপায়ে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াও প্রথমে কিছুই ঠিক করিতে পারেন নাই। কথা এই যে, ঐ সকল কীট যদি ৯০ হইতে ১৮০ ফুট পর্য্যন্ত গভীর জলের নীচে না বাঁচে, (মে মাসের সখা দেখ,) তবে এই অতলস্পর্শ সাগরের মধ্যে কোথা হইতে ও কিরূপে এত বড় বড় দ্বীপ Atoll নির্ম্মাণ করিল? কিরূপেই বা অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর পূর্ব্ব উপকূলে ও অন্যান্য স্থানের "বারীয়ার রীফ" গুলি প্রস্তুত করিল? উপকূলস্থিত প্রবালাবাস বুঝা খুব সহজ। কিন্তু আর দুই জাতীয় দ্বীপ কিরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে, একথা কোন পণ্ডিতই প্রথমে স্থির করিতে পারেন নাই। কত লোকে কত রকম কথা আন্দাজ করিয়া বলিতে লাগিলেন, কিন্তু ঠিক কথাটী কেহই বলিতে পারিলেন না। প্রবাল দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী হ্রদই বা কোথা হইতে আসিল, আর তাহার জলই বা এত কম গভীর কেন, তাহারও কোন মীমাংসা হইল না। শেষে Charles Darwin প্রসিদ্ধ ডারউইন সাহেব যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহাই ঠিক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

ডারউইন সাহেব বলেন যে, শেষোক্ত দুই জাতীয় প্রবালাবাসই প্রথমে উপকূলে নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং ক্রমে বহু কালে ঐরূপ আকার লাভ করিয়াছে। অতি প্রাচীন কালে মনে কর

একটী দ্বীপের চারি দিকে উপকূলে প্রবালেরা বাস করিল, ক্রমে বেশ সুন্দর ১ম ছবির মত একটী প্রবালাবাস নির্ম্মিত হইয়া কিছু কাল রহিল। তাহার পর, যে কারণে প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের নানা স্থান ক্রমশঃ নীচু হইয়া বসিয়া যাইতেছে, সেইজন্য হয়ত ঐ দ্বীপটীও ক্রমে নীচু হইয়া যাইতে লাগিল। দ্বীপ যত নীচু হইতে লাগিল প্রবালেরাও আবার তত উচ্চ করিয়া আপনাদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যেদিকে স্রোত ও বাতাসের ঢেউ বেশী সেই দিকের প্রবালেরা বাড়িতে লাগিল, এজন্য প্রবালাবাসের সাগরের দিক উহার দ্বীপের দিক অপেক্ষা উচ্চ হইতে থাকিল। কাজে কাজেই ক্রমে মাঝ খানটা খালি পড়িয়া গেল। ইহাই ঐ দ্বীপ ও ঐ প্রবালাবাসের মধ্যস্থ জল প্রণালী Inner passage রূপে দাঁড়াইয়া গেল। আর পূর্ব্বের উপকূলস্থ প্রবালাবাস এক্ষণে Barrier Reef শ্রেণীতে পরিণত হইল। (২য় ছবি দেখ)।

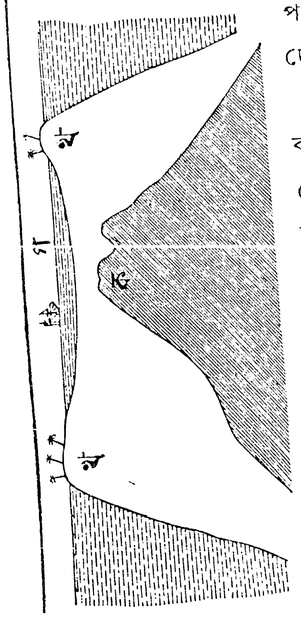

ক্রমে যত দ্বীপটী আরও বসিয়া গেল ততই প্রবালেরা চারিদিক ঘিরিয়া সাগরের দিকে উচু হইতে লাগিল, আর মাঝের জলপ্রণালী ততই বাড়িয়া বাড়িয়া বেশী স্থান দখল করিতে লাগিল। অবশেষে যখন সমস্ত দ্বীপটী ডুবিয়া গেল তখন মধ্যে একটী হ্রদ জন্মিল, আর তার চারিদিকে গোলাকার প্রবালদের বাসস্থান, (Atoll) তাহার চারিদিকে নীল সাগর। এইরূপ "বারীয়ার রীফ্" ক্রমে Atoll অর্থাৎ প্রবাল দ্বীপে পরিণত হয়। (ছবি দেখ)।

ক—দ্বীপটী একেবারে জলের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে; খ—প্রবালনিবাস তাহার চারি ধারে ছাইয়া ফেলিয়াছে ও উপরে গোল হইয়া দেখা দিয়াছে; ছবিটী তাহারই মাঝ খান দিয়া জল চিরিয়া যেন দেখান হইয়াছে। গ—মধ্যের হ্রদ। ইহার গভীরতা অতি কম। দুই পার্শ্বে অতল-স্পর্শ সমুদ্র।

পরমেশ্বর! তোমার অপার মহিমা! কত ক্ষুদ্র কীটানু দিয়া তুমি কি আশ্চর্য্য কার্য্যই করিয়া লইতেছ!

কলের জাহাজ।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট শুক্রবার সূর্য্যোদয় হইতে না হইতে নিউ ইয়র্ক নগরের যেখান হইতে জাহাজ ছাড়িবার কথা ছিল, তাহার নিকটস্থ গৃহ সকলের ছাদ, জেঠী, নদীতীর প্রভৃতি সমুদয় স্থান লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। জাহাজে সর্ব্বশুদ্ধ বারজন যাত্রীর উপযুক্ত আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে সকল আসনগুলিই পূর্ণ হইয়া গেল।

জাহাজের সম্মুখদিকে খালাসীদিগের জন্য ডেক্ বা পাটাতন; পশ্চাৎদিকে আরোহীদিগের ক্যাবিন্। কল কারখানা সমস্ত খোলা; যাহার ইচ্ছা সে দেখিতে পারে। পূর্ব্ব হইতেই কলে আগুন দেওয়া হইয়াছিল। সেই কারণে চিম্‌নি দিয়া কৃষ্ণবর্ণ ধূম উত্থিত হইতেছিল। যে সকল জোড়ের মুখে একটু আধটু ফাঁক ছিল তাহা হইতে ষ্টীম্ (বাষ্প) উঠিতে ছিল। ফুল্‌টন স্বয়ং ডেকের উপর দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে খালাসীদিগকে নানাবিধ আদেশ করিতেছেন। জনকোলাহল ভেদ করিয়া তাঁহার স্বর সুস্পষ্ট শুনা যাইতেছে। চারিদিকের উপহাস বিদ্রূপ ও নিরাশার কথা তুচ্ছ করিয়া তিনি ধীর ও বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

সমুদয় আয়োজন ঠিক্ হইলে, কল চালাইয়া দেওয়া হইল; কলের জাহাজ ক্লারমণ্ট জেঠী হইতে আস্তে আস্তে সরিতে লাগিল। পরে যখন জাহাজ ঘুরিয়া নদীবক্ষে চলিতে আরম্ভ করিল, তখন তীরস্থ দর্শকগণেরা উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। যাত্রিগণের কণ্ঠ হইতে সেই জয়ধ্বনির প্রতিধ্বনি উত্থিত হইয়া তাহার সহিত মিলিত হইল। ফুল্‌টন কিন্তু নীরব। তাঁহার চেষ্টা এতদিনে সফল হইল এই আনন্দে, তাঁহার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে; কেবল তাঁহার বিস্ফারিত নয়নের জ্যোতিতে সেই আনন্দ প্রকাশিত হইতেছে।

ক্লারমণ্ট, ওয়েষ্ট পয়েণ্ট নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী হইলে তত্রত্য দুর্গের সৈন্যগণ আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। নিউবর্গ নগরে জাহাজ পঁহুছিলে দেখা গেল সেখানে অসংখ্য লোক সমবেত হইয়াছে। জলে স্থলে, নৌকায় ও নদীতীরস্থ পাহাড়ে লোক ধরে না। একখানি খেয়া নৌকা হইতে অনেকগুলি মহিলা হাসিতে হাসিতে রুমাল ঘুরাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া ফুল্‌টনের অত্যন্ত আহ্লাদ হইল। তিনি মাথা হইতে টুপি তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ইহাই অদ্যকার সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর দৃশ্য।"

ফুল্‌টন তাঁহার এক বন্ধুকে আল্‌বানি যাত্রা সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে জানা যায় যে, যাওয়া আসা উভয় সময়েই বায়ু প্রতিকূল ছিল; সুতরাং কেবল বাষ্পীয় বলেই জাহাজ চালাইতে হইয়াছিল। তথাপি স্রোতের প্রতিকূলে যাইবার সময় এই দেড় শত মাইল পথ যাইতে ৩২ ঘণ্টা এবং আসিবার সময় অনুকূল স্রোত বশতঃ ৩০ ঘণ্টা লাগিয়াছিল। নদীতে অন্যান্য যে সকল জাহাজ ও নৌকা চলিতেছিল, ক্লারমণ্ট সে সমুদায়কে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিল।

আমরা একটী গল্প বলিয়া এই প্রস্তাব শেষ করিব। গল্পটী সত্য। যিনি এই গল্পটী বলিয়াছেন তিনি স্বয়ং ইহার মধ্যে লিপ্ত ছিলেন।

প্রথম বারের যাত্রায় আল্‌বানি হইতে নিউ ইয়র্কে ফিরিবার সময় একটী ভদ্রলোক আসিয়া ফুল্‌টনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আপনার নাম বোধহয় মিষ্টার ফুল্‌টন?"

"হাঁ, মহাশয়।"

"আপনি কি এই জাহাজ লইয়া নিউ ইয়র্কে ফিরিয়া যাইবেন?"

"আজ্ঞা, হাঁ; ইচ্ছা ত সেইরূপ।"

"আমি কি আপনাদের সঙ্গে যাইতে পারি?"

"ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের সঙ্গে আসিতে পারেন।"

তাহার পর ঐ ভদ্রলোকটী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাড়া কত লাগিবে ?"

ফুল্‌টন যাহা বলিলেন তিনি তাহাই প্রদান করিলেন। কিন্তু ফুল্‌টন অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে নিষ্পন্দ ভাবে ঐ টাকার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া ভদ্রলোকটী মনে করিলেন, বুঝি ভ্রমক্রমে কম টাকা দেওয়া হইয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! ঠিক্ হইয়াছে কি ?"

এই প্রশ্নে ফুল্‌টনের চমক ভাঙ্গিল। তিনি মুখ তুলিয়া ঐ ভদ্রলোকটীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন ; তাঁহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তিনি বাষ্পগদ্‌গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন,—

"মহাশয়, ক্ষমা করিবেন। আমার এত দিনের চেষ্টার প্রথম পুরস্কার আপনার প্রদত্ত এই টাকা। সেইজন্য এই টাকা পাইয়া আমার গত জীবনের সমুদায় কষ্ট একেবারে স্মৃতিপথে উপস্থিত হওয়াতে আমি সেই চিন্তায় একেবারে মগ্ন হইয়া গিয়াছিলাম। আমার বড় ইচ্ছা ছিল আপনাকে কিছু জলযোগ করাইয়া এই ঘটনা স্মরণীয় করি। কিন্তু আপাততঃ আমি এরূপ দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছি যে, তাহাও আমার সাধ্যাতীত। কিন্তু আশা করি আমাদের পরস্পর আবার দেখা সাক্ষাৎ হইবে, এবং তখন আর আমার এদশা থাকিবে না।"

চারি বৎসর কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে ফুল্‌টনের কারবারের অনেক উন্নতি হইয়াছে। ক্লারমেণ্টর নূতন শ্রী ও নূতন নাম (নর্থ রিভার) হইয়াছে। কার অব্ নেপচুন ও প্যারাগণ নামক আর দুই খানি জাহাজ গঠিত হইয়াছে এবং নিউ ইয়র্ক হইতে আল্‌বানি পর্য্যন্ত নিয়মিত রূপে কলের জাহাজ গতায়াত করিতেছে। সেই সময়ে একদিন উক্ত ভদ্রলোকটী উহার একখানি জাহাজে আল্‌বানি যাত্রা করেন। তিনি ক্যাবিনের মধ্যে বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার বোধ হইল একজন অপরিচিত ভদ্রলোক তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছেন। পরে তাঁহার স্মরণ হইল যে, ঐ ভদ্রলোকটী মিষ্টার ফুল্‌টন। কিন্তু তিনি কোন কথা না ভাঙ্গিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে ফুল্‌টনের আসনের নিকট দিয়া যাইবার সময় উভয়ের চক্ষু মিলিত হইল। অমনি হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—

"আমি জানিতাম এ আর কেহ নহে, আপনি। আপনার আকৃতি আমি আজিও ভুলি নাই। এবং যদিও আমি এখনও ধনবান্ হইতে পারি নাই, তথাপি এখনও আপনাকে আতিথ্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করিতে পারি।"

জলযোগের আয়োজন হইল। আহারের সময় ফুল্‌টন সাধারণের উপহাস, বিদ্রূপ, নিজের আশা, ভয়, বিঘ্ন, বিপদ প্রভৃতি সমস্ত বিগত বিষয় শীঘ্র শীঘ্র অথচ উজ্জ্বলভাবে বর্ণন করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহার চেষ্টা অবশেষে কেমন করিয়া সফল হইল, তাহাও বর্ণনা করিলেন। সমুদায় কথা শেষ করিয়া তিনি এই বলিয়া উপসংহার করিলেন,—

"আপনার সহিত আল্‌বানিতে প্রথম সাক্ষাতের বিষয় অনেকবার আমার মনে হইয়াছে। এবং যখনই সে কথা মনে হয়, তখনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে তখন আমার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহাও উজ্জ্বলভাবে স্মৃতিপথে উদিত হয়। আমার তখন বোধ হইয়াছিল যে, আজি অবধি আমার দুঃখের অবসান হইতে চলিল ; অন্ধকারের পর আলোক দেখা দিল। আজিও আমার ঐ কথা মনে হয়। কারণ, আমা দ্বারা যে জনসমাজের উপকার হইবে, আপনিই, প্রথমে আপনার কার্য্যদ্বারা তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন।"

ঐ ভদ্রলোকটী নিজে এই গল্পটী বলিয়া গিয়াছেন।

আজি প্রায় আশি বৎসর হইল প্রথম কলের জাহাজ চলিতে আরম্ভ হয়। তাহার পর এ সম্বন্ধে কত উন্নতি হইয়াছে! আজি কালি প্রায় এমন সমুদ্র বা গভীর নদী নাই যেখানে কলের জাহাজ যায় না। কলের জাহাজে ডাকের চিঠি আসিতেছে, কলের জাহাজে যাত্রী যাতায়াত করিতেছে, মাল আসিতেছে ; আবার দুই দেশে যখন যুদ্ধ বাধে, তখন কলের জাহাজে করিয়া লড়াই পর্য্যন্ত হয়। প্রতিকূল বায়ু বা স্রোত ইহার গতিরোধ করিতে পারে না। ইহা ঈশ্বর সৃষ্ট প্রাকৃতিক বল ও মনুষ্যবুদ্ধির কীর্ত্তি-স্তম্ভ রূপে চতুর্দ্দিকে আপনার মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে।

—০—

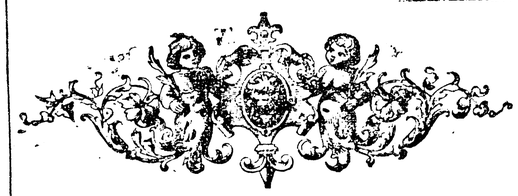

নানা প্রসঙ্গ।

নং ৪

সাহসী বালক।

এক দিন আমরা * স্কুলে যাইতেছি এমন সময় দেখিলাম আমাদের সমপাঠী একটী বালক নিকটস্থ মাঠের দিকে একটা গরু লইয়া যাইতেছে। পথে একদল ছেলের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। ঐ দলের জ—ঠাট্টার বিষয় পাইলে কখনও ছাড়িত না। জ—বলিয়া উঠিল "কিহে! দুধের দাম কত? বলি উ—তুমি কোন্ ঘাস খাও ? গরুর শিঙ্গে যে সোণাটুকু আছে তাহার দাম কত ? ওহে, তোমরা দেখ! যদি নূতন "ফ্যাশন্" দেখিতে চাও,তবে এই জুতা জোড়াটার পানে তাকাও"।

উ—একটু হাসিয়া আমাদিগকে নমস্কার করিল, তারপর মাঠের চারিধারে যে বেড়া ছিল তাহার দরজা খুলিয়া গরুটীকে ভিতরে দিল। তারপর দরজা বন্ধ করিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই স্কুলে আসিল। বিকালে স্কুলের ছুটীর পর গরুটীকে বাহির করিয়া লইয়া গেল, কোথায় নিল আমরা কেহই জানিতে পারিলাম না। দুই তিন সপ্তাহ ধরিয়া সে রোজই এই কাজ করিতে লাগিল।

এই স্কুলের ছেলেরা প্রায়ই ধনীর সন্তান। ইহাদের কতকগুলি আবার এমন মূর্খ ছিল যে, গরু মাঠে লইয়া গিয়াছিল বলিয়া উ—কে ঘৃণা করিত।

ইহারা উ—র মনে কষ্ট দিবার জন্য নানা রকম বিশ্রী কথা বলিত। উ—তাহাতে কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া সে সকল সহ্য করিত। একদিন জ—বলিল—

"কিহে উ—তোমার বাবা কি তোমাকে গোয়ালা করিতে চাহিতেছেন নাকি ?"

উ—বলিল—"ক্ষতি কি ? "

"ক্ষতি কিছু নয়, তবে দেখো যেন কেঁড়ে ধুইয়া তাহাতে খুব বেশী জল রাখিয়া দিও না।"

সকলে হাসিল। উ—কিছু মাত্র অপ্রতিভ

* এই "আমরা" অবশ্য সখার "আমরা" নহে।

না হইয়া উত্তর করিল "তার কোন ভয় নাই। আমি যদি কোন দিন গোয়ালা হই, তবে খাঁটী ওজনে খাঁটী দুধ দিব।"

এই কথাবার্ত্তার পরদিন স্কুলের পরীক্ষার "প্রাইজ" দেওয়া হইল। তাহাতে নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। স্কুলের অধ্যক্ষ "প্রাইজ" দিলেন। উ—আর জ—উভয়েই খুব ভাল নম্বর পাইয়াছে; পড়া শুনায় তাহারা সমকক্ষ। পুরস্কার বিতরণ শেষ হইলে অধ্যক্ষ বলিলেন যে আর একটী পুরস্কার আছে, সেটী একটী সোণার মেডেল। এই পুরস্কারটী সচরাচর দেওয়া হয় না। ইহাতে অনেক টাকা লাগে বলিয়া যে দেওয়া হয় না তাহা নহে, পুরস্কারের উপযুক্ত ছেলে পাওয়া যায় না বলিয়াই দেওয়া হয় না। পুরস্কারটী সৎসাহসের জন্য দেওয়া হইয়া থাকে। তিন বৎসর হইল প্রথম শ্রেণীর একটী ছেলে একটী গরিব বালিকাকে জল হইতে উঠাইয়া বাঁচাইয়াছিল, তাহাকে এই পুরস্কারটী দেওয়া হইয়াছিল।

অধ্যক্ষ তার পর উপস্থিত সকলের অনুমতি লইয়া একটী ছোট গল্প বলিলেন।

"অনেক দিনের কথা নয়; কতক গুলি বালক রাস্তায় ঘুড়ী উড়াইতেছে, এমন সময় একটী ছেলে ঘোড়ায় চড়িয়া সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। ঘোড়াটা ভয় পাইয়া ছেলেটীকে ফেলিয়া দিল। তাহাতে সে এত আঘাত পাইল যে, কয়েক সপ্তাহ তাহাকে শয্যাগত থাকিতে হইল। যাহাদের জন্য এই বিপদ ঘটিল তাহারা কেহই আহত ছেলেটীর সঙ্গে গেল না। কিন্তু একটী ছেলে দূর হইতে এই ঘটনা দেখিয়াছিল, সে যে কেবল আহত ছেলেটীর সঙ্গে সঙ্গে গেল এমন নহে, কিন্তু শুশ্রূষা করিবার জন্য তাহার কাছে থাকিল।

"এই ছেলেটী শীঘ্রই জানিতে পারিল যে আহত বালকটী একটী গরিব বিধবার নাতি। বিধবার এক গরু আছে, সেই গরুর দুধ বিক্রী করিয়া সে সংসার চালায়। বিধবা বৃদ্ধ এবং খোঁড়া; এই নাতিটী ছাড়া, তাহার গরু মাঠে নিয়া দেয় এমন লোক নাই। সেই নাতিটী আঘাত পাইয়া এখন অচল হইয়া পড়িয়াছে। বালক বলিল 'আপনার কোন চিন্তা নাই, আমি আপনার গরু মাঠে লইয়া যাইব।'

"কিন্তু এই খানেই তাহার সৎকার্য্যের শেষ হইল না। ঔষধের জন্য টাকার আবশ্যক হইল। বালক বলিল, 'মা আমাকে বুট কিনিবার জন্য টাকা দিয়াছিলেন; সম্প্রতি আমার বুট না কিনিলেও চলে।' বিধবাটী বলিল 'তাহা হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের ঘরে এক জোড়া জুতা আছে। আমার নাতির জন্য কিনিয়াছিলাম, সে পরিতে পারে না। তুমি যদি এই গুলি কিন, তাহা হইলেই বেশ হয়।' বালক সেই কুৎসিত জুতা জোড়া কিনিল এবং এখনও সে তাহা পরিতেছে।

"স্কুলের অন্যান্য ছেলেরা দেখিল যে এক জন ছাত্র একটা গরু লইয়া যাইতেছে; সুতরাং তাহার উপরে হাসি এবং বিদ্রূপ বর্ষণ হইতে লাগিল। তাহার গরুর চামড়ার জুতা দুইটার উপর তাহাদিগের বিশেষ দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু সে প্রফুল্ল চিত্তে বীরের ন্যায় সেই মোটা চামড়ার জুতা পরিয়া বিধবার গরু চালাইতে লাগিল। অন্যেরা তাহাকে যে সকল ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল, এই বালক তাহার কথা ভাবিলও না। ভাল কাজ করিতেছে, ইহা মনে করিয়াই সে সন্তুষ্ট থাকিল। গরু চালাইবার কারণ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে সে চেষ্টা করে নাই, কারণ সৎকার্য্য

করিয়া গর্ব্ব করাটা তাহার ভাল লাগিত না। ঘটনা ক্রমে তাহার শিক্ষক কাল এ সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন।

"এখন আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এই বালকের আচরণে কি আপনারা প্রকৃত বীরত্ব দেখিতে পান নাই? উ—বাবু তুমি ব্ল্যাক্ বোর্ডের পেছনে পলাইওনা। বিদ্রূপের সময় তুমি ভয় পাও নাই, প্রশংসার কালে ভয় পাইলে কেন?"

উ—নত মুখে জড় সড় হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিতে লাগিল।

সেই কুৎসিৎ জুতা দুইটা এখন তাহার পায়ে কেমন শোভা পাইল। তাহার মাথায় মুকুট দিলেও হয়ত তেমন সাজিত না। মেডেল তাহাকে দেওয়া হইল, সকলে আনন্দে উচ্চ করতালি দিতে লাগিল। অন্যান্য যে সকল ছেলেরা উ—কে বিদ্রূপ করিয়াছিল তাহারা এখন যারপর নাই লজ্জিত হইল, এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহার সহিত বন্ধুতা করিতে আসিল।

(অনুবাদিত)

শিশুর আমোদ।

সুন্দর বাগান খানি নয়ন রঞ্জন
নানাজাতি তরু লতা কেড়ে লয় মন!
সু-নীল আকাশ প্রায় শোভার আকর,
শ্যামল দুর্ব্বার দল শোভে থরে থর!
সুন্দর হরিণ-শিশু দেখরে তথায়,
আপন মনেতে ওই চরিয়া বেড়ায়।
সু-নীল ফিতায় বাঁধা গলায় ঘুমুর,
ঝুণু ঝুণু রবে কিবা বাজিছে মধুর!
কচি কচি ঘাস গুলি খুঁটে খুঁটে খায়,
থেকে থেকে চারিদিকে ফিরে ফিরে চায়।
জানে বুঝি কোন ভয় নাহিক হেথায়,
প্রফুল্ল মনেতে তাই চরিয়া বেড়ায়!

কে ওই শিশুটি সাঁজো-ফুলের মতন!
কাহার সোণার যাদু আদরের ধন?
আ মরি কি সুবিমল কমল বদন!
ননীর পুতুল কিরে সুন্দর এমন?
ধরেছে দুধের বাটি কচি হাত দুটী,
হেলিয়া দুলিয়া শিশু আসে গুটী গুটী!
কচি কচি মুখ খানি সুধা হাসি তায়,
কি শোভা হ'য়েছে ওরে কে দেখিবি আয়!

হরিণের কাছে শিশু আসিয়া আদরে
"আয়" "আয়" ব'লে ডাকে সুমধুর স্বরে!
চমকি হরিণ-শিশু চাহিয়া দেখিল,
নিমেষে শিশুর কাছে ছুটিয়া আসিল।
সোহাগে বুকের মাঝে মাথাটি রাখিয়া
কত ভাবে ভালবাসা জানাইল গিয়া।

বার আছে তাহা শিক্ষা করিয়া আপনাদের উন্নতি, কল্যাণ ও সুখ বৃদ্ধি করা। ইংরেজেরা এইরূপ মেলা দ্বারা যে উপকার লাভ করেন আমরা তাহার কি বুঝিব? যদি বুঝিতাম তবে আজ আমাদের এত দুঃখ থাকিত না, যাহা হউক এ সকল কথা আর অধিক করিয়া আজ বলিতে চাহি না।

ভারতবর্ষের মধ্যে যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর বসতি, এরূপ পৃথিবীর আর কোনও রাজ্যে দেখা যায় না। ইংরেজগণ যতগুলি জাতির উপর রাজত্ব করিতেছেন এত-গুলি জাতির উপর রাজত্ব করাও পৃথিবীর অপর কোন সুসভ্য জাতির ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু যাহাদের উপর ইংরেজের অধিকার তাহাদের সকল শ্রেণীর লোকের চেহারা পর্য্যন্তও অনেক ইংরেজ দেখেন নাই। যাঁহারা বিলাত ছাড়িয়া কখনও ভারতে আসেন নাই তাঁহারা এখানকার লোকদিগকে কেমন করিয়া দেখিবেন? বাস্ত-বিক আজকাল এদেশ হইতে যাঁহারা বিলাতে কৃষি, আইন, শিল্প, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতে গমন করেন সেই সকল সুসভ্য ও শিক্ষিত বাঙ্গালী, পার্সী, বা মুসলমান যুবকগণ ভিন্ন অপর কাহারও মুখ বিলাতের ইংরেজগণ কখনও দেখিতে পান না। সেই জন্য একদিকে যেমন ভারতবর্ষের নানা প্রকার শিল্প দ্রব্য লণ্ডন মেলায় সংগ্রহ করিয়া সকলকে দেখান হইতেছে; অপর দিকে এখানকার নানা স্থানের মানুষ চিনিবারও একটী বেশ সুন্দর উপায় বাহির করা হইয়াছে। আসাম অঞ্চলের নানাপ্রকার পাহাড়ী জাতি, ছোটনাগপুরের অর্দ্ধসভ্য জঙ্গলবাসী, শিখ, পঞ্জাবী, গোরক্ষ ও মান্দ্রাজী প্রভৃতি সৈনিক-দলভুক্ত বীরগণ; এবং ব্রহ্মদেশ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপের অধিবাসী প্রভৃতি অনেকগুলি পুরুষ ও রমণীর পূর্ণাবয়ব মাটির প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া মেলা স্থলে সাজান হইয়াছে। এইরূপ প্রায় দুইশতেরও অধিক চেহারা ভারতবর্ষ হইতে লণ্ডনে পাঠান হইয়াছে। বিলাতবাসীরা ঐ সকল চেহারা দেখিয়া বড়ই খুসী হইয়াছেন। সেখান-কার বড় বড় খবরের কাগজে ঐ সকল চেহারা ছাপা হইতেছে। আমরাও পাঠক পাঠিকা-দিগকে দেখাইবার জন্য আন্দামান দ্বীপের পুরুষ ও রমণীর একখানি ছবি দিলাম। সকলে দেখ দেখি এমন কদাকার ও অসভ্য জাতির ছবি আর কখনও দেখেছ কি না।

যাহাদের চেহারা দেওয়া হইল উহাদিগকে ১৮৮৩ সালে কলিকাতায় আনা হইয়াছিল। উহাদের সঙ্গে ছোট ছোট ছেলে মেয়েও অনেক-গুলি আসিয়াছিল। আমরা সংক্ষেপে ইহা-দিগের সম্বন্ধে গোটাকতক কথা বলি, শুন।—

আন্দামানবাসীদিগের গায়ের রং কেমন কাল তাহা বোধ হয় অনেকে ছবি দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছ। আফ্রিকার নিগ্রো বা কাফ্রিদিগের অপেক্ষাও যেন ইহারা একটু বেশী কাল। মাথার চুলও কাফ্রিদের মত খুব ঘন। আবার গায়ের গন্ধ এমনি ভয়ানক যে বেশীক্ষণ ইহাদের কাছে দাঁড়ান যায় না। ইহারা প্রায় উলঙ্গবেশে বনে বনে বেড়ায়। লজ্জা নিবারণ করা নিতান্ত আব-শ্যক বোধ করিলে কখন কখন কোমরে কেবল মাত্র গাছের পাতা বা ছাল জড়াইয়া কোন মতে একটু কৌপিনের মত আচ্ছাদন ব্যবহার করে। ইহাদের অলঙ্কারের মধ্যেও বেশীর ভাগ গাছের পাতা লতা এবং শামুক, গুগ্‌লি, সমুদ্রের কীট অথবা ছোট ছোট হাড়ের মালা। ইহারা তীরধনুকের সাহায্যে বনের পশু মারে

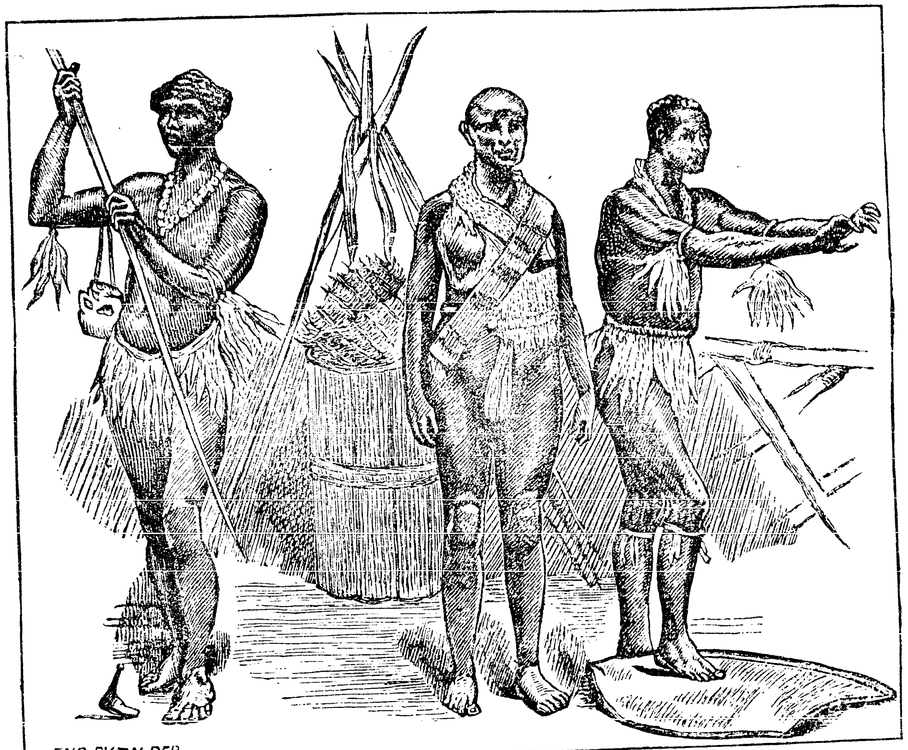
ENG BY T.N.DEB

ও তাহাদের মাংসে উদরের জ্বালা নিবারণ করে। কাঁচা মাংসে ইহাদের অরুচি নাই, সুতরাং মাংস রাঁধিবারও বড় দরকার করে না; আবার শুনা যায় যে নরমাংসও ইহাদের নিকট পার পায় না। কোন আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু হইলে ইহারা তাহার মাংস খাইয়া ফেলে, তাহার মাথার খুলিটী যত্নের সহিত অঙ্গে বহিয়া বেড়ায় এবং তাহার হাত পায়ের সরু সরু হাড়ে কোন রকম অলঙ্কার অথবা বাজাবার বাঁশী তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করে। নেশায় ইহারা এত পটু যে, যে মদ খুব চড়া, যাহার একগুণ খাইলে এ দেশের বড় বড় মাতা-লেরা ঢলিয়া পড়ে, আন্দামানীরা অবলীলাক্রমে তাহার তিন গুণ পান করে। সর্ব্বক্ষণ নেশা করিয়াও ইহাদের আশা মিটে না। ধূম-পানেও ইহারা খুব মজপুত। তামাক বল, চুরট বল, যত দাও ততই টানিবে। বলিতে কি নেশা ক'রে ক'রে ইহাদের এক এক জনের প্রকৃতি এমনই হ'য়ে পড়ে যে, সে চব্বিশ ঘণ্টা কেবলই অলস ভাবে জড়ের ন্যায় পড়িয়া থাকা ভিন্ন জীবনে আর কোনও সুখ চাহে না। এক কথায় বলিতে কি ইহাদের চাল চলন দেখিয়া ইহাদিগকে রাক্ষস অথবা নররূপী পশু ভিন্ন আর কিছু বলিতে ইচ্ছা হয় না।

আন্দামানবাসীরা যখন কলিকাতায় ছিল তখন চৌরঙ্গীতে একদিন ইহাদের নাচ হয়। সে নাচের মাঝে মাঝে কেবল ভয়ানক লাফা-

লাফি, মুখে একরূপ বিকট চীৎকার এবং বিশ্রী অঙ্গভঙ্গী ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় নাই।

ফুলের সাজি।

(৯৪ পৃষ্ঠার পর।)

একদিন হেমলতা মনোরমাকে বলিল, "মনোরমে কাল আমার জন্মতিথিপূজা, তুমি প্রত্যুষে উঠিয়াই এখানে আসিবে, তোমার কাল আমাদের বাড়ী ভোজন করিবার নিমন্ত্রণ রহিল। মনোরমা বলিল "রাজকুমারি আপনার দয়ার গুণে আমি দিন দিন আকৃষ্ট হইতেছি আপনার যেরূপ অভিলাষ তাহাই হইবে।" সে সে দিন বাড়ী গিয়া পিতাকে আগেই রাজকন্যার জন্মতিথি ও তদুপলক্ষে তাহার নিমন্ত্রণের কথা জানাইল। তখন দীননাথ কহিল, "তবে তুমি সকালেই আমার জন্য রন্ধন করিয়া রাজকুমারীর নিমন্ত্রণে যাইবে, কিন্তু সাবধান আমরা গরিব, আমাদের সহিত রাজ পরিবারের সম্বন্ধ বিপদশূন্য নহে, আমি বহুদিন রাজ সংসারে কর্ম্ম করিয়া বেশ জানি যে, যাহারা আজ রাজা বা মহিষীর প্রিয়পাত্র, তাহারা আবার কিছুদিন পরেই তাঁহাদের চক্ষুশূল।" মনোরমা কহিল "সে বিষয়ে আপনার সন্দেহ করিবার কারণ নাই, হেমলতার গুণের তুলনা নাই, আমি তাহার স্বভাব ও আচরণে বাস্তবিক মুগ্ধ হইয়াছি। বাবা, আমি তাঁহাকে তাঁহার জন্মদিনে কি উপহার দিব ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না।"

দীননাথ। মা, আমরা দরিদ্র, কি উপহার দিয়া রাজতনয়ার সন্তোষ বিধান করিতে পারি বল? আমি বলি অন্য কিছু না দিয়া সে দিন আমি যে ফুলের সাজিটী তৈয়ার করিয়াছিলাম, উত্তম উত্তম ফুল দিয়া সাজাইয়া সেই সাজিটী রাজকন্যাকে উপঢৌকন দেও, মূল্যবান বস্ত্র বা অলঙ্কার অপেক্ষা ইহা অধিক মনোনীত হইবে সন্দেহ নাই।

মনোরমা। বাবা, আমিও এক একবার ভাবিতেছিলাম যে, আমাদের বাগানের উত্তম উত্তম ফুলগুলি তুলিয়া রাজকন্যাকে উপহার দিব। আমায় তুমি যে সাজিটী দিয়াছ তাহার চমৎকার গঠন, তাহাতে কত কাজ; আমি ও তুমি যাহা যাহা বলিলে তাহাই উপযুক্ত বোধ করিতেছি।

আজ হেমলতার জন্মতিথিপূজা, রাজ-উদ্যান জনাকীর্ণ; তোরণ হইতে প্রত্যুষে নহবৎ ধ্বনি হইতেছে। উদ্যান পথের দুই পার্শ্বে মঙ্গল ঘট ও কদলী বৃক্ষ স্থাপিত হইয়াছে। উদ্যানে আজ সমস্ত উৎসবময়, কাহারও মুখে নিরানন্দ নাই। রাজ প্রসাদ পাইব বলিয়া দাস দাসীরা আজ মহাআনন্দিত। উদ্যান বাড়ী পুষ্প ও পত্রে সজ্জিত এবং সুগন্ধ ধুনা ও গুগ্‌গুলের গন্ধে রাজভবন যেন একটা দেবভবন হইয়াছে।

মনোরমা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া সমুদায় গৃহকর্ম্ম সমাপন করিল। এবং তাহাদের উদ্যান হইতে কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট গোলাপ, বেল, যুথিকা প্রভৃতি কুসুম সাজি

ভরিয়া তুলিল। কতকগুলি চমৎকার মালা গাঁথিয়া, তাহার মধ্যে "রাজকুমারী হেমলতার জন্য" লিখিল। এইরূপে সাজিটী অত্যন্ত মনোহর হইল। যখন স্নানান্তে দাসিগণ হেমলতার বেস বিন্যাস করিয়া দিতেছে তখন মনোরমা তাঁহার নিকট আসিয়া সাজিটী স্থাপন করিল, হেমলতা সাজিটী দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। কুমারী আজ কত ভাল বস্ত্র ও অলঙ্কার পাইয়াছেন কিন্তু কিছুই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

হেমলতা বলিলেন "মনোরমে তোমাদের বাগানে দেখ্‌ছি আজ আর একটী ফুলও রাখ নাই, এ সাজিটী কে বুনেছে, আহা! ইহার কারু কার্য্য অতি চমৎকার! মনোরমা কহিল "সাজিটী আমার পিতার হস্ত-নির্ম্মিত।"

রাজ কুমারী মনোরমাকে লইয়া মহিষীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং আনন্দের সহিত মনোরমার সাজিটী মাতাকে দেখাইয়া বলিলেন, দেখ মা, এটী কি মনোহর উপহার! আমিত কখন এমন চমৎকার সাজি দেখি নাই, আহা! এই ফুলগুলি আমাদের বাগানের ফুলের অপেক্ষা অনেক বড়।

রাজমহিষীও এই উপঢৌকন দেখিয়া মনে মনে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন "যথার্থই এমন রমণীয় ফুল কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। ফুল গুলি পূর্ণ বিকসিত ও সুগন্ধের আধার। এই সাজিপূর্ণফুল দেখিলে মনোরমার মনের সুন্দর ভাব ও রুচি বেশ বুঝা যায়। মনোরমা! একটু এখানে অপেক্ষা কর আমরা এখনি আসিতেছি" এই বলিয়া রাজ মহিষী হেমলতাকে গৃহান্তরে আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। গৃহান্তরে গমন করিয়া রাজমহিষী কন্যাকে বলিলেন, "হেম আজ তুমি মনোরমাকে কিছু উপহার না দিয়া কখনও ছাড়িও না। বল দেখি তাহাকে কি উপহার প্রদান করিলে ভাল হয়?" হেমলতা বলিলেন,—মা, আমার সেই নূতন বারাণসী শাড়ী খানি দিলে হয় না? সেখানি আমি একবার মাত্র পরিয়াছিলাম।

রাজমহিষী হেমলতার কথায় অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন, হেমলতা মনোরমার নিকট গমন করিয়া কোন পরিচারিকাকে ডাকিয়া বলিলেন "আমার গৃহ হইতে আমার সেই নূতন বারাণসী শাড়ীখানি আনিয়া দেও, মনোরমাকে উপহার দিব। মায়া কুমারীর কথা শুনিয়া ঈর্ষানলে জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, রাণী মা এ কথা জানেন? হেমলতা ঈষৎ বিরক্ত ভাবে বলিলেন "সে কথা তোমার জানিবার প্রয়োজন নাই, কাপড় এখানে আন।"

মায়া আর কথা কহিল না, মনে মনে গজরাইতে গজরাইতে গৃহ হইতে কাপড় আনিতে গেল। যাইতে যাইতে মনে মনে ভাবিল, রাজকন্যার ব্যবহৃত বস্ত্র কেবল আমারই প্রাপ্য। কোথা হইতে একটা চাষার মেয়ে আসিয়া আমার সে অধিকার লোপ করাইতেছে। রাজকন্যা আমাদের সঙ্গে আর তেমন কথা কহেন না। কেবল শুইতে বসিতে মনোরমা মনোরমা, যদি আমি ইহার শোধ লইতে পারি তবে জানিব আমার নাম "মায়া"। সে এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে বারাণসী কাপড় খানি হেমলতাকে আনিয়া দিল। হেম কাপড় লইয়া মনোরমার হস্তে দিয়া কহিলেন "ভাই তোমায় আমার প্রদত্ত এই উপহারটী গ্রহণ করিতে হইবে। সরলা মনোরমা রাজকন্যার আগ্রহ দেখিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা গ্রহণ করিল। মনোরমা গৃহে

প্রত্যাগমন করিল। মায়া সমস্ত দিন ঈর্ষায় জ্বলিতে লাগিল। সেই দিন বৈকালে যখন হেমলতা কেশ বন্ধন করিতেছেন তখনও তাহার ক্রোধের উপশম হয় নাই, ক্রোধভরে কেশবন্ধন করিতে করিতে একবার একটু জোরে রাজকন্যার কেশ টানিল। তিনি মায়ার মনোভাব কথঞ্চিৎ বুঝিয়া বলিলেন "মায়া তুই কি মনোরমাকে কাপড় দিয়াছি বলিয়া রাগ করিয়াছিস্?"

মায়া মনের ভাব চাপিয়া বলিল, আপনি যাহা করিবেন তাহাতে আমার আবার রাগ কি?

মনোরমা বাড়ী গিয়া আগে পিতাকে রাজকুমারীপ্রদত্ত কাপড় দেখাইল; তাহার মুখে আনন্দ ধরে না। কিন্তু দীননাথ কাপড় দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইল না; সে তাহার পক্ক কেশযুক্ত মস্তক নাড়িয়া কহিল, বাছা এখন বোধ হইতেছে যে, ঐ ফুলের সাজি রাজবাড়ী না লইয়া গেলেই ভাল হইত। রাজ কন্যার প্রদত্ত উপহার বলিয়া আমি ইহাকে সম্মান করিতেছি সত্য, কিন্তু তোমাকে এই উপহার পাইতে দেখিয়া অনেকে ঈর্ষাপরবশ হইবে; আর পাছে তুমি এই কাপড় পরিয়া মনে মনে গর্ব্বিতা হও ইহাও আমার বড় ভয় হইতেছে। সাবধান যেন এই কাপড় পরিধান করিয়া অহঙ্কৃত হইয়া না পড়।

বিনয়, লজ্জা, সত্যকথা ও মিষ্ট কথাই বালিকার যথার্থ অলঙ্কার।

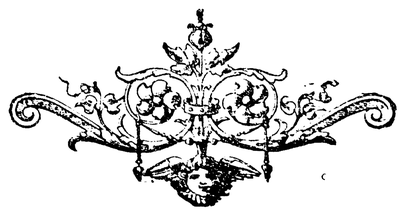

ধাঁধা।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

২	৯	৪
৭	৫	৩
৬	১	৮

গতবারের নূতন প্রকারের ধাঁধার উত্তর অনেকেই দিয়াছেন; কাহারও রচনা প্রকাশযোগ্য বলিয়া বোধ হইল না। উক্ত ছবিটী অবলম্বন করিয়া একটী রচনা বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। ইতি মধ্যে যদি কেহ উক্ত ছবি অবলম্বনে একটী রচনা পাঠান, এবং তাহা যদি মনোনীত হয়, তাহা হইলে তাঁহার রচনাই প্রকাশিত হইবে।

নূতন।

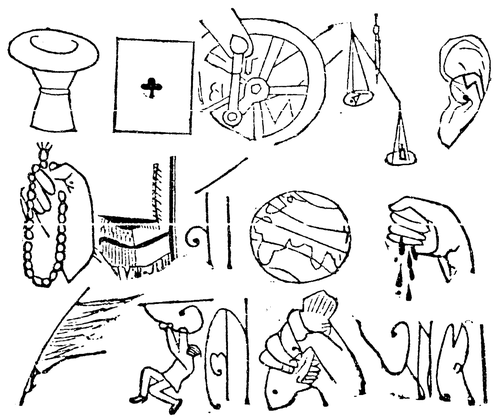

পড় দেখি?

আগষ্ট, ১৮৮৬।

পৃথিবীর গোলত্ব।

তোমরা সকলেই ভূগোলসূত্রে পৃথিবী যে গোল তার তিনটী প্রমাণ পড়িয়াছ; বেশ্ করিয়া মুখস্থ করিয়াও রাখিয়াছ; কিন্তু ঐ বিষয়ে উত্তম রূপ বোধ না হইলে সুবিধা নাই। কিছুদিন হইল আমি একখানি বাঙ্গালা বৈ দেখিয়াছিলাম তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তা, একজন বিদ্বান ভট্টাচার্য্য, নানা শাস্ত্র হইতে বচন তুলিয়া ও নিজের গভীর তর্কযুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই পৃথিবী কখনও গোলাকার নহে এবং দধি সমুদ্র, ক্ষীর সমুদ্র প্রভৃতি যত সমুদ্র আছে, তাহাদের তীরে ৪০ লক্ষ যোজন বিস্তীর্ণ সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বৃক্ষ আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি!—যখন এই বৈ খানা দেখিলাম তখন মনে হইল যে এত বিজ্ঞান ও সুশিক্ষার মধ্যেও এ প্রকার বৈ ছাপা হয় আর পড়া হয়। কি জানি যদি তোমাদের মধ্যে কেহ সেই রকম কোন পণ্ডিতের সম্মুখে পড় তাহা হইলে হয়ত তোমাদের বিশ্বাস টলিয়া যাইবে; পৃথিবী গোল নয় হয়ত বলিয়া বসিবে। সুতরাং এ বিষয়ে শুদ্ধ তিনটী প্রমাণ মুখস্থ করিয়া রাখিলে চলিবে না। বেশ্ করিয়া কথাটা বুঝা দরকার। তাই আজ আমরা এই বিষয়ে কিছু খুলিয়া লিখিব মনে করিয়াছি। মন দিয়া বুঝিয়া পড়িলে ও মনে রাখিলে কেহ আর ঠকাইতে পারিবে না।

আচ্ছা মনে কর পৃথিবী গোল নয়। একটা সীমাবিহীন বা খুব বড় ময়দানের মত কেবল লম্বা চওড়া জমী। তাহা হইলে কি ভুল হয় দেখা যা'ক। এই রকম উল্টা দিক দিয়া বিচার করিলে সুবিধা হয়। যেমন তোমাদের গ্রামের বড় মাঠটা, পৃথিবী যদি তেমনি হয় ত কি দোষ?—বেশ্। তোমাদের বাড়ীর ছাতটা খুব বড় তার এক ধারে আল্‌শের কাছে শুয়ে তোমরা গল্প ক'রছ। এখন হঠাৎ এক ধারের আল্‌শের কাছে যদি একটা প্রদীপ জ্বালা যায় তা কি তোমরা দেখিতে পাবে না? অবশ্য পাবে। এমন কি, ছাতের ও পাশে যদি একটা জোনাকি পোকা থাকে তাও দেখিতে পাও। কিন্তু একটা বড় জালার এক পাশে চক্ষু দিয়া দেখিলে তাহার অন্য পাশের পিঁপড়ে দেখা যায় না। কেননা পিঁপড়ে জালার ফুলা গায়ের জন্য ঢাকা থাকে। কোন বড় মাঠের একধারে একটা আগুন জ্বালিলে ওধার থেকে বেশ দেখা যায়।—কিন্তু একটা ছোট পাহাড়ের একধারে আগুন থাকিলে ওপার থেকে দেখা যায় না, পাহাড়ের উঁচু ভাগে ঢাকা থাকে।

পৃথিবীকে আমরা মাঠের মত সমান ধরিয়াছি। তাহা হইলে তাহারও একদিকে যদি আগুন জ্বালি তবে সব জায়গা থেকে দেখা যাবে। তাহা হইলে পূর্ব্বদিকে যখন সূর্য্য উঠিবে তখন যেমন আমরা দেখিতে পাইব, পৃথিবীর সব স্থান থেকেই সব লোকে এক সঙ্গে দেখিতে পাইবে। তোমরা বলিয়া উঠিবে "তাত পাবেই, যতক্ষণ গাছ পালার আড়ালে থাকিবে ততক্ষণ সকলে দেখিতে পাইবে না। যেই ভাল করিয়া উচ্চ হইয়া আকাশে উঠিবে; অমনি পৃথিবী শুদ্ধ লোকে এক সঙ্গে সূর্য্য দেখিতে পাইবে সন্দেহ কি?" কিন্তু, সমস্ত পৃথিবীর লোক এক সঙ্গে সূর্য্যকে উঠিতে দেখে না, এক সঙ্গে অস্ত যাইতেও দেখে না। আমাদের দেশে যখন প্রথম সূর্য্য দেখা দেয়, সেই ভোর বেলা যখন আমরা উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া পড়িতে বসি, আমাদের পশ্চিমে যাদের বাড়ী,—যত দূর দেশে তারা তত পরে সূর্য্যকে উঠিতে দেখে, আর তত পরে অস্ত যাইতেও দেখে; আর আমাদের পূর্ব্ব দিকে যাদের বাড়ী,—যত দূরে তারা তত আগে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত দেখিতে পায়। তোমরা জান ইংলণ্ড দেশ আমাদের দেশের পশ্চিমে অনেক দূরে। এই জন্য আমাদের এখানে যখন সূর্য্য উঠে, তখনও সেখানকার লোকেদের অর্দ্ধেক রাত্রি, যখন এখানে বেলা দুই প্রহর তখন বিলাতে প্রাতঃকাল। যখন আমরা সূর্য্য অস্ত যাইতে দেখি সেই সন্ধ্যা বেলা তাহাদের মধ্যাহ্ন, সূর্য্য তখন তাহাদের মাথার উপর! কি আশ্চর্য্য!! এ বিষয়ে একটা সঙ্কেত বলিয়া দিতে পারি যাহা দ্বারা ম্যাপ দেখিয়া যে কোন স্থান হউক না কেন তোমরা বলিয়া দিতে পারিবে সেখানে সূর্য্য উঠিতে এখানকার চেয়ে কত দেরী লাগে বা শীঘ্র হয়। ম্যাপে উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত যে সকল রেখা টানা থাকে তাহাদিগের দ্বারা ডিগ্রীর মাপ জানা যায়। বিষুব রেখার কাছে এক এক ডিগ্রী প্রায় ৭০ মাইল দূরে দূরে থাকে। আর এই এক ডিগ্রী দূরে যে সকল দেশ তাহাদের মধ্যে সময়ের তফাৎ ৪ মিনিট। অর্থাৎ আমাদের কলিকাতা হইতে যে স্থান ১ ডিগ্রী পশ্চিমে সেখানে কলিকাতা অপেক্ষা ৪ মিনিট পরে সূর্য্য উঠিয়া থাকে। যে স্থান কলিকাতা হইতে ১৫ ডিগ্রী পশ্চিমে তথায় ৬০ মিনিট বা এক ঘণ্টা পরে সূর্য্য দেখা যায়। আবার যে নগর কলিকাতা হইতে ১৫ ডিগ্রী পূর্ব্ব দিকে তথায় সূর্য্য কলিকাতার ১ ঘণ্টা আগে উঠে। বোধ হয় এখন সব যায়গার সঙ্গে তুলনা করিতে শিখিলে।

যাহা হউক দেখা গেল যে পূর্ব্ব দিকে যখন সূর্য্য আকাশে দেখা যায়, তখন সমস্ত পৃথিবীর সব লোক একবারে সূর্য্য দেখিতে পায় না। কেন পায় না? পৃথিবী মাঠের মতন হইলে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইত! তা যখন হয় না স্পষ্ট জানিতেছি (একস্থান থেকে আর এক স্থানে টেলিগ্রাম করিলেই জানা যায়) তখন কেমন করিয়া বলিব যে পৃথিবী মাঠের মত। নিশ্চয়ই পৃথিবী তেমন নহে। নিশ্চয়ই তবে অন্য রকম হবে। কলিকাতা ও ইংলণ্ডের মধ্যের ভূভাগ জালার পিঠের মত নিশ্চয়ই উঁচু, নহিলে এরূপ কেন হইবে?

পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ যে সমতল নহে, জালার মত, তাহার আরও একটী উৎকৃষ্ট প্রমাণ আছে। সেটী প্রায় সকলেই পড়িয়াছ। যখন কোন জাহাজ সাগরের কিনারা হইতে দূরদেশে যাত্রা করে, তখন যদি তথায় অল্প ক্ষণ দাঁড়াইয়া থাক,

তবে বড় আশ্চর্য্য দেখিবে যে, প্রথমে জাহাজের লোক জন সব দেখা যাবে, ক্রমে যতই দূরে যাইবে ততই অল্প অল্প অস্পষ্ট বোধ হইবে। দূরের দ্রব্য কখনই নিকটের জিনিসের মত পরিস্কার দেখা যায় না। কিন্তু তখনও জাহাজের সবটা বেশ্ দেখিতে পাবে। ক্রমে যখন এক ক্রোশেরও বেশী দূরে গিয়া পড়িবে, তখন জাহাজের তলাটা যেন খানিকটা ক্ষয় হইয়া বা জলের মধ্যে ডুবিয়া গেল বোধ হইবে। ক্রমে আরও একটু একটু করিয়া অনেকটা অদৃশ্য হইবে। শেষে জাহাজের কাষ্ঠ বা লৌহময় খোলটুকুর আর কিছুমাত্র দেখা যাবে না, কেবল মাস্তুল ও পাল দেখা যাইবে। আরও দূর—শেষে বড় মাস্তুলের আগাটুকু ঝিক্ ঝিক্ করছে, তার পর, ঐ যা—কিছুই না। এইরূপে জাহাজ খানার নীচে থেকে ক্রমে ক্রমে সমস্তটা অদৃশ্য হইয়া যায় কেন? অনেক দূর বলিয়াই কি এরূপ হয়? না, হ'তে পারে না। কেননা দূরের জিনিস ছোট দেখায় বটে, অস্পষ্টও দেখায় সত্য; কিন্তু তাহার সমস্ত অবয়বটাই ঐরূপ ছোট ও অস্পষ্ট দেখা যায়। কোন অংশই অদৃশ্য হয় না। তার পর আরও প্রমাণ এই যে, দূরের ছোট ও অস্পষ্ট দেখান বন্ধ করিবার জন্য যে দূরবীক্ষণযন্ত্র আছে

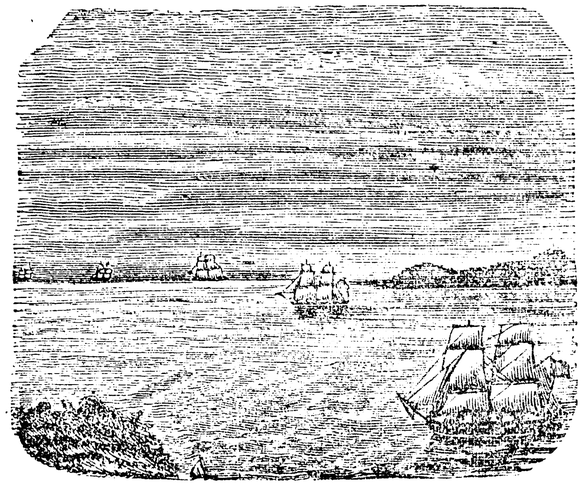

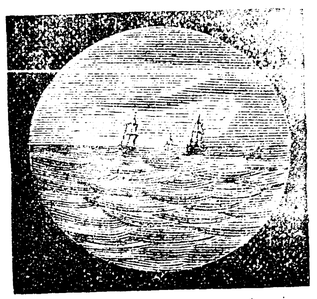

তাহা দ্বারা খুব দূরের দ্রব্যও কাছে এবং বড় ও স্পষ্ট দেখা যায়। তুমি যদি ঐ যন্ত্র দ্বারাও জাহাজ খানার দিকে দেখ, তাহা হইলেও ঠিক ঐরূপ দেখিবে। অস্পষ্ট ও ছোট দেখাইবে না কিন্তু ঠিক বোধ হবে যেন জাহাজের তলা থেকে উপর পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে জলের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছে *। তোমার ও জাহাজের মধ্যের জলভাগ যদি মাঠের মত সমতল হইত তাহা হইলে কখনই এইরূপ একটু একটু করিয়া জাহাজের নিম্ন অবয়ব গুলি ও

* এক কিম্ভূত ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, পৃথিবী সমতল হইলেও নাকি এইরূপই দেখা যাইবে। তিনি অনেক মাথা খুরাইয়া ইহার পক্ষে যুক্তিও দিয়াছেন, সে বড় চমৎকার যুক্তি—তোমরা মনোযোগ দিয়া শুন। উপরকার বায়ুর চাইতে নীচেকার বায়ু বেশী ঘন, তা তোমরা অনেকেই জান। আচ্ছা দূরের বস্তু অস্পষ্ট দেখা যায় কেন? না সামনের বায়ুতে দৃষ্টিকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে রোধ করে বলিয়া। অনেক দূরের জিনিস হইলে অনেক বায়ু সামনে পড়ে, সুতরাং আরো অস্পষ্ট দেখা যায়। বাতাসটা যদি আরো ঘন হইত, তবে এর চাইতে কাছের জিনিসই ঐরূপ অস্পষ্ট দেখা যাইত। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিতেছেন যে মাস্তুলের আগাটা আমরা সকলের চাইতে পাতলা বাতাসের

অবশেষে সমস্তটা অদৃশ্য হইত না। নিশ্চয়ই ঐ মধ্য ভাগের জল জালার পিঠের মত ঈষৎ ফুলিয়া আছে। ঐ ফুলা এত কম যে হঠাৎ চক্ষে দেখা যায় না কিন্তু এই বিষয়টী ভাবিয়া দেখিলেই নিঃসন্দেহ বুঝা যাইবে যে ঐরূপ ফুলো নিশ্চয়ই আছে। গঙ্গায় স্নান করিবার সময়ে চক্ষু জলের কাছে রাখিয়া দূরের নৌকা দেখিলেও ঐরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। তোমরা বরং চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার।

এই পরীক্ষাটীর দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, সাগরের জল মাঠের মত সমতল নহে, খুব প্রকাণ্ড একটা জালার পিঠের মত। আর পৃথিবীর ম্যাপ দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, সমস্ত পৃথিবীর ৪ ভাগের ৩ ভাগ জল আর এক ভাগ মাত্র স্থলে আবৃত। সেই ৩ ভাগ অর্থাৎ বার আনা অংশ জলের যেখানে ঐ পরীক্ষা করা যাক না কেন, ঐ একইরূপ ফল দেখা যাইবে। অর্থাৎ পৃথিবীর বার আনার আকার যে জলের মত, তাহা ঠিক হইল। বাকী যে যে চারি আনা স্থল তাহারও আকার ঐরূপ। প্রমাণ করাও কঠিন নহে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে "বেড্‌ফোর্ড লেবেলে" তাহার বেশ দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। ওয়ালেস্ নামক একজন সাহেব "ক""খ""গ" নামে ১৩ ফীট ৪ ইঞ্চ পরিমাণ তিনটী সমান উচ্চ খুঁটি ঠিক সোজা করিয়া (তিন) ৩ মাইল অন্তর অন্তর বসাইলেন। জমী যদি ঠিক সমতল হয়, তাহা হইলে ঐ তিনটী খুঁটিরই মাথা সমান থাকিবে। কিন্তু তিনি "ট" নামক এক দূরবীক্ষণ যন্ত্র এমন ভাবে বসাইলেন যে তাহাতে "ক"ও"গ" খুঁটির মাথা ঠিক সমান রেখায় দেখা যায়। তখন দেখা গেল যে "খ" খুঁটিটার মাথা ঐ রেখার ৫ ফীট উপরে আছে। ইহা বেশ ধীর ভাবে বুঝিলেই দেখিতে পাইবে যে, যেখানে "খ" পোতা ছিল সেখানকার মাটি ক ও গ এর তলা অপেক্ষা ৫ ফীট উঁচু। অর্থাৎ ঐ স্থানটা জালার পিঠের মত উঁচু বা ফুলা। ঐ ফুলা এত কম যে চক্ষু দ্বারা বুঝা যায় না।

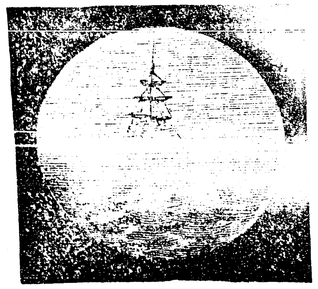

ঝাপসা হইয়া অদৃশ্য হওয়া আর একটা কিছুতে ঢাকা পড়িয়া অদৃশ্য হওয়া, এই দুয়েতে যে কি তফাৎ, ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আমি আশা করি তোমাদের মধ্যে এত বোকা কেহ নাই। সমুদ্রে যে জাহাজের নীচের অংশ অদৃশ্য হয় তাহা ক্রমশঃ ঝাপসা হইয়া নহে; কারণ অদৃশ্য অংশ যে জলে ঢাকা পড়িয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। পণ্ডিত মহাশয় ঘরের কোণে বসিয়া বুদ্ধি খাটাইয়া ছিলেন কাজেই বাস্তবিক ঘটনার সহিত মিলিয়া উঠে নাই। পণ্ডিত মহাশয় পৃথিবীর গোলত্ব সম্বন্ধে প্রায় প্রত্যেকটী যুক্তি লইয়াই এই প্রকার এক একটা কাণ্ড করিয়াছেন। সবগুলির কথা শুনিলে পাছে গল্পের বিড়ালের মত হাসিতে তোমাদের পেট ফাটিয়া যায়, এই ভয়ে ক্ষান্ত থাকিলাম।

ভিতর দিয়া দেখি সুতরাং সেটা সকলের চাইতে স্পষ্ট দেখা যায়। তার নীচের অংশটা তার চাইতে ঘন বাতাসের ভিতর দিয়া দেখি, (কারণ উপরের বাতাসের চাইতে নীচের বাতাস ঘন—যতই নীচে আসিতেছি বাতাস ততই ঘন হইতেছে,) সুতরাং সেটাকে মাস্তলের আগার চাইতে অস্পষ্ট দেখি। এই কারণে তার নীচের স্থানটুকু আরো অস্পষ্ট দেখি। এইরূপে ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া জাহাজের নীচের অংশ একবারে অদৃশ্যই হইয়া যায়। (ছবি দেখ) কিন্তু ক্রমশঃ

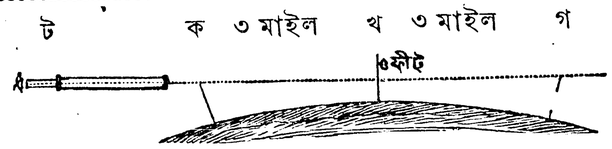

এই রূপে শত শত পরীক্ষা যারপরনাই যত্ন ও সাবধানতার সহিত করা হইয়াছে। সকল বারেই একই রূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কখনই ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। অর্থাৎ পৃথিবীর জল ভাগ এবং স্থলভাগ দুইই জালার পিঠের মত ফুলা, মাঠের মত সমতল নহে।

কিন্তু পৃথিবী যে বর্ত্তুল বা ভাঁটার মত গোলাকার জড় পিণ্ড, তাহা এখনও প্রমাণ হইল না। কেবল দেখা গেল যে থালার মত সমতল নহে। গোলাকার পিণ্ড মাত্রেরই এমন একটী গুণ আছে যাহা অন্য আকারের পিণ্ডের নাই। সেটী এই যে—উহাকে যে দিক দিয়াই দেখনা কেন, গোল দেখাইবে। মনে কর গোল থালা; ঠিক সম্মুখ হইতে দেখিলেই উহাকে গোল দেখায়, নহিলে নয়। মনে কর হাঁসের ডিম; সরু দিকটা সুমুখে ধরিয়া দেখিলেই গোল দেখায় কিন্তু লম্বা দিকটা সুমুখে ধরিলে আর গোল দেখায় না। কিন্তু একটা ভাঁটা বা কামানের গোলা; তাকে যে দিকে যেমন করিয়া ধর গোল দেখাইবেই দেখাইবে। পৃথিবীর ও তাই। যেখানেই দাঁড়াও না কেন, চারিদিকে চাহিলেই গোলাকার দেখাইবে প্রকাণ্ড মাঠের মাঝখানে দাঁড়াইয়া চারিদিকে তাকাইলে গোল একটী রেখা দেখা যায় সেই খানে; মাঠ ও আকাশ যেন মিশিয়াছে। ইংরাজীতে ইহাকেই "হোরাইজন" (HORIZON) বলে। এই দৃষ্টি সীমা রেখা বা হোরাইজন সর্ব্বত্র সর্ব্বদা গোলাকার। যত উপরে উঠা যায় ততই এই বৃত্ত (circle) আকারে বড় হয় কিন্তু গোলই থাকে, পাহাড়ের চূড়ায় বসিয়া দেখিলেও চারিদিকে ঐরূপ গোল রেখা দেখা যায়। পৃথিবীর যে স্থান হইতেই দেখ সর্ব্বত্রই ঐরূপ দেখা যাইবে। এই একটী বিশেষ প্রমাণ যে পৃথিবী বর্ত্তুলাকার বা ভাঁটার মত গোল।

আরও একটী অকাট্য প্রমাণ আছে। তাহাও তোমরা ভূগোলে পড়িয়াছ। নাবিকেরা এক নির্দ্দিষ্ট দিক লক্ষ্য করিয়া যদি ক্রমাগত চলিতে থাকে তবে, নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে পুনরায় আপনাদের দেশে আসিয়া উপস্থিত হয়; ইহার মধ্যে একটীবারও তাহাদিগকে দিক পরিবর্ত্তন করিতে হয় না। পৃথিবী ঠিক গোল না হইলে কখনই এরূপ হইতে পারিত না।

তার পর, আমেরিকাতে টেলিগ্রাফ্ করিলেই জানা যায় যে ঠিক যখন আমাদের দেশে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, সেখানে তখন ঠিক উদয় হইতেছে; এইরূপ কেমন করিয়া হয়? আমেরিকা মহাদেশ যে আছে, তাহাতে তোমাদের সন্দেহ নাই। তবে কিরূপে ঐরূপ ঘটে? আমেরিকা ঠিক আমাদের নীচে বা বিপরীত দিকে আছে না বলিলে আর এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। নতুবা আর আমাদের দুপর বেলায় তাহাদের দুপর রাত্রি আর আমাদের রাত্রে তাদের দিন কিরূপে হইবে?

সেই রূপ চন্দ্র গ্রহণের সময় পৃথিবীর গোলাকার ছায়া যে চন্দ্রের উপরে পড়িয়া তাহাকে ঢাকিয়া ফেলে তাহা তোমরা জান কিন্তু কি কারণে ওরূপ হয় তাহা অত্যন্ত কঠিন। অন্য সময়ে সহজে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। পৃথিবী যে গোল তার আরও অনেক গুরুতর প্রমাণ আছে, কিন্তু সখার পাঠক পাঠিকাগণের তাহা বোধগম্য হইবে না বলিয়া এখানে সেগুলি দেওয়া গেল না।

এক পাশে অই, অঙ্কের সে বই,
রহিয়াছে খোলা-পাতা ;
কসিছেন যাদু, কতই যতনে,
ঘেমেছে কপাল মাথা।
কত শত বার, গুণিছেন তবু,
মিলিছেনা অঙ্ক আর,
ঘরের চাতালে, মেঝের দেয়ালে,
চাহিছেন বারে বার।
গুণিছেন পুনঃ, করিয়া যতন,
তথাপিও নাহি মেলে,
এ কিরে আপদ, বিষম বিপদ,
ভাবিছেন ভোলা-ছেলে।
একবার শ্লেট, ফেলিয়া মাটিতে,
মুটো বেঁধে ধ'রে চুল,
গুণিছেন ধীরে, মনোযোগ দিয়ে,
তবু ছাই যায় ভুল!
আবার তুলিয়া, কোলেতে করিয়া,
সাবধান হ'য়ে অতি,
গুণেন যতনে, কত প্রাণপণে,
আবার যে সেই গতি!
টেনে টেনে কাণ, হ'য়ে গেল লাল,
কিছুতেই রক্ষা নাই,
মেলেনাক তবু, ছাই পোড়া আঁক
এ কিরে জঞ্জাল ভাই!
অবশেষে বাবু, করিলেন স্থির,
নিশ্চয় কেতাবে ভুল,
নহিলে কেনবা, হইবে এমন,
কেতাব (ই) অনর্থমূল!
তানয় তানয়, ওহে ভোলা ভাই,
দেখ দেখি ভাল ক'রে?
আন দেখি বই, দেখিব এখনি,
কাহার কে ভুল ধরে?
এই দেখ চেয়ে, পাঁচে আর ছয়ে,
কিছু তব ভেদ নাই,
সেই সে কারণে, এতই জঞ্জাল,
পড়েছ ধাঁধায় তাই!!!—

ফুলের সাজি।

তৃতীয় অধ্যায়।

(১১২ পৃষ্ঠার পর)

মনোরমা আপন গৃহে প্রবেশ করিয়া একবার কাপড়খানি পরিধান করিল এবং তখন যত্নের সহিত আবার তাহা পাট করিয়া সিন্ধুকে তুলিয়া রাখিল। সে সিন্ধুকে কাপড় রাখিয়া বাহিরে পিতার নিকট আসিতে না আসিতেই দেখিল রাজকুমারী হেমলতা তাহার ঘরের দিকে দ্রুতপদে আসিতেছেন। রাজকুমারীর মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে ; সর্ব্ব শরীর ভয়ে কম্পিত হইতেছে। মনোরমা মনে মনে ভাবিল এ কি? রাজকন্যা আমাদের বাড়ীতে এলেন কেন? এর মধ্যে এমন কি হইল। সে এই ভাবিয়া রাজকন্যাকে যেমন তাহাদের কুটীরে আগমনের কথা জিজ্ঞাসা করিবে মনে করিতেছে অমনি হেমলতা তাহার কাছে আসিয়া বলিলেন,

মনোরমা তুমি করেছ কি? আমার মার হীরার আংটী কোথায়? তুমি ভিন্ন ত ঘরে আর কেহই ছিল না, তবে সে আংটী গেল কোথায়? শীঘ্র আংটী আমায় দেও, আমি ও মা এখন এ কথা প্রকাশ করি নাই, পাছে গোল হইয়া পড়ে তাই আমি নিজে খিড়্কীদোর দিয়া তোমাদের বাড়ী আসিলাম। শীঘ্র দেও, না দিলে বড় গোল বাঁধিবে।

মনোরমা ক্রন্দন করিতে লাগিল। সে বলিল, "রাজকুমারি, দিব্য করিয়া বলিতেছি যে আমি অঙ্গুরীয় দেখি নাই। চুরির কথা দূরে থাকুক যাহা আমার নয় আমি তাহা স্পর্শ করিতেও পারি না। আমার পিতা পরের দ্রব্যে লোভ করিতে নাই বলিয়া চিরকাল ধরিয়া শিক্ষা দিতেছেন।"

বৃদ্ধ দীননাথ গৃহের মধ্যে রাজকন্যাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া এবং তৎপরে ঐ গোলমাল শুনিয়াই উদ্যান-কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাড়াতাড়ি গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। প্রবিষ্ট হইয়া যখন সমুদায় ঘটনা অবগত হইল তখন ভয় ও বিস্ময়ে তাহার কথা বাহির হইল না। কেবল "একি" বলিয়া চেতনাহীনের ন্যায় তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িল।

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ পরে উত্তর করিল, "মনোরমে তুমি জান চুরি করার কি শাস্তি, চুরি করিলে রাজাজ্ঞায় প্রাণদণ্ডের অনুমতি হইতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ রাজদণ্ডই ইহার প্রচুর শাস্তি নহে, অন্তর্যামী ভগবান সকল দেখিতেছেন, জানিতেছেন, তিনি পাপীর দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। তুমি প্রলুব্ধ হইবার সময় কি আমার উপদেশ বাক্য একবারও মনে কর নাই? যদি যথার্থই তুমি অঙ্গুরীয় অপহরণ করিয়া থাক ত অস্বীকার করিও না, যাঁহাদের দ্রব্য তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ কর, তোমার দোষ মোচনের এক্ষণে ইহাই একমাত্র উপায় ; দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিলে তোমায় রাজমহিষী ক্ষমা করিতে পারেন।"

মনোরমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "বাবা আমি তোমার কাছে শপথ করিয়া ও ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে আমি আংটী দেখি নাই। যদি আমি পথে যাইতে যাইতে কোন জিনিস কুড়াইয়া পাই, তাহা যাহার দ্রব্য তাহাকে যতক্ষণ না দি ততক্ষণ কোন মতে সুস্থির হইতে পারি না।"

পিতা বলিল "দেখ মনোরমে, রাজকুমারী তোমায় রাজদণ্ড হইতে মুক্ত করিবার জন্য আপনি আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছেন। ইনি তোমার মঙ্গলের জন্য এত ব্যস্ত, তোমায় এই কিছু অগ্রে কেমন চমৎকার উপহার দিয়াছেন। তোমার ইহাঁর নিকট মিথ্যা বলা কখনও উচিত নহে। তুমি তাঁহাকে প্রতারণা করিলে তোমার নিজের ঘোর অনিষ্ট হইবে। এখনও বলিতেছি নিজের অপরাধ স্বীকার কর, তাহা হইলে রাজকন্যা তোমার জন্য অনুরোধ করিয়া তোমার দণ্ডবিধান মার্জ্জনা করাইবেন। আমার কথা রাখ, সত্য বল।"

মনোরমা কহিল "বাবা তুমি বেশ জান যে আমি জন্মাবধি কখন কাহারও এক কপর্দ্দক অপহরণ করি নাই, কখনও কাহার গাছের একটা ফল বা এক আঁটা ঘাসও ছিঁড়িতে ভরসা করি নাই। একটা মহামূল্য অঙ্গুরীয়ের কথা আর কি বলিব। বাবা আমার কথায় বিশ্বাস কর, তুমি ত জান আমি কখনও তোমার কাছে মিথ্যা বলি নাই।"

দীননাথ কন্যার কথায় আশ্চর্য্য হইল বটে তথাপি বলিল "মা তোমার বৃদ্ধ পিতার মুখের

দিকে একবার চাহিয়া দেখ, আমার এই অন্তিম কালে আমায় এ দুঃখ দিও না। আমার এ দুঃখানল নিবাও, অন্তর্যামী বিধাতার নিকট অপরাধ স্বীকার কর, স্বর্গরাজ্যে অসরল মিথ্যাবাদী চোরের স্থান নাই, তিনি বর্ত্তমান, তিনি তোমার হৃদয় দেখিতেছেন, দোষ থাকে এখনও বল, আত্মাকে অধঃপাতিত করিও না।"

মনোরমা তখন করযোড়ে সকাতরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "অন্তর্যামী হরি! আমার অন্তর তুমি দেখিতেছ, আমি যে নির্দ্দোষী তাহা তুমি জান, কৃপা করিয়া আমায় এ বিপদ হইতে রক্ষা কর।"

দীননাথ তখন কন্যা যে যথার্থ নির্দ্দোষী তাহা বেশ বুঝিল, কহিল "মনোরমে আমি বেশ বুঝিলাম তুমি আংটী চুরি কর নাই; তাহা হইলে, ঈশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া রাজনন্দিনী ও তোমার বৃদ্ধ পিতার নিকট কখন এরূপ কথা বলিতে পারিতে না। আমার আর সন্দেহ নাই, এখন আমার মন স্থির হইল। মা স্থির হও, নির্দ্দোষীর ভয় নাই। পৃথিবীতে একটি জিনিসকে আমি বড় ভয় করি সেটা পাপ। কারাবাস বা মৃত্যু ইহার কাছে কিছুই নহে। যদি পাপী না হই আর জগতের সকলে আমাদের পরিত্যাগ করে বা আমাদের বিপক্ষ হয়, তাহাতেও ভয় নাই; অভয়-দাতা পরমেশ্বর আমাদিগকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। শীঘ্র বা বিলম্বে তোমার এই দোষ অলীক বলিয়া নিশ্চয়ই প্রকাশ করিয়া দিবেন।"

রাজকন্যা হেমলতা এতক্ষণ একমনে তাহাদের কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিলেন, বৃদ্ধের শেষ কথা শুনিয়া তিনি অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। দেখ মনোরমার পিতা, আমি আপনাদের এই সকল কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতেছি মনোরমা আংটী লয় নাই; কিন্তু ঘটনা চক্রটী ভাবিয়া দেখিলে মনোরমা ভিন্ন আর কাহার প্রতি সন্দেহ হইতে পারে না। মার বেশ মনে আছে, যে মনোরমা তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তিনি আংটী বিছানার উপর রাখিয়াছিলেন, আমি ও মা, বাহিরে পরামর্শ করিতে গেলে, মনোরমা ভিন্ন সেখানে আর কেহই ছিল না। আমি পর্য্যন্তও বিছানার কাছে যাই নাই। মনোরমা ও আমি, মার ঘর হইতে বাহির হইবার পর মা যেমন আংটী পরিতে যাইবেন, আর তাহা দেখিতে পাইলেন না। মা তন্ন তন্ন করিয়া সমুদয় ঘর দেখিলেন, খুঁজিবার সময় তিনি কাহাকেও গৃহে প্রবেশ করিতে দেন নাই। মা দুই তিনবার এইরূপে খুঁজিলেন, কিন্তু কিছুই হইল না। এই ঘটনায় আংটী কে নিয়াছে বোধ হয়?

মনোরমার পিতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "জানি না ঈশ্বর আমাদিগকে কেন এই পরীক্ষায় ফেলিলেন, তাঁহার মনে কি আছে কে বলিতে পারে?" এই বলিয়া বৃদ্ধ ঊর্দ্ধদৃষ্টে চাহিয়া সকাতরে বলিল "হরি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, তোমার দয়া থাকিলে কোন ভয় থাকে না।

হেমলতা বলিলেন "আমার জন্মতিথির উৎসব বেশ আনন্দে হইল, আর এখানে থাকিয়া কি হইবে, যাই। মা এখনও মনোরমার হিতার্থে কাহারও নিকট একটী কথাও বলেন নাই। কিন্তু আর কথা গোপন থাকে না, বাবাও অপরাহ্ণ সময়ে রাজধানী হইতে এখানে আসিবেন কথা আছে। ঐ আংটীটী তিনি আমার জন্মদিনে মাকে উপহার দিয়াছিলেন; মা আমার জন্ম

তিথির দিন আংটী পরিয়া থাকেন। আজ মার হাতে অঙ্গুরীয় না দেখিলে তখনি তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। মা মনে করিতেছেন যে, আমি মনোরমার নিকট হইতে অঙ্গুরীয় লইয়া যাইব। এই বলিয়া হেমলতা চুপ করিল। গৃহ কয়েক দণ্ডের জন্য একেবারে নিস্তব্ধ রহিল। কিছু ক্ষণ পরে হেমলতা বলিলেন, তবে এক্ষণে বিদায়, আমি যথাসাধ্য মনোরমার দোষ কাটাইব কিন্তু সকলে বিশ্বাস করিবে কি না সন্দেহ। এই বলিয়া রাজকন্যা চলিয়া গেলেন, দুঃখে ও মনোকষ্টে পিতা ও কন্যা কেহই তাহার সমাদর করিতে পারিল না।

দীননাথ অধঃদৃষ্টিতে গৃহের মধ্যে বসিয়া রহিল, কষ্টে তাহার গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল, মনোরমা পিতার চরণতলে বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "বাবা, আমি তোমার পা ছুইয়া বলিতেছি আমি ইহার কিছুই জানি না।" পিতা তাহার চিবুক ধরিয়া কহিল মা তুমি নির্দ্দোষী, অসরল পাপীরা কখন এমন সরল ও পরিষ্কার কথা কহিতে পারে না।

মনোরমা বলিল "বাবা এখন উপায় কি? না জানি আমাদের কি দশাই ঘটে। যদি কেবল আমাকেই দণ্ড ভোগ করিতে হয় তাহাতে আমার দুঃখ নাই, কিন্তু আমার জন্য যদি তোমায় কোন ক্লেশ পাইতে হয় তাহা হইলে আমার সহ্য হইবে না, তুমি ভাল থাকিলে বাবা আমার আর শত ক্লেশও ক্লেশ বোধ হইবে না।

দীননাথ কহিল "মা হরির চরণে পড়িয়া থাক, আকুলিত হইও না, তাঁহার ইচ্ছা বিনা কেহ আমাদের একগাছি চুলও নষ্ট করিতে পারিবে না। যাহাই কিছু সকলই তাঁহার আজ্ঞাক্রমে ঘটিতেছে। এই ঘটনাও তাঁহার অভিপ্রেত—যখন তাঁহার অভিপ্রেত তখন ইহা উপযুক্ত ও শুভ ফলপ্রদ; ইচ্ছাতিরিক্ত ফল কি কখন এ জগতে সম্ভবে? অতএব, ভয় করিও না এবং কখনও সত্যকে পরিত্যাগ করিও না। রাজকর্ম্মচারীরা তোমায় যতই কেন ভয় প্রদর্শন করুক না, তাহারা তোমায় যতই কেন প্রলুব্ধ করুক না, তুমি সত্য হইতে কখনই একচুল বিচলিত হইও না, এবং তোমার বিবেকের আদেশ অগ্রাহ্য করিও না। তোমার বিবেক সাধু হইলে কারাগারে ক্লেশ থাকিবে না। আমাদিগকে সম্ভবত পৃথক হইতে হইবে সুতরাং আমি আর তোমায় সান্তনা করিতে পারিব না; মা! এখন তুমি আমায় ছাড়িয়া জগতের যিনি পিতা সেই পরমপিতার শরণাপন্ন হও তিনি মনে সান্তনা দিবেন। কেহই তোমায় তাঁহার নিকট হইতে পৃথক করিতে সক্ষম হইবে না।"

একি! দেখিতে দেখিতে গৃহের দ্বারে চারিজন রাজপুরুষ দেখা দিল। তাহাদের উগ্রমূর্ত্তী দেখিয়া মনোরমা ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া পিতার চরণ জড়াইয়া ধরিল। "ইহাদিগকে বিযুক্ত কর" এই মেয়েটাকে শিকলে বাঁধিয়া কারাগারে নিক্ষেপ কর—বৃদ্ধকে হাজত ঘরে লইয়া যাও" এই বলিয়া প্রধান রাজকর্ম্মচারী অপর রাজপুরুষদিগকে আজ্ঞা দিল, ও দীননাথের বাড়ীর চারিদিকে পাহারা নিযুক্ত করিল, কাহাকেও তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে দিল না এবং তন্ন তন্ন করিয়া সমুদায় গৃহ অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

হায়! কঠিন হৃদয় রাজপুরুষগণ সবলে পিতার নিকট হইতে মনোরমাকে ছাড়াইয়া লইয়া তাহার হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল, তখন তাহাকে

দেখিলে পাষাণও গলিয়া যায়। মনোরমা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, কিন্তু নির্দ্দয় রাজকর্ম্মচারীরা তাহাকে সেই অবস্থাতেই লইয়া গেল। মনোরমা ও তাহার পিতাকে বন্ধন করিয়া পথ দিয়া লইয়া যাইবার সময় দলে দলে লোক আসিয়া পথের দুই পার্শ্ব ছাইয়া ফেলিল। আংটী চুরির গল্প দাবাগ্নির ন্যায় তখনই গ্রামের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। নানা লোকে নানা কথা কহিল। নিরীহ দীননাথ ও মনোরমার দুঃখে অনেক ঈর্ষাপরবশ ব্যক্তি সুখ বোধ করিল এবং তাহারা নানা বিদ্রূপ বাক্যও প্রয়োগ করিতে লাগিল। দীননাথ ও তাহার কন্যা নিজ নিজ শ্রমবলে সুখে বাস করিত তাহা দেখিয়া যে অলস ও কুমনা লোকের ঈর্ষা হইবে তার আর বিচিত্র কি? তাহাদের একজন বলিল "এখন বুঝা যাইতেছে দীননাথ কোথা হইতে এত ধন পাইয়াছে? এই জন্য ইহারা অন্য গ্রামবাসীদের অপেক্ষা বড়মানুষী করিয়া কাটাইত।" হায়! কি ভ্রম, পরিষ্কার থাকিলেই আমাদের দেশের লোক বড়মানুষী দেখে!

কিন্তু প্রসাদপুরস্থ অনেকেই তাহাদের দুঃখে যথার্থ দুঃখিত হইল এবং তাহাদের এই দশা দেখিয়া নয়ন-জল সম্বরণ করিতে পারিল না, তাহারা ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, "হায়, আমাদের কি মন্দ কপাল, আমাদের একজন সৎ প্রতিবাসীর অদৃষ্টে শেষে এই ঘটিল। কেহই স্বপ্নে ইহার এই দশা ভাবে নাই। বোধ হয়, ইহারা নির্দ্দোষী। ঈশ্বর ইহাদিগকে রক্ষা করুন।"

তৃতীয় অধ্যায়

সমাপ্ত

ঢাকাই মসলিন্।

ঢাকার মসলিন্ বস্ত্র ভারতবাসীর অতিশয় গৌরবের সামগ্রী। ফরাসী ও ইংরেজগণ তাঁহাদের কলে অনেকরকম সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন বটে কিন্তু ঢাকার প্রাচীন অধিবাসী বসাকবংশীয়দিগের হস্ত নির্ম্মিত মাকড়সার জালের মত পাতলা মসলিনের নিকট সে সকল বস্ত্র আজিও সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। শাদা, ডুরে এবং জামদানী বা ফুলদার অনেক প্রকার কাপড় বহুশতাব্দী হইতে ঢাকা নগরীতে প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে কিন্তু এই সকল শ্রেণীর বস্ত্রের মধ্যে একমাত্র সূক্ষ্ম শাদা মসলিনের জন্যই ঢাকার নাম পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে প্রচারিত হইয়াছে। সুসভ্য রাজ্য মাত্রেই এ বস্ত্র আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত যেখানে যত প্রকাশ্য মেলা খুলা হইয়াছে সে সকল স্থানেই ইহা সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছে।

ভারতে মুসলমানদিগের রাজত্ব কালেই ঢাকার মসলিন্ বস্ত্র ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। মুসলমানগণ অত্যন্ত ভোগবিলাসী জাতি। পূর্ব্বকালের মুসলমান নবাব ও বাদশাহগণের পোষাক তৈয়ারির জন্য অথবা দিল্লীর রাজসভা সাজাইবার জন্য ঢাকাই মসলিন্ বড়ই আদরের বস্তু ছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে তাঁহার পত্নী নুরজাহানের যত্নে এই ব্যবসায়ের এতদূর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তখনকার তিন গজ লম্বা ও এক গজ চওড়া এক খণ্ড খুব পাতলা মসলিন্ বা মল্‌মল্‌খাস ৪০০৲ টাকার কমে প্রস্তুত হইত না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের

এক গজ সর্ব্বাপেক্ষা ভাল মল্‌মলের দাম কত? সচরাচর ১৫৲ হইতে ২০৲ টাকা। কি আশ্চর্য্য অবনতি!! পূর্ব্বে ঢাকার বসাক বংশীয়গণের পূর্ব্ব পুরুষেরা অনেকেই এই সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিতেন কিন্তু এখন দেশীয় বস্ত্র ব্যবসায়ের দিন দিন অবনতিতে তাঁহাদের বংশধরেরা নিরাশ হৃদয়ে সে ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন শুনা যায় সমস্ত ঢাকার মধ্যে নবাবপুরে হরিমোহন বসাক নামে এক জন মাত্র শিল্পী আছেন যিনি সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নে সক্ষম।

পুরাকালের ঢাকাই মসলিনের সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে দুই একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প প্রচলিত আছে। শুনা যায় সে কালের একটী ভাল থান লম্বাদিকে অনায়াসে একটী আংটীর মধ্যে গলিয়া যাইত। ১৬৬৬ খৃঃঅব্দে ট্র্যাভারনিয়র নামক কোন এক ভ্রমণকারী বলিয়া গিয়াছেন যে, একদা পারস্য রাজের দূত ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় উটপক্ষীর ডিম্বাকৃতি একটী মুক্তাখচিত নারিকেল খোলের ভিতর ৩০ গজ লম্বা একটী পাগড়ীর থান পূরিয়া পারস্যরাজকে উপঢৌকন দিবার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন।

মুসলমানদিগের রাজত্বকালে যে ঢাকাই মসলিনের অধিক উন্নতি হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে বস্ত্রের প্রচলিত নাম গুলিই বিশেষ প্রমাণ। "সওগাতি" অর্থাৎ সওগাৎ দিবার উপযুক্ত, "শরবতী" (বোধ হয় শরবৎ শব্দ হইতে উৎপন্ন), "মল্‌মল্‌খাস" অর্থাৎ খাস মল্‌মল্ বা রাজার ব্যবহারের উপযুক্ত মল্‌মল্, "আব-রোআন" অর্থাৎ প্রবাহিত জল, "সব-নম" বা সান্ধ্য-শিশির এবং "বাফ্‌ৎ-হাওয়া" বা হাওয়া কাপড় ইত্যাদি যতগুলি কবিত্ব পূর্ণ প্রাচীন নাম শুনা যায় এ সকল গুলিই মুসলমানগণের প্রদত্ত বলিয়া বোধ হয়। এই বস্ত্রের গুণ এই যে, নদীবক্ষে বা শিশির-সিক্ত স্থানে ইহা বিছাইয়া দিলে ঐ জল ও শিশিরের সহিত ইহা এমনি মিশাইয়া যায় যে হঠাৎ আর উহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না অথবা গায়ে এক খানি কাপড় থাকিলে তাহার মধ্য দিয়া বেশ বাতাস প্রবেশ করিতে পারে। এইরূপ সূক্ষ্মতা হেতুই বোধ হয় নামদাতাগণ এই বস্ত্রকে কখন জল, কখন শিশির এবং কখনও বা বায়ুর সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন।

মুসলমানদিগের রাজ্য নাশের সঙ্গে সঙ্গে এবং ইংরেজদিগের রাজ্য গ্রহণের কয়েক বৎসর পর, হইতেই ভারতের এই সুন্দর বস্ত্র ব্যবসায় দিন দিন অবনত হইয়া আসিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে এ দেশের শাসনভার ন্যস্ত ছিল তখন তাঁহাদের অধীনে বঙ্গদেশের যে যে স্থানে ভাল কাপড় তৈয়ার হইয়া থাকে সেই সেই স্থানে দুই একটী করিয়া কুঠী ছিল। ঐ সকল কুঠীতে দেশীয় শিল্পীগণ কর্ম্ম করিয়া নানা প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁহাদের কারখানা সমূহে প্রস্তুত সমস্ত কাপড় এবং দেশের অন্যান্য কারিকরদিগের হস্ত নির্ম্মিত বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া ব্যবসা করিতেন এবং বিস্তর কাপড় জাহাজে করিয়া আপনাদের দেশে লইয়া গিয়া তদ্দ্বারা অনেক ধন সঞ্চয় করিতেন। এই সময়ে এখানকার বস্ত্র এতদূর প্রচলিত ছিল যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও আর আর সওদাগরগণ তখন বৎসরে প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকার শুদ্ধ ঢাকাই বস্ত্র (মসলিন্, জামদানী প্রভৃতি) ক্রয় করিতেন। যাহা হউক এ সুখের অবস্থা বড় অধিক দিন ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই অবস্থা অনেক অবনত হইয়া পড়ে। ১৮০৭ সালে ১১ লক্ষ ৫৬ হাজার ১শত টাকার

কাপড় বিক্রয় হয় মাত্র। এখন সেই অবস্থা দিন দিন আরও এত অবনত হইয়াছে যে, আজ কাল বৎসরে আন্দাজ ৩ লক্ষ টাকার অধিক কাপড় কাটে না।

এখন আমাদের দেশে বিলাতী কলের কাপড় এতই প্রচলিত হইয়াছে যে, দেশীয় বস্ত্র আর কেহ কিনিতে চায় না। আবার দেখ ভাল রকম দেশীয় বস্ত্র যাহা কিছু এখন তৈয়ার হয় সে সমুদয়ই প্রায় বিলাতী সূতায় তৈয়ার হইয়া থাকে। ইহা দেখিয়া এ কালের অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে, আমাদের দেশের লোকেরা হয়ত কখন সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করে নাই। ইহা ভুল কথা। হইতে পারে আমাদের ন্যায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের হাড়ে হাড়ে যখন বিলাতী সভ্যতা প্রবেশ করে নাই—যখন এদেশের লোক মাত্রেই শুদ্ধ ধূতি চাদর পরিয়া বাবু সাজিত—চোগা, চাপকান, পিরান, কোট, পেণ্টুলন প্রভৃতি যখন এদেশে প্রচলিত ছিল না—তখনকার চলনসই দেশী বস্ত্রের জন্য যে সকল দেশী সূতা ব্যবহার করা হইত তাহা আজ কালের বিলাতী সূতার ন্যায় সূক্ষ্ম হইত না। ইহা সত্য কথা। কিন্তু ইহা আবার আরও সত্য কথা যে, এ দেশে ঢাকাই মসলিনের ন্যায় বহুমূল্য বস্ত্রের জন্য যে দেশী সূতা বহুকাল হইতে আজ পর্য্যন্তও তৈয়ার হইতেছে তাহা আবার জগতের অপর কোন জাতি প্রস্তুত করিতে পারে না। ঢাকার আশেপাশে তন্তুবায়-শ্রেণীর অশিক্ষিতা রমণীগণ আস্‌না তুলা হইতে দেশীয় পদ্ধতি অনুসারে যে সূক্ষ্মতম সূতা প্রস্তুত করিয়া থাকেন তাহার নিকট ইংরেজের কলে প্রস্তুত খুব ভাল সূতাও দাঁড়াইতে পারে না। ইহা হইতে আমাদের আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে? ইংরেজেরা ইহা শিক্ষা করিবার জন্য কত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, কত বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, বড় বড় মেলার সময় এদেশের সূতা লইয়া গিয়া ইউরোপীয় নানা প্রকার সূক্ষ্ম সূতার সহিত তুলনা করিয়া কাহার কিরূপ পাক, কোন্ সূতা কত সরু ইত্যাদি সমস্ত বিষয় অনুবীক্ষণ লইয়া ভাল করিয়া শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু হায়! তাঁহাদের সে সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছে। তুলা হইতে সূতা ও সূতা হইতে কাপড় প্রস্তুত করিতে সর্ব্বশুদ্ধ ১২৬ রকম ছোট বড় দেশীয় যন্ত্র আবশ্যক। এই সকল যন্ত্র দড়ি, বাঁশ, বাখারি, বেত, লোহা ও শরকাটি প্রভৃতি যৎসামান্য সামগ্রীতেই তৈয়ারি হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহারা সামান্য হইলেও আজি পর্য্যন্ত ইংরেজদিগের কলের তাঁত এ দেশের তাঁতকে হারাইতে পারে নাই।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, আগেকার ন্যায় আজ কালের ঢাকাই মসলিন্ বেশী দামী হয় না। কিন্তু এখনও যাহা আছে তাহারই বা তুলনা কোথায়? এখনকার এক তোলা আসনা তুলার সূতার মূল্য সূক্ষ্মতা ভেদে ৭৲ হইতে ১৮৲ টাকা। মসলিনের জন্য এক রতি ওজনের সূতা সচরাচর ১৪০ হইতে ১৭৫ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। আবশ্যক হইলে ইহাপেক্ষাও সরু করা যাইতে পারে। আধসের তুলা হইতে ১২৫ ক্রোশের ও অধিক লম্বা সূতা বাহির করা হইয়াছে! রমণীগণের কোমল হস্তে কেমন করিয়া সূতা তৈয়ার হয় তাহা নিম্নে বলা যাইতেছেঃ—

প্রথমতঃ খানিকটা তুলা লইয়া তাহাতে পাতার কুচি বা মাটি প্রভৃতি যাহা কিছু জড়িত থাকে তাহা খুব যত্ন করিয়া বাছিতে হয়। তারপর বোয়াল মাছের চোয়ালের দন্তপাটি দ্বারা তুলাটুকু

ঢাকাই মসলিন্ প্রস্তুত করিবার যন্ত্র সমূহের নাম ও তাহাদের চিত্র।

১ম—সূতা গাঁথা।

২য়—কেটি বাঁধা।

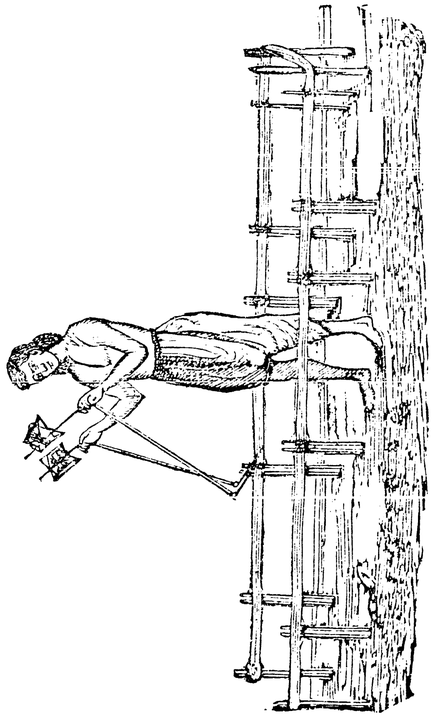

৩য়—টানা তৈয়ারি।

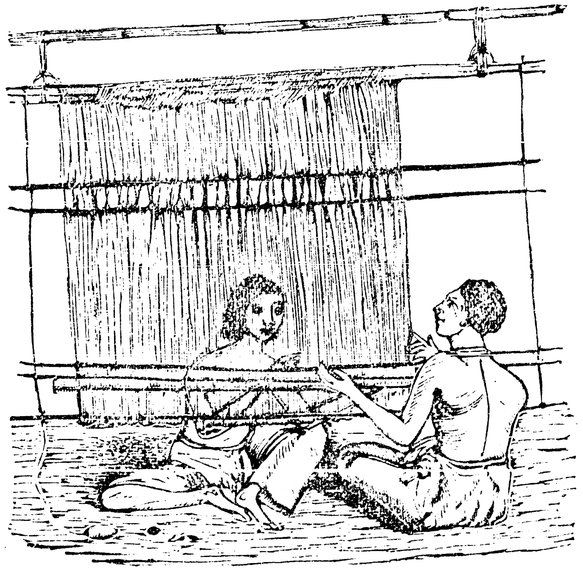

৪র্থ—সানা বিন্ধন।

আস্তে আস্তে আঁচড়াণ হয়। বোয়াল মাছের দাঁতগুলি ছোট, ঘন ঘন ও একটু বাঁকা। ইহাতে বেশ চিরুণীর মত কাজ করে। তুলা আঁচড়াণ হইলে একখানি পাতলা চাল্‌তা কাঠের তক্তার উপর বিছাইয়া তাহার উপর দিকে একটী সরু লোহার শলা এরূপ ভাবে একবার এদিক এক-বার ওদিক করিয়া চালান হয় যে, বিচি না ভাঙ্গিয়া কেবল তাহা হইতে তুলা আলাদা হইয়া পড়ে। এই তুলাকে ছোট ধনু যন্ত্রে ধুনিতে হয়। এই ধনুর জন্য তাঁত, মুগা রেশম, কলার সূতা অথবা বেতের সূতা ব্যবহার করা হইয়া থাকে। তুলা ধুনা হইলে একটি মোটা রকম কাঠের দণ্ডে উহা আল্‌গা করিয়া জড়াইয়া অবশেষে দণ্ডটী মধ্য হইতে টানিয়া বাহির করিয়া তুলাপিণ্ডকে দুই খানা তক্তার মধ্যে ফেলিয়া চাপিতে হয়। তার-পর এই তুলাকে আবার পেন কলমের মত ছোট ছোট গালামাখান শর কাটিতে জড়াইতে হয় ও সর্ব্বশেষে ঐ কাটিগুলিকে কুঁচিয়া মাছের কোমল ও মসৃণ ছালে ঢাকিয়া রাখা হয়। এক একটী গালার কাটি জড়ান তুলাকে "পুনী" বলে। ইহাদিগকে ঢাকিয়া রাখিলে সূতা কাটিবার সময় কোন রকম ময়লা ধরে না।

তুলা হইতে কেমন করিয়া সূতা কাটিতে হয় তাহা প্রথম চিত্রে দেখান গেল। ৩০ বৎসরের অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোকগণই সূক্ষ্ম সূতা কাটিয়া থাকেন। শুষ্ক বায়ু ও উত্তাপের সময় তুলার আঁইশ টানিতে গেলে ছিঁড়িয়া যায়, এজন্য শীতকালে সকালে সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে বেলা ১০টা এবং অপরাহ্ণে ৩।৪টা হইতে সূর্য্যাস্তের আধ ঘণ্টা পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভাল সূতা কাটিবার উপযুক্ত সময়। কিন্তু অধিক দামী সূতা সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে ঘাসের উপর শিশির থাকিতে থাকিতে প্রস্তুত করা হয়। কখন কখন বায়ুর শুষ্কতা নিবারণের একটী সহজ উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে। একটা প্রশস্ত জলপাত্র নিম্নদেশে রাখিয়া তাহার উপর সূতা কাটা হয়। তাহা হইলে জল হইতে যে বাষ্প উঠে তাহা দ্বারা তুলাকে কতকটা নরম রাখে। সূতা কাটিবার জন্য এই কয়েকটী দ্রব্যের আবশ্যক। ১ম "পুনী", ইহার কথা উপরে বলা গিয়াছে। (২য়) মোটা সূঁচের মত একটী ১০ হইতে ১৪ ইঞ্চি লম্বা লোহার "টেকো"। ইহার নিচের দিকে একটু উপরে একটী মাটির ছোট গোলাকার বর্ত্তুল বা চক্র থাকে। এরূপ ভারি জিনিস তলায় না থাকিলে টেকোটী কখনই একবার মাত্র হাতে করিয়া ঘূরাইয়া দিলে কিয়ৎকাল উহা আপনি আপনি ঘূরিত না। (৩য়) একখণ্ড শাঁক। ইহার উপরদিকটী মাটির দ্বারা ঢাকা। টেকো ঘূরাইবার সময় এই শাঁকের উপর তাহার নিম্ন ভাগটী রাখা হয়। (৪র্থ) ছোট একটা পাথর বাটি। এই বাটিতে খড়ির গুড়া থাকে। হাত যাহাতে তেলা না হয় তজ্জন্য বারবার এই খড়ির গুড়া হাতে লাগান হয়।

দ্বিতীয় চিত্রে নাটাইয়ে করিয়া সূতার ফেটি বান্ধা, তৃতীয় চিত্রে কাপড়ের টানার জন্য সূতা তৈয়ারি করা ও চতুর্থ চিত্রে সানার ভিতর সূতা পরান প্রভৃতি দেখান গেল। এ সকলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও আর কয়েকটী চিত্র আমরা পরে দিব।

স্থানাভাব বশতঃ এবারে গত বারের ধাঁধার উত্তর এবং নূতন ধাঁধা প্রকাশিত হইল না।

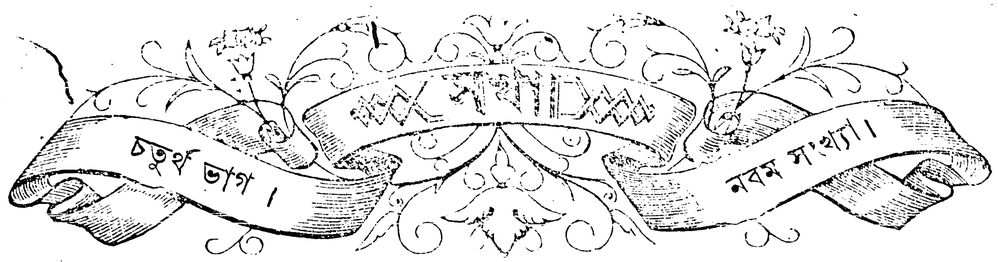

সখা
চতুর্থ ভাগ। নবম সংখ্যা।
সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬।

স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

সখার পাঠক পাঠিকা! আজ আবার আমাদের দেশের একটী বড় লোকের মৃত্যু সংবাদ লইয়া তোমাদের নিকট উপস্থিত হইতেছি। যে সকল লোক জন্ম গ্রহণ করিয়া আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া-ছিলেন ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। দুঃখের বিষয় ইহাঁর একখানি ছবি তোমাদিগকে উপহার দিতে পারিলাম না। ইহাঁকে মধ্যে মধ্যে ফটোগ্রাফ অর্থাৎ ছবি-মুদ্রাকরদিগের বাড়ীতে গিয়া ছবি তুলিতে অনুরোধ করা হইয়াছে, কিন্তু ইনি নিজের নাম বা কীর্ত্তি রাখা বিষয়ে এত উদাসীন ছিলেন যে, সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইতেন না। তাঁহার চিরজীবনে এই ভাব ছিল, তিনি যাহা কিছু ভাল কাজ করিয়াছেন তাহা গোপনেই করিয়াছেন।

ইহাঁর নাম পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। তোমরা "সোমপ্রকাশ" নামক খবরের কাগজের বিষয় শুনিয়া থাকিবে অথবা তাহা দেখিয়া থাকিবে, ইনি তাহার সম্পাদক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাঁর জীবনচরিত বিষয়ে কতকগুলি কথা তোমা-দিগকে বলিব। প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার ৫ ক্রোশ দক্ষিণ চাঙ্গাড়িপোতা নামক গ্রামে ইহাঁর জন্ম হয়। বঙ্গ দেশের ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ইনি দাক্ষিণাত্য বৈদিক কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। ইহাঁর পিতার নাম হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। তিনি কলিকাতার পুরাতন বাঙ্গালা পাঠশালায় শিক্ষকতা করিতেন, তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৃত্তি দ্বারাও অনেক উপার্জ্জন হইত। ইহাঁর পিতা একজন অতিশয় সাধু প্রকৃতি সম্পন্ন লোক ছিলেন। যতকাল জীবিত ছিলেন নিজ বাসাতে স্বগ্রামের ও জ্ঞাতি কুটুম্বের অনেকগুলি ছেলে রাখিয়া মানুষ করিতেন। তাঁহারই অনুগ্রহে অনেকে এখন কৃতী হইয়া সংসারে করিয়া খাই-তেছেন। তিনি সদ্বিবেচক ধীর ও সংসার পালনে পরিপক্ক লোক ছিলেন; তাঁহার জীব-দ্দশায় তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ ও তাঁহার প্রতি-বাসিগণ অনেক শত্রুতা সাধন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন কিন্তু তিনি পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা গুণে সে সমুদায় কাটিয়া উঠিয়াছিলেন। এমন কি তিনি দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের মধ্যে একজন সম্পন্ন গৃহস্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া-ছিলেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার পিতার ধীরতা, অধ্য-বসায়, শ্রমশীলতা, ও মিতব্যয়িতা প্রচুর পরি-

মাণে লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বাল্যকালে কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে বিদ্যাভ্যাস করেন। তাহা পঞ্চাশ ষাট বৎসরের কথা হইবে। সে সময়ে এই কলিকাতা সহরে যে সকল বালক বাস করিত তাহাদের পক্ষে অনেক বিপদ ছিল, ঈশ্বরকৃপায় সে সকল বিপদ এখন নাই। তখনকার নীতির বাতাস দূষিত ছিল, অনেক পাপকে যুবকগণ পাপ বলিয়া মনে করিত না। লোকের রুচি অত্যন্ত নিকৃষ্ট ছিল, সাহিত্যের অবস্থা অতিশয় হীন ছিল; বর্ত্তমান সময়ে তোমরা কত ভাল ভাল গ্রন্থ পড়িতে পাইতেছ ইহার কিছুই তখন ছিল না। সুতরাং সে সময়ে যাহারা ভাল থাকিয়াছেন, আপনাদের চরিত্র সৎ রাখিয়া নিজের উন্নতি করিয়াছেন তাঁহারা বিশেষ প্রশংসার পাত্র। বিদ্যাভূষণ মহাশয় সেইরূপ লোক ছিলেন। তিনি বালক কাল হইতে অনেক প্রকার পাপের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন কিন্তু কোন পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমে কিছুদিন তখনকার ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে শিক্ষকতা কার্য্য করেন তৎপরে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের সহকারী পদে নিযুক্ত হন। তৎপরে ঐ কালেজের সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে বহুকাল নিযুক্ত ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার নিকট শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে তাঁহার ন্যায় কর্ত্তব্য-পরায়ণ শিক্ষক অতি অল্পই ছিল। জল হউক, ঝড় হউক, বিদ্যাভূষণ মহাশয় যথা সময়ে স্বস্থানে উপস্থিত আছেন। শ্রমশীলতা ও সুনিয়মের গুণে দীর্ঘকাল তাঁহার স্বাস্থ্য এমন সুন্দর ছিল যে তাঁহাকে ২৫ বৎসরের মধ্যে ২৫ দিন বিদ্যালয় হইতে ছুটী লইতে হইয়াছিল কি না সন্দেহ।

তাঁহার জ্ঞানানুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রেই পারদর্শী হইয়াছিলেন। সে সময়ে সংস্কৃত কালেজে ইংরাজি শিক্ষা দিবার নিয়ম ছিল না। তদনুসারে তিনি বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিখেন নাই কিন্তু তিনি অতিশয় পরিশ্রমের সহিত বাড়ীতে ইংরাজী পড়িয়া ইংরাজী উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন। ইংরাজী বলা বা লেখা অভ্যাস ছিল না কিন্তু ঐ ভাষায় ভাল ভাল অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত জ্ঞান চর্চ্চাতে নিযুক্ত ছিলেন।

গাম্ভীর্য্য তাঁহার মনের স্বাভাবিক ভাব ছিল। বালক কাল হইতেই তিনি বৃথা আমোদ প্রমোদে সময় যাপন করিতেন না। গ্রন্থের মধ্যে ইতিহাস, জীবনচরিত, মনোবিজ্ঞান ও ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রভৃতি গাম্ভীর্য্য রস পূর্ণ গ্রন্থই পড়িতে ভাল বাসিতেন। হাল্কা বিষয় পড়িতে তৃপ্তি পাইতেন না। তাঁহার প্রকৃতি এমনি গম্ভীর ছিল যে বাড়ীর লোক পর্য্যন্ত সহসা তাঁহার সমীপে যাইতে সাহসী হইত না। তাঁহার প্রকৃতি রূঢ় বা কর্কশ ছিল না, এমন কি তাহার বয়ঃ-প্রাপ্ত পুত্রদিগকে কখনও তুই বলিয়া সম্বোধন করিতে শুনা যায় নাই, অথচ, কেহ সহসা তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইত না। তিনি যখন নির্জ্জনে চিন্তা করিতেন তখন তাঁহার মাতাও হঠাৎ গিয়া কোন কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইতেন। বড় লোকের মা বড় হইয়া থাকেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মাতা অতিশয় উদার-হৃদয়া রমণী ছিলেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের চরিত্রের আর একটী গুণ ছিল, ন্যায়পরতা। নিজে যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া দিতেন এবং অপরেও তাহাদের স্বীয় স্বীয় দেয় কড়ায় গণ্ডায় দেন এই ইচ্ছা করিতেন এবং সে বিষয়ে ত্রুটী

দেখিলে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। যে সকল কর্ম্মচারী স্বীয় কর্ম্মে মনোযোগী তিনি তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইতেন, এবং যথা সাধ্য তাহাদের উন্নতি করিতেন, কিন্তু যাহারা কর্ত্তব্য পালনে উদাসীন তাহারা অতি নিকট আত্মীয় হইলেও তাহাদিগকে ক্ষমা করিতেন না ও তাহাদিগকে দেখিতে পারিতেন না। কেহ অপরের প্রতি অন্যায় করিতেছে দেখিলে তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। অনেক সময় দুর্ব্বলের পক্ষ হইয়া অন্যায়কারীর দমন করিবার চেষ্টা করিতেন। একবার তাঁহার প্রতিবেশিনী একজন অনাথা বিধবা স্ত্রীলোকের কিছু জমি কাড়িয়া লইবার জন্য একবর ধনীলোক প্রয়াস পায়। স্ত্রীলোকটীর সহিত বিবাদ হওয়াতে তাহারা কয়েকজনে একদিন তাহাকে প্রহার ও অপমান করিবার জন্য তাহার ঘরে প্রবেশ করে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের আচরণের বিষয় শুনিয়া বিরক্ত হইয়াছিলেন। একদিন তিনি নিজের ঘরে বসিয়া লিখিতেছেন এমন সময়ে ঐ বিধবার পুত্রটী ছুটিয়া আসিয়া বলিল "বড় বাবু আমার মাকে কয়জনে ঘরে ঢুকিয়া মারিতেছে।" বিদ্যাভূষণ মহাশয় শুনিবামাত্র নিজ কনিষ্ঠকে ডাকিয়া লইয়া ঐ বিধবার গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং সেখানে পৌঁছিয়া নিজ সহোদরকে ঐ দুর্বৃত্তদিগকে সমুচিত প্রহার করিতে অনুমতি দিলেন। তৎপরে বোধহয় রাজদ্বারেও তাহাদিগকে দণ্ডিত করিয়াছিলেন।

এইরূপ অন্যায়-কারীর প্রতি বিরাগ থাকাতে অনেক লোকের সঙ্গে তাঁহার শত্রুতা হইত। কিন্তু তিনি যাহাদিগকে শাস্তি দিতেন তাহারাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার ন্যায়পরায়ণতার আর একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইয়াছিলেন। ধনীদিগের নিকট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যে বৃত্তি পান, তাহা লওয়া তাঁহার পক্ষে অন্যায় বলিয়া মনে করিতেন। এই জন্য সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপকদিগের নামে যে সকল বৃত্তি আসিত তাহাতে তাঁহার যে অংশ থাকিত তাহা তিনি লইতেন না। এরূপ শুনিয়াছি একবার বর্দ্ধমানের রাজবাড়ী হইতে কিম্বা অন্য কোন মহাবিভবশালী ব্যক্তির বাড়ী হইতে অনেকগুলি মূল্যবান দ্রব্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বৃত্তিরূপে তাঁহার নামে প্রেরিত হইয়াছিল। তাঁহার পরিবারস্থ সকলে সেই সমুদায় মূল্যবান বস্তু রাখিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, তিনি কোন মতেই রাখিতে দিলেন না, সেই সমুদায় দ্রব্য ফিরাইয়া দেওয়া হইল। মহারাণী স্বর্ণময়ীর ভূতপূর্ব্ব কার্য্যাধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ রাজীবলোচন রায় মহাশয়ের তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি অনেকবার অনেক প্রকারে বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বৃত্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিছুতেই তিনি সম্মত হইলেন না। কেবলমাত্র সোমপ্রকাশের উন্নতির নিমিত্ত কয়েক সহস্র মুদ্রা লইয়াছিলেন। অন্যায় কার্য্যকে তিনি বিষের ন্যায় দেখিতেন।

তাঁহার আর একটী গুণ ছিল শ্রমশীলতা। রাত্রি ১১ টা ১২ টা বাজিয়া গিয়াছে, পরিবার পরিজন সকলেই নিদ্রিত তখনও বিদ্যাভূষণ মহাশয় অধ্যয়ন করিতেছেন। আবার প্রাতে রাত্রি ৪টা হইতেই তাহার ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে, তিনি উঠিয়া লিখিতেছেন। তিনি যতদিন সুস্থ ও সবল ছিলেন, ৪ চারি ঘণ্টার অধিক কাল কখনই নিদ্রা যান নাই। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া পরিবারস্থ সকলকেই জাগাইতেন;

প্রথমে পুত্র কন্যাদিগকে তুলিতেন তৎপরে ভ্রাতা ও ভগিনীদিগকে প্রত্যেকের নাম ধরিয়া ধরিয়া ডাকিয়া জাগাইতেন। সকলকে না তুলিয়া নীচে নামিয়া আসিতেন না। আলস্য তিনি দেখিতে পারিতেন না—অলস ও অকর্ম্মণ্য লোককে যেরূপ ঘৃণা করিতেন, চোর ডাকাতকে তত ঘৃণা করিতেন না। সর্ব্বদাই বলিতেন—"উদ্যোগিনং পুরুষ কি মুপৈতি লক্ষ্মীঃ।" উদ্যোগশীল পুরুষকেই লক্ষ্মী আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। যাহার উদ্যোগ নাই, কর্ম্মশীলতা নাই, সে সংসারে লক্ষ্মীছাড়া হয়।

চতুর্থ সদ্গুণ ছিল স্বাধীন-চিত্ততা। তাঁহার কাপুরুষতা ছিল না। নিজের শ্রম ও চেষ্টাতেই উন্নতি করিব এই প্রতিজ্ঞা তাঁহার অন্তরে অত্যন্ত প্রবল ছিল। জীবনে কখনও কাহারও তোষামোদ করেন নাই। বড় বড় ধনীর শত্রুতা দেখিয়া একদিনের জন্য ভীত হন নাই; সহস্র প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কর্ত্তব্য পালনে একদিন পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার স্বাধীন-চিত্ততার একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। স্বীয় গ্রামে একটী ভাল ইংরাজী স্কুল থাকে, এই ইচ্ছাতে তিনি প্রথমে একজন ধনীর সহিত মিলিত হইয়া উক্ত ধনীর তত্ত্বাবধানস্থিত একটী স্কুলের উন্নতিসাধনে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে দেখিলেন যে সেখানে স্বাধীন ভাবে স্কুলের উন্নতি করা দুষ্কর; সে স্কুলটী ভাল হইবার নহে। তখন নিজে একটী উৎকৃষ্টদরের ইংরাজী-সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। ইহাতে গ্রামের ধনীদিগের অনেকে তাঁহার প্রতিপক্ষ হইলেন, কিন্তু তিনি সে দিকে দৃক্পাত না করিয়া নিজ ব্যয়ে ও ব্যবস্থার গুণে উক্ত স্কুলটীকে একটী প্রথম শ্রেণীর স্কুল করিয়া তুলিলেন। সে জন্য মাসে মাসে অনেকগুলি অর্থ দিতে হইত। ঐ স্কুলটীর দ্বারায় তাঁহার গ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলের যে কত উপকার হইয়াছে তাহার বর্ণনা হয় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিদ্যাভূষণ মহাশয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য বৈদিকের কুলীনদিগের মধ্যে এই প্রথা আছে যে কোন গৃহস্থের গৃহে কন্যা সন্তান জন্মিবামাত্র একটী পাত্র দেখিয়া তাহার বাগ্‌দান করা হয়। অনেক সময়ে তিন মাসের বালিকা ও চারিমাসের বালকে সম্বন্ধ করা হয়; ইহাতে অনেক অনিষ্ট হয়। এই জন্য দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণ চির দরিদ্র। বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রথা তুলিয়া দিবার জন্য অনেক লিখিয়াছিলেন ও অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং নিজে আপনার পুত্র কন্যাগণের নিতান্ত শৈশবে বাগ্‌দান করিতে দেন নাই। তাঁহার সদ্দৃষ্টান্তে এখন দাক্ষিণাত্য বৈদিক গণের মধ্যে অনেকে এই কুৎসিত প্রথা ভগ্ন করিতেছেন।

এই সকল গুণে বিদ্যাভূষণ মহাশয় সাধারণের শ্রদ্ধা ভাজন ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি—সোমপ্রকাশ। এই সংবাদ পত্র প্রকাশ করিয়া তিনি এদেশে সংবাদপত্রের পুনর্জন্ম করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে যে দুই একখানি বাঙ্গালা খবরের কাগজ ছিল তাহাতে কেবল কবিতা ও ছড়া ও লোকের গালাগালি প্রকাশ হইত। তিনি প্রথমে এদেশের লোককে গম্ভীর ভাবে রাজনীতির আলোচনা করিতে শিখাইলেন। ১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন পরিশ্রমে সমর্থ ছিলেন তখন সোমপ্রকাশ সর্ব্বাগ্রগণ্য কাগজ ছিল। গবর্ণমেণ্ট ইহার মতামত মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতেন, লোকেও ইহার মত কি জানিবার জন্য উৎসুক থাকিত। গত দশ বার বৎসর ইহার বার্দ্ধক্য ও শরীরের অসুস্থতা নিবন্ধন সোমপ্রকাশের আর সে দশা নাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত যেমন বাঙ্গালা ভাষার জন্মদাতা, বিদ্যাভূষণ মহাশয় সেইরূপ বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের জন্মদাতা। এজন্য এদেশের লোক চিরদিন ইহাঁর নিকট ঋণী থাকিবেন। ইনি কিছুদিন হইল পীড়িত হইয়া জব্বলপুরের সন্নিহিত সাতনা নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। সেখানে গত ৮ই ভাদ্র সোমবার, বিস্ফোটকরোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

ভাই বোন্।

(ঘুমপাড়াইবার সঙ্গীত।)

১

ঘুম যাও ভাই খোকন বাবু সোণার যাদুমণি,
ঘুম আয় রে ঘুম আয় রে! দিব ছানা ননী;
আসবি যদি মণির চোখে,
কত ভাল বাস্‌ব তোকে
হীরের বালা মুক্তা মালা করব্ কত দান
বাটি ভ'রে দুদ খাওয়া'ব বাটা ভ'রে পান।

২

ঘুম যাও ভাই খোকন বাবু আমার নয়নতারা,
তাদের চোখে ঘুম এসে না "মন্দ খোকা" যারা;
তুমি যে ভাই শান্ত সোণা,
সোণার চাঁদটী চাঁদের কণা,
সকাল সকাল ঘুমাও যাদু জাগ সকাল বেলা,
তাইতে আমি তোমার সনে সদাই করি খেলা।

৩

আকাশ মাঝে ঘুম পড়েছে সাঁজের তারাগুলি
ফুল বাগানে ঘুমায় যত ফুলের নবীন কলি
এদের, ওদের, তাদের ঘরে,
পড়েছে সব ঘুমের ঘোরে
গাছে গাছে ঘুম গিয়েছে কোমল কচিপাতা
আমার যাদু ঘুম পড়ে না একি লাজের কথা!

৪

ঘুম আয় রে ঘুম আয় রে! দিব মিঠাই খেতে
বসে' যা মোর মণির চোখে সোণার আসন পেতে
খোকন্না বড় দুষ্ট ছেলে,
শান্ত হবে তোমায় পেলে,
তোমার ও মুখ মিষ্ট মাখা, তাইতে বাসে ভাল
হাস্‌বে কত, স্বপন ছলে ঘর করিয়া আলো।

৫

ঘুম পড় ভাই সোণার গোপাল ঘুম পড়মোর বুকে
মা আসিয়ে কোলে নিয়ে চুম দেবেন মুখে
যখন হবে সকাল বেলা,
তখন দুজন কর্‌ব খেলা
এখন আমার লক্ষ্মী ছেলে এই কথাটী শোন
ঘুম পড় মোর সোণার মাণিক ঘর উজলা ধন।

ঢাকাই মস্‌লিন।

তবারে এই মস্‌লিন কাপড় বুনিবার যে ৪টী যন্ত্রের চিত্র দেখাইয়াছি তাহার প্রথমটী ছাড়া আর কোনটীর বিবরণ ভাল করিয়া দেওয়া হয় নাই। আজ আমরা তাহাদের কথা লিখিতেছি।

২য় চিত্র। স্ত্রীলোকগণ সূতা কাটিয়া তাঁতিদিগকে দিলে পর তাঁতিরা তাহা হইতে কেমন করিয়া নলী পাকায় ও ফেটি বাঁধে তাহাই এই চিত্রে দেখান হইয়াছে। নল হইতেই নলী শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। নলী পাকান কি জান? কতকগুলি ফাঁপা কঞ্চি কাটি ৪ ইঞ্চি আন্দাজ টুকরার আকারে কাটিয়া তাহাতে এক এক ফেটির সূতা জড়ান হয়। এইরূপ সূতা জড়ান এক একটী নলকেই নলী বলা হয়। নলীর গর্ত্তে একটী সরু কাটি পূরিয়া ঐ কাটির দুই প্রান্ত একখানা চেরা বাখারির অগ্রভাগে লাগাইয়া দিলে গাড়ির চাকার মত নলীটী ঘুরিতে থাকে। যে বাখারিতে নলীটী লাগাইয়া দেওয়া হয় উহা তাঁতি বাম পদের অঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া ধরে। তাঁতির ডান হাতে এক খানা ফেটি জড়াইবার নাটাই থাকে; নাটাইয়ের বাটের নিম্ন ভাগটী একখণ্ড নারিকেল খোলের উপর ঘুরিতে থাকে ঐ খোলটী তাঁতির ডান পায়ের আঙ্গুলের ঠেসে স্থির থাকে। একটী নলীর সমস্ত সূতা নাটাইয়ে জড়াইয়া লইলে উহা নাটাই হইতে উঠাইয়া ছোট ছোট ফেটি বান্ধা হয়।

সমস্ত সূতাকে প্রধানতঃ টানা ও পোড়েন এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। টানা অপেক্ষা পোড়েনের সূতা সূক্ষ্ম হওয়া দরকার। এই পোড়েনের সূতা আবার তিনরূপে বাছাই করা হয়। ভাল সূতা গুলি ডান হাতের দিকে, মাঝারি গুলি বাম হাতের দিকে এবং খেলো বা মোটাগুলি মাঝখানে দেওয়া হয়। আমাদের দেশী কাপড় মাত্রেই যে মুখপাতের দিকে ভাল ও পিছনের দিকে খারাপ কেন হয় তাহা এখন বেশ বুঝ্‌লে ত?

টানা ও পোড়েনের সূতা ঠিক্ এক সময়ে বা একই নিয়মে তৈয়ার করা হয় না। পোড়েনের সূতা যেমন কাপড় বুনিবার দুই দিন পূর্ব্বে তৈয়ার করিলেই চলে, টানার সূতা সেরূপ নয়। ইহা তৈয়ার করিতে অনেক সময় দরকার, এই সূতা তৈয়ারির কথা বিস্তৃত রূপে বলিতে গেলে অনেক লিখিতে হয়। আমরা মোটামুটি এই পর্য্যন্ত বলিতেছি যে, টানার সূতা তিন দিন জলে ভিজাইতে হয়। চতুর্থ দিনে সূতাকে বেশ করিয়া ধুইয়া ২য় চিত্রে প্রদর্শিত নিয়মানুসারে ফেটি বান্ধিয়া জলে ভিজাইতে হয় এবং দুইটা কাটির দ্বারা ঐ ফেটির সূতাটুকু খুব পাক দিয়া জড়াইয়া রৌদ্রে শুকান হয়। তারপর সূতাগুলিকে আবার দুই দিনের জন্য কয়লার গুড়া বা ভূষা মিশ্রিত জলে ডুবাইয়া রাখা হয় ও দুই দিনের পর পরিষ্কার জলে ধুইয়া ছায়ায় শুষ্ক করিতে হয়। এই সময় সূতাকে আবার একবার নাটাইয়ে পাকাইয়া আবার এক রাত্রির মত জলে ভিজাইতে হয় ও পরদিন খইয়ের মাড়ের সহিত খানিকটা পরিষ্কার চূণ ও জল মিশাইয়া এক রকম মণ্ড তৈয়ার করিয়া সূতা গুলিতে উত্তমরূপে মাখান হয়।

তার পর ঐ মণ্ড মাখা সূতাকে নাটাইয়ে জড়াইয়া রৌদ্রে শুকাইতে হয়। একগাছি সূতার উপর আর একগাছি সূতা পড়িলে পাছে পরস্পরে জড়াইয়া যায় এই জন্য মাড় দেওয়া সূতা নাটাইয়ে জড়াইবার সময় খুব সাবধান হওয়া দরকার। যেন এক এক ফের সূতা আলাদা আলাদা থাকে। মাড় মাখা সূতা বেশ শুকাইয়া গেলে আর একবার মাত্র নাটাইয়ে পাকাইয়া লইলেই টানার সূতা তৈয়ার হয়। কিন্তু আমরা যে সূতার কথা বলিলাম ইহা কেবল সাদা থান বুনিবার জন্যই দরকার হয়। "ডুরে" কিম্বা "চারখানা" কাপড় তৈয়ার করিতে হইলে একটু স্বতন্ত্র নিয়মের দরকার। সাদা কাপড়ের জন্য যেমন একগাছি মাত্র সূতা পাট করা হয়; তাহা না করিয়া ডুরের জন্য দুই গাছি সূতা ও চারখানার জন্য চারিগাছি সূতা একত্রে জড়ান ও উপরোক্ত নিয়মে পাইট করা আবশ্যক।

আজকাল আমাদের দেশীয় চলনসই বস্ত্র মাত্রেই প্রায় বিলাতী কাপড় অপেক্ষা কেন যে অধিক টেঁকে তাহার প্রধান কারণ আমাদের দেশের তাঁতিরা সূতাকে রীতিমত পাইট করে বলিয়া। ঢাকাই মস্‌লিনের সূতার যেমন পাইট দরকার তেমন পাইট অবশ্য আর কোন কাপড়ের জন্য দরকার করে না তথাচ একথা ঠিক যে আমাদের দেশে যেরূপ যত্ন করিয়া বার বার সূতা পাকান হয় ও তাহাতে মাড় মাখাইয়া শক্ত করা হয়, সে রূপ না করিলে দেশী কাপড় কখনই টেঁকসই হইত না। আবার দেখ, সূতা বেশ করিয়া পাইট করিলে শুদ্ধ যে তাহা শক্ত হয় তাহা নয় কিন্তু সরুও হইয়া থাকে। ঢাকাই তাঁতিরা এতদূর ওস্তাদ যে ৩০০ নম্বর বিলাতি সূতাকে পাইট করিয়া ঠিক ৪০০ নম্বরের সূতার মত করিয়া দিতে পারে। যে কাপড়ের সূতা ধোপে কম ফুলে বা ফাঁপিয়া উঠে তাহাই অধিক দিন স্থায়ী হয়। আমাদের দেশী তাঁতিরা যে সূতা তৈয়ার করে তাহা বেশ পাক খায় বলিয়া ধোপে এলাইয়া যায় না। ইহাই আমাদের দেশী কাপড়ের বেশী টেঁকসই হইবার সর্ব্ব প্রধান কারণ।

পোড়েনের সূতা কাপড় বুনিবার দুই দিন পূর্ব্বে তৈয়ার করিলেই কেন চলে জান? কারণ টানার সূতার মত পোড়েনের সূতা একবারে তৈয়ার করা দরকার করে না। ইহার পাইটও অনেক কম এমন কি ইহাতে যে মাড় লাগান হয় তাহাও অল্প। একদিন বুনিবার মত খানিকটা সূতা লইয়া ২৪ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া পরে নাটাইয়ে পাকাইয়া ও অল্প করিয়া মাড় মাখাইয়া ছায়ায় শুষ্ক করিলেই হইল। এইরূপে পোড়েনের সূতা একেবারে তৈয়ার না করিয়া প্রত্যহ একদিনের বুনিবার মত খানিকটা করিয়া সূতা প্রস্তুত করিলেই চলে।

৩য় চিত্র। টানার সূতা তৈয়ারি হইলে পর এক প্রশস্ত জায়গায় গিয়া উহা বিস্তার করিয়া তাঁতিরা কাপড়ের থান যত বড় হইবে সেই মাপ অনুসারে দুই সারি গোজ পুতিয়া তাহাদের গায়ে লম্বাভাবে সূতা বিছাইতে থাকে। দুইটী লাইন সমান্তরাল হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ এক লাইন হইতে অপর লাইনের ফাঁক কোথাও কম বেশী হয় না যেন সব জায়গায় সমান হয়। কাটি পোঁতা হইলে তাঁতিরা দুইহাতে দুইখানি নাটাই লইয়া উহার উপর সূতা বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। মনে কর যদি খোঁটার লাইন দুটী উত্তর দক্ষিণে লম্বা হয় তাহা

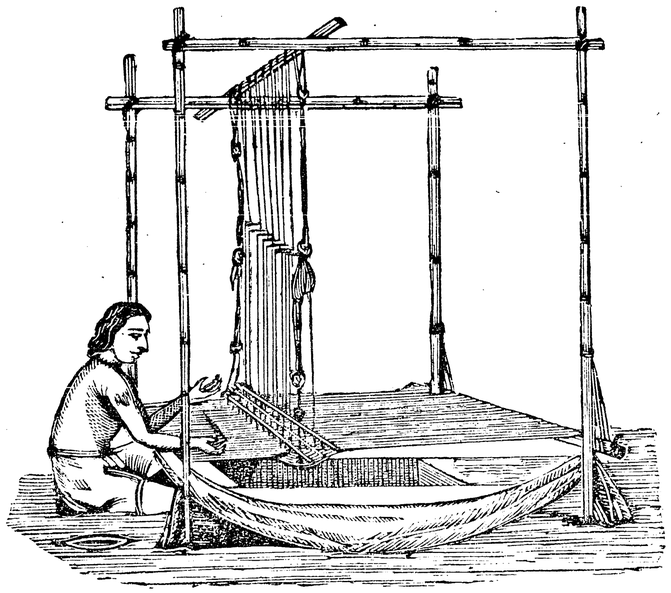

৫ম চিত্র।

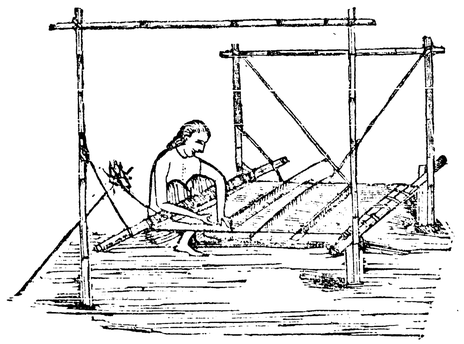

৬ষ্ঠ চিত্র।

হইলে প্রথমে যদি পশ্চিম ধারের লাইনের উত্তর সীমা হইতে তাঁতি চলিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে যখন সে ঐ লাইনের দক্ষিণ সীমায় যায় তখন তাহাকে একটু পূর্ব্ব মুখ হইয়া পূর্ব্ব লাইনের দক্ষিণ সীমার খোঁটার কাছে যাইয়া আবার উত্তর মুখ হইয়া বরাবর পূর্ব্ব লাইনের উত্তর সীমায় আসিতে হয়। দুইটী লাইনে এই-রূপে যখন একবারসূতা বিছান হয় তখন আবার তাহাকে পূর্ব্বদিকের উত্তর সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম লাইনের উত্তর প্রান্তে আসিতে হয়। এইরূপ বারবার যাওয়া আসা করিতে হয় বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে "টানা হাঁটা" বলিয়া থাকেন। একখানি কাপড়ের বহরে যতগুলি সূতা বসান দরকার ঠিক ততবার "টানা হাঁটা" আবশ্যক।

৪র্থ চিত্র। টানার সূতা বিছান হইলেই প্রায় উহা সানায় চড়ান হয়। কোন কোন স্থলে কেবল ঐ সূতা তাঁতের গোল দণ্ডে প্রথমতঃ জড়াইয়া তারপর সানায় চড়ান হয়। সানায় সূতা চড়াইবার সময় প্রথমতঃ সূতা

গুলিকে সাবধানের সহিত গোল করিয়া গুটাইয়া চালার আড়কাটের নিম্নদেশ হইতে ঝুলাইতে হয়। এইরূপ ঝুলাইয়া দিলেই সূতার একদিকের মুখগুলি যখন জমি হইতে আন্দাজ ১ ফুট ১॥০ ফুট উচ্চে আসিয়া পড়ে তখন সানা গাঁথা কার্য্য আরম্ভ হয়। সানা খানিকে দুই পাশে দুই গাছি দড়ির দ্বারা বান্ধিয়া লম্বমান সূতার সম্মুখে টাঙ্গান হয়। সানার দুইদিকে দুই জন লোক দর-কার। অর্থাৎ সূতার সামনে ও পিছনে এক এক জন লোক বসিয়া পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে সানার ভিতর সূতা পরাইতে থাকে। ১৮ গিরা বা ৪০॥ ইঞ্চি একখানা ঢাকাই সানায় শুনা যায় ২৮০০ পর্য্যন্ত খাঁজ থাকে। অর্থাৎ এক ইঞ্চির মধ্যে ৭০টী খাঁজ বা সূতা পরাইবার জায়গা। একখানা সানা দেখিতে ঠিক একখানি লম্বা সরু চিরুণীর মত। তবে চিরুণীর এক মুখ ফাঁক ইহার দুই মুখই বন্ধ। বাখারিকে খুব মিহি সূঁচের মত করিয়া চাঁচিয়া ও এক সমান করিয়া দুই ধারে দুই গাছি বেতের মধ্যে শক্ত করিয়া লাগাইয়া সানা তৈয়ার করা হয়। এই সরু কাটিগুলির মাঝে মাঝে যতগুলি ফাঁক থাকে তাহার প্রত্যেকে সূতা পরানর নামই সানা বিন্ধন। সানায় যতগুলি খাঁজ থাকে সেই মত সানার নাম দেওয়া হয়। অর্থাৎ কোন সানায় ২৮০০ খাঁজ থাকিলে তাহাকে ২৮ শর সানা, ২৬০০ খাঁজ থাকিলে ২৬ শর সানা বলা হয় ইত্যাদি। সানায় সূতা পরান হইলে পর উহা বেশ সাবধান পূর্ব্বক তাঁতের দণ্ডে জড়াইতে হয়।

৫ম চিত্র। ইহার পর কাপড় বুনিবার পূর্ব্বে জমির উপর দুই প্রান্ত সমান উচ্চ করিয়া একবার সূতা গুলিকে বিস্তার করা হয়। এই সময়ে তাঁতির সুবিধা মত কোথায় কিরূপ চিহ্ন দরকার, কোথায় কোন ফাঁস ও বন্ধনের আবশ্যক এবং কি উপায়ে সূতার মধ্য দিয়া মাকু চলিতে পারে ইত্যাদি সমস্ত ঠিক করিয়া লয়। এসব কথা বিস্তৃত বলিবার দরকার নাই। চিহ্ন করিবার জন্য যে লাল সূতা ব্যবহার করা হয় উহা তাঁতির পশ্চাৎদিকে নিকটস্থ কোন একটী খুঁটির গায়ে বাঁধা একখানা নাটাইয়ে জড়ান থাকে।

৬ষ্ঠ চিত্র। এইরূপে সমস্ত ঠিক্ ঠাক্ হইলে কাপড় বুনিতে আরম্ভ করা হয়। তাঁতিরা কেমন করিয়া তাহাদের চালার মধ্যে তাঁত খাটায় তাহা এই চিত্রে বেশ স্পষ্ট করিয়া দেখান হইল। ৫ম ও ৬ষ্ঠ চিত্রের দুই দিকে দুইটী করিয়া যে গোল দণ্ড দেখিতেছ ইহার মধ্যে পিছনের দণ্ডটীতে সূতা জড়ান থাকে ঐ সূতা সানার মধ্য দিয়া সম্মুখের দণ্ড পর্য্যন্ত ছড়ান থাকে। তাঁতি যখন সম্মুখ দিক হইতে কাপড় বুনিতে আরম্ভ করে তখন সম্মুখের দণ্ডতেই একটু একটু করিয়া কাপড় জড়ান হয় এবং পিছনের দণ্ড হইতে ক্রমেই সূতা ফুরাইয়া আইসে। আমাদের তাঁতিরা যে সকল যন্ত্রের সাহায্যে বস্ত্র বুনে তাহা আমাদের পাঠক বর্গের অনেকেই দেখিয়াছেন সন্দেহ নাই। ঢাকাই মস্‌লিনের যন্ত্রাদি দেখিয়া এবং হিন্দু তাঁতির ক্ষীণ শরীর অথচ অতুলনীয় সহিষ্ণুতা, দক্ষতা ও অঙ্গুলি চালনা দেখিয়া ইংরেজেরা আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছেন "ভারতবাসীরা যে সকল যন্ত্রের সাহায্যে এ সূক্ষ্ম কাপড় বুনিয়া থাকে ইয়ুরোপীয়দিগের কদাকার অঙ্গুলিতে সে সকলের সাহায্যে মোটা ক্যানভাস কাপড়ও তৈয়ার হইতে পারে কিনা সন্দেহ।" উত্তাপের সময় তাঁতিরা মসলিন্ কাপড় বুনিতে পারে না। ভাল কাপড় মাত্রেই সকালে বৈকালে বুনা হয়। আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র

এই তিন মাসই খুব ভাল মস্‌লিন বুনিবার উপযুক্ত সময়।

ক্রমশঃ

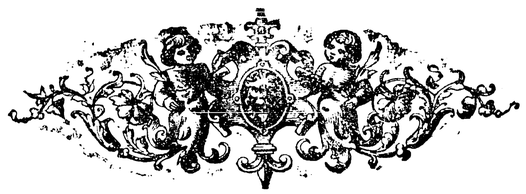

সাধের খেলা।

বোসেদের দুটি ছেলে সদাই খেলায় মন,
লেখা পড়া ছেড়ে শুধু খেলাতেই প্রাণপণ।
পূজার ছুটিটি হলে খেলিবে কতই খেলা,
পড়া ছেড়ে সেই ফন্দি আঁটিতেছে এই বেলা।
ছুটিতে খেলিবে ব'লে মিলে তিন ভাই বোনে
বাবা তাহাদের এক দিয়েছেন গাড়ী কিনে।
কবে বা হইবে ছুটি, বিলম্ব না সহে আর,
বড় সাধ গাড়ী লয়ে খেলে আজই একবার।

দেখিল উভয়ে হর্ষে, বাবা আজ নাই ঘরে,
সুরেশ সুযোগ দেখে ডেকে বলে নরেশেরে।
সরলারে ডেকে আন্, বাবা আজ বাড়ী নাই,
গাড়ীতে চড়ায়ে তারে চল্‌রে খেলিতে যাই।
নরেশ উঠিল নেচে : বাবা আজ বাড়ী নাই।
সরলারে ডেকে নিয়ে চল ভাই চল ভাই।
গাড়ীখানি লয়ে গেল যেখানে সরলা আছে,
দুই ভাই মিলে তবে বলে সরলার কাছে।
দেখ্ বোন দুই ভাই নূতন পোষাক পরে,
আসিয়াছি তোরে ল'য়ে খেলাতে যাবার তরে।
তুইও বোন তোর সেই নূতন পোষাক পরে,
টুপিটি মাথায় দিয়ে হাতেতে ছাতিটি ধরে,
চল্ বোন চল্ বোন, বাবা আজ নাই বাড়ী,
আনিয়াছি এই দেখ্ কেমন সুন্দর গাড়ী।
তোমারে চড়ায়ে তাতে টানিব দুজনে মোরা,
দুইজনে ছুটে যাব যেন দুই জুড়ি ঘোড়া।
চল বোন চল তবে বিলম্ব ক'রোনা আর,
বাবা বাড়ী এলে পরে যাওয়া যে হইবে ভার।
ভাইদের কথা শুনে আনন্দে উঠিল নেচে,
নূতন পোষাক পরে সরলাও এল সেজে।

ছাতিটি লইয়া হাতে গাড়ীতে উঠিয়া বসে
আনন্দে দুভাই ছুটে দড়ি লয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে।

এইরূপে কতদূর
চলিল কজনে তারা

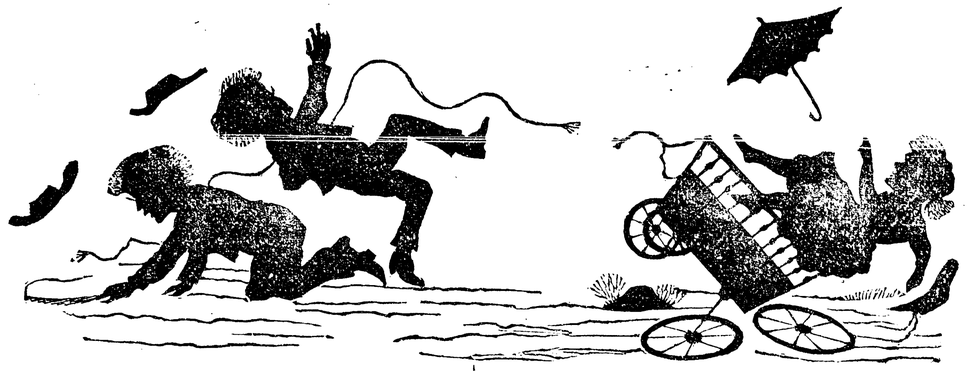

কতই উৎসাহ আজ প্রাণে ;
আনন্দে চলিছে ছুটে
কোন দিকে দৃষ্টি নাই
বিঘ্ন বাধা কিছু নাহি মানে।
আছিল পথেতে সেই
বৃহৎ পাথর এক
দুজনার কেহ না দেখিল,
হঠাৎ সে পাথরেতে
বিষম আঘাৎ লেগে
দড়িগাছ অমনি ছিড়িল।
সুরেশ পড়িল নীচে, নরেশ পড়িল তদুপরি,
গাড়ীখানি উল্টে গিয়ে সরলাও যান গড়াগড়ী।

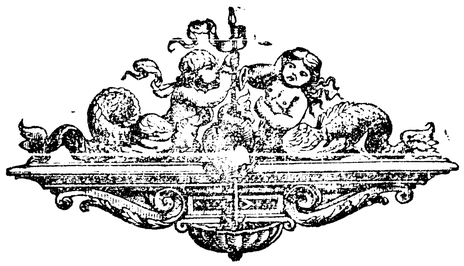

অতলস্পর্শ।

নেক দিনের কথা—বোধ হয় ৭।৮ বৎসর হইবে, আমি একবার পূর্ব্বাঞ্চলে কোন স্থানে ছিলাম। তখন বর্ষাকাল; আমাদের পাঠক বিশেষতঃ পাঠিকাদিগের মধ্যে যাঁদের একটু অভিমান বেশী তাঁদের মত আকাশের মুখখানি সকল সময় ভার হইয়াই থাকিত, ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্ সারা দিনই বৃষ্টি হইত, কাজেই বড়একটা বাড়ীর বাহির হইতে পারিতাম না, সমস্ত দিন ঘরে বসিয়া থাকিতে হইত। চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিলে, বিশেষতঃ বর্ষাকালে যখন চারিদিক আঁধারে ছাইয়া আছে, টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে, তখন মনের মধ্যে কত রকম চিন্তা, কত রকম ভাব আসিয়া উপস্থিত হয় ; সকলেরই হয় কিনা জানি না, কিন্তু আমার হয়। আর শুনিয়াছি সেই ভাব গুলি যাঁহারা প্রকাশ করিতে পারেন, তাঁহারাই কবি। শুনিয়া আমারও একটু কবি হইবার

ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু মনের ভাব এমনি চঞ্চল ও অস্থির যে শত চেষ্টা করিয়াও আমি সেগুলিকে ধরিয়া নিজের বশ করিতে পারিতাম না; কাজেই অনেক চেষ্টার পর কবি হইবার ইচ্ছাটী আমাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। সে কথা যাক্, বলিতেছিলাম যে একদিন বিকাল বেলা একটি ঘরে একলা বসিয়া কত কি ভাবিতেছি এমন সময় কামানের শব্দের মত এক প্রকার গভীর শব্দ হঠাৎ শুনিতে পাইলাম; বোধ হয় ক্রমান্বয়ে ৬।৭ বার শব্দটী হইল। সেখানে কামানের শব্দ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, অথচ কোথা হইতে এমন ভয়ানক শব্দ আসিতেছে জানিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইলাম। শব্দটী শুনিয়াই আমার মন কেমন এক প্রকার ভয় ও বিস্ময়ের ভাবে পূর্ণ হইল। ভাবিতে ভাবিতে একজনকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহার প্রাচীন বয়স, তিনি বলিলেন, ও আর কিছু নয়, যমের বাড়ীর দরজা বন্ধ হইবার শব্দ। তাঁহার কথায় আমার মনের ভয়ের ভাবটা একটু বেশী হইল বটে, কিন্তু কেন জানি না কথাটায় বড় বিশ্বাস হইল না; যাহা হউক, তাঁহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। সেই অবধি প্রায়ই ঐ শব্দ শুনিতে পাইতাম, আর শুনিলেই কত চিন্তা আসিত। এ শব্দটা কোথা হইতে আসে জানিবার জন্য আমার ভারি একটা আগ্রহ জন্মিল এবং অনেকের কাছে অনুসন্ধানও করিতে লাগিলাম। এ সম্বন্ধে এখনও স্থির কিছু জানা যায় নাই, তবে কতক জানা গিয়াছে। যাহা জানা গিয়াছে তাহা বড়ই বিস্ময়কর এবং তাহাতে বড় ভয়েরও কথা আছে।

আমাদের পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে যাঁহাদের বরিশাল অঞ্চলে বাড়ী, তাঁহারা অনেকেই বর্ষাকালে এই অদ্ভুত শব্দ শুনিয়া থাকিবেন। বরিশাল হইতে খুব স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায় বলিয়া সেখানকার সাহেবেরা ইহাকে বরিশাল তোপ (Barisal gun) নাম দিয়াছেন। কিন্তু এই শব্দ এত গভীর ও এত প্রবল যে শুধু বরিশাল নহে কিন্তু পূর্ব্বাঞ্চলের অনেক স্থান, সুন্দরবন এবং তন্নিকটবর্ত্তী নানাস্থান হইতে সমানভাবে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা যে কামানের শব্দ বা মানুষের কৃত কোন শব্দ নহে তাহা নিশ্চয় জানা গিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে এক একবারে প্রায়ই ৬।৭ বার করিয়া শব্দ হইয়া থাকে, এবং বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য কোন কালে শুনিতে পাওয়া যায় না। বর্ষাকালে পূর্ব্বাঞ্চলে অনেক লোক জ্বরে যমের বাড়ী যাইয়া থাকে। এই জন্যই বোধ হয় এই শব্দটার সহিত যমের বাড়ীর একটা সম্বন্ধ ঘটান হইয়াছে। একথা সত্য মিথ্যা পাঠক পাঠিকা বুঝিবেন। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে এই ভয়ানক শব্দ পৃথিবীর গর্ভ হইতে আসিতেছে এবং অতলস্পর্শই এই শব্দের উৎপত্তি স্থান, ইহাই তাঁহারা স্থির করিয়াছেন।

এই অতলস্পর্শ কি? অতলস্পর্শ শব্দের অর্থ এই যে যাহার তল স্পর্শ করা যায় না, অর্থাৎ যাহার গভীরতার সীমা নাই। বাস্তবিকই বাঙ্গালার দক্ষিণে, সমুদ্র মধ্যে এমন একটি স্থান আছে যাহা অতলস্পর্শ। উহা এত গভীর যে কোন কোন বিজ্ঞানবিদ্ সাহেব ইহার পরিমাণ করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াও সফল হইতে পারেন নাই। বাঙ্গালা দেশ ক্রমে বাড়িয়া বাড়িয়া এই অতলস্পর্শের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এখন যে মাটি বৎসর বৎসর নদীর স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছে, সমস্তই এই গভীর গর্ত্তের মধ্যে পড়িতেছে; পলি (Sediment) আর জন্মিতে

পায় না, কাজেই বাঙ্গালার আয়তনও আর বাড়িতেছে না। বাঙ্গালার আয়তন বৃদ্ধির কথা যখন বলা গেল, তখন এই সঙ্গে আরও একটা কথা বলিয়া রাখি। পূর্ব্বে—কতবছর পূর্ব্বে তাহা বলিতে পারি না—তবে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশ ছিল না। হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত কেবল সমুদ্র ছিল। পরে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর স্রোতে নানা দেশের মাটি ধুইয়া আসিয়া ক্রমে চড়া পড়িয়া বাঙ্গালা দেশের সৃষ্টি হইয়াছে। কেমন করিয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হয়, তাহা ভূতত্ত্ব পড়িলে জানিতে পারা যায়। বাঙ্গালার মাটি ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের মত পাথর কি কাঁকর মিশ্রিত নয়; স্রোতের সঙ্গে যে মাটি ভাসিয়া আসে, বাঙ্গালার সকল স্থানেই সেই মাটি। পলি স্তরে স্তরে জমিয়াই যে বাঙ্গালার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ভূতত্ত্ববিদেরা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহার আরও অনেক প্রমাণ আছে, এখানে সে সমস্ত লিখিবার দরকার নাই। এখন কথা এই যে, স্রোতের পলি স্তরে স্তরে জমিয়াই যদি বাঙ্গালার সৃষ্টি হইয়া থাকে তবে বাঙ্গালা দেশটা ত ক্রমেই বাড়িয়া যাইবার কথা! কেন না পূর্ব্বের মত এখনও বৎসর বৎসর স্রোতে মাটি ভাসিয়া আসিতেছে। যে কয় সহস্র বছরে বাঙ্গালার এখনকার আকার হইয়াছে, আরও তত বছরে ত বাঙ্গালা ইহার দ্বিগুণ হইবে। কথা ঠিক। তাহা হইবারই কথা, কিন্তু তাহা হইতেছে না। কেন হইতেছে না, তাহা আমরা পূর্ব্বেই এক প্রকার বলিয়াছি। আমরা বলিয়াছি বাঙ্গালা দেশ ক্রমে বাড়িয়া বাড়িয়া এই অতলস্পর্শের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এখন বৎসর বৎসর যে মাটি স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছে, সমস্তই এই অতলস্পর্শের মধ্যে পড়িতেছে। পলি আর জমিতে পায় না, কাজেই বাঙ্গালার আয়তনও আর বাড়িতেছে না। শুধু এই পর্য্যন্ত হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি ছিল না; কিন্তু আশঙ্কার কথা আছে। কিছুকাল হইল এই প্রকাণ্ড গর্ত্তের সমুদ্রের মধ্যস্থ উত্তর দিকের নীচের ভাগটা কতকখানি এই অতলস্পর্শের মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; কাজে কাজেই সেই দিকের অর্থাৎ বাঙ্গালার দক্ষিণ অংশের ভূমির উপর ভাগটা নামিয়া গিয়াছে। এই স্থান এখন সুন্দরবন হইয়া গিয়াছে। আগে সেখানে সুন্দরবন ছিল না, এই স্থান নীচু হইয়া যাওয়াতেই সুন্দরবন হইয়াছে।

বাঙ্গালার মধ্যে এই স্থানই পূর্ব্বে সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান ছিল। আজ পর্য্যন্তও সুন্দরবনে যে সমস্ত পুরাতন ভগ্ন বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়, ঢাকা মুরশিদাবাদ প্রভৃতি বাঙ্গালার পুরাতন রাজধানীতে তেমন অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সমস্ত কারণে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, যে স্থান এখন নামিয়া যাওয়াতে সুন্দরবন হইয়া গিয়াছে, পূর্ব্বে তাহাই বাঙ্গালায় প্রধান রাজধানী ছিল। এই স্থান যে নীচু হইয়া গিয়াছে, তাহার আর এক প্রমাণ এই যে দিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা কাল এই স্থানের অধিকাংশ জলে ডুবিয়া থাকে। যদি পূর্ব্বেও এখনকার মত জলে ডুবিয়া থাকিত তবে আর এখানে বসতি হইতে পারিত না। ইহার আরও অনেক প্রমাণ আছে তাহা লিখিবার দরকার নাই।

পুরাণে আছে যে ভগীরথ যখন গঙ্গাকে আনিয়া পিতৃকুলের উদ্ধার করেন, তখন ভাগিরথী পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া সাগরে পতিত

হন, তার পর পাতালে প্রবেশ করেন। বলিতে পারি না, হয়ত এই অতলস্পর্শ পাতালেরই পথ। আমাদের পাঠক পাঠিকাদিগের কাহারও যদি পাতাল দেখিবার সাধ থাকে তবে এই পথে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন।

যে কামানের শব্দের কথা আগে বলিয়াছি, অনেকে বলেন যে ইহা এই অতলস্পর্শ হইতে উঠিতেছে। বর্ষাকালেই এই শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, কাজেই জল বেশী হওয়ার সঙ্গে ইহার একটা সম্বন্ধ থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা যে কি তা এখনও ঠিক হয় নাই। সমস্ত স্থির জানিতে পারিলে পরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। আমাদের পাঠক পাঠিকারা এ সম্বন্ধে কি মনে করেন, আমাদিগকে লিখিতে পারেন।

যাহা হউক এই অতলস্পর্শ আমাদের বড় মঙ্গলজনক নহে। ইহা হইতে যে কবে আমাদের কি সর্ব্বনাশ হইবে বলা যায় না। একবার ইহার নীচের ভাগ ভাঙ্গিয়া পড়াতে বাঙ্গালা দেশের কতকটা নামিয়া গিয়া সুন্দরবন হইয়া গিয়াছে, আবার হয়ত আরও ভয়ানক কোন ঘটনা ঘটিতে পারে। কবে যে ইহার বৃহৎ উদর পূর্ণ হইবে তাহা বলা যায় না, আর যতদিন তাহা না হইবে ততদিন বাঙ্গালাদেশেরও বিষম বিপদের আশঙ্কা। কোথাও কিছু নাই, সকলেই নিজ নিজ কাজ করিতেছে, আমোদ আহ্লাদ করিতেছে, দিন যেমন যায় তেমনি যাইতেছে হয়ত হঠাৎ সমস্ত বাঙ্গালাদেশ ইহার উদরসাৎ হইয়া যাইবে! যেখানে বাঙ্গালাদেশ ছিল সে স্থান হয়ত সমুদ্র হইয়া যাইবে। একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, সে কি ভয়ঙ্কর কথা!

শ্যামচাঁদের পাঁচ দশা।

আমাদের দেশে অনেক ব্যক্তিকে বালক কালে তামাক খাইবার অভ্যাস করিতে দেখা যায়। তামাক যে কি পদার্থ তাহা জানা না থাকাতেই লোকে এইরূপ ভ্রমে পড়ে। তামাক এক প্রকার বিষ। বিষের স্বভাব এই যে, তাহা উদরে গেলেই শরীরের বিকার উপস্থিত হইতে থাকে। ঘন ঘন বমি হয়, মাথা ঘোরে, চক্ষু বিকৃত হয়। মুখ শুষ্ক ও বিবর্ণ হয়, এইরূপে শরীরের নিতান্ত অসুস্থ অবস্থা উপস্থিত করে। যে ব্যক্তির তামাক খাওয়া অভ্যাস নাই, তাহাকে যদি তামাক খাওয়াইয়া দেও, অমনি দেখিবে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইবে। তামাক এমনি বিষ, যদি তামাকের পাতা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল কাহাকেও খাইতে দেও তখনি সে ব্যক্তির বমন হইবে, মাথা ঘুরিবে, আর আর বিষের লক্ষণ সকল দেখিতে পাইবে। তামাক পাতা খানিকটা কোন বালককে খাওয়াইয়া দেও সে ঘুরিয়া পড়িবে, হয়ত অজ্ঞান হইবে। এমন কি তামাকের ধূয়াঁ যে হুকার জলের মধ্য দিয়া যায় সেই জলটা চারি পাঁচ দিন বাদে কাহাকেও খাওয়াইয়া দেও, দেখিবে বিষের কাজ করিবে। অভ্যাসের এমনি গুণ যে অভ্যাসের জোরে এমন বিষও সহিয়া যায়। কিন্তু সহিয়া গেলে কি হয়, পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, বালককালে তামাক খাওয়া অভ্যাস করিলে অনেক পীড়া জন্মিতে পারে। প্রথম—বালককালে কোনরূপে তামাক খাওয়া অভ্যাস

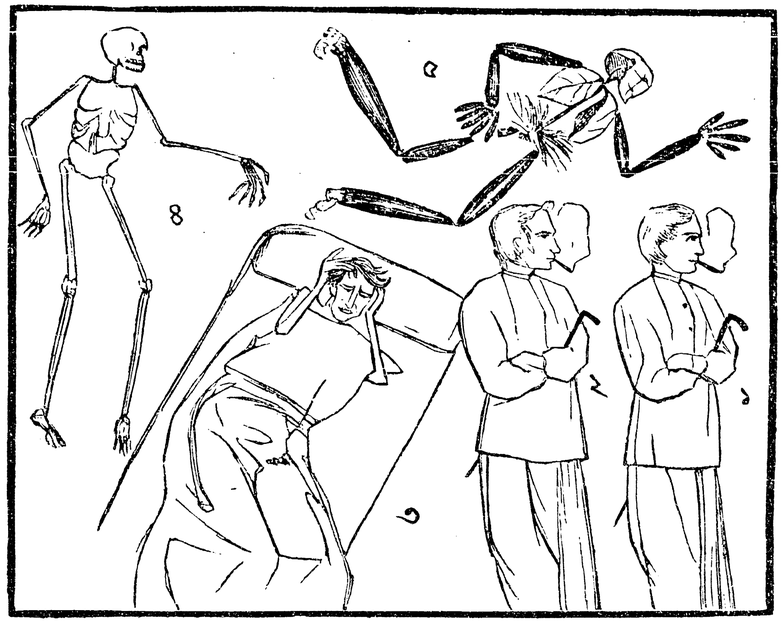

করিলে ব্রঙ্কাইটিস্ প্রভৃতি কাস রোগ জন্মিতে পারে। মস্তিষ্ক খারাপ হইয়া যায়, পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত হয়। শিরঃপীড়া জন্মিতে পারে। অতিরিক্ত চুরুট খাইয়া বালকদিগকে এই সকল পীড়াতে আক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে। বালককালে তামাক খাইতে শিখিয়া অনেক ভাল ছেলে বোকা ও অকর্ম্মন্য হইয়া পড়িয়াছে এরূপও দেখা গিয়াছে। এই সকল কারণে বালকের মুখে চুরুট দেখিলে আমাদের অত্যন্ত ক্লেশ হয়। উপরে ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত কর। চুরুট খাইতে শিখিয়া একটী বালকের কি দশা হইয়াছে দর্শন কর।

প্রথম দশা।

গাঁটা গোঁটা মোটা সোটা নধর সুন্দর।
বালক দোলায়ে কোঁচা হয় অগ্রসর॥
তেঁরি কাটা ফিটফাট চুরটটী মুখে।
উড়াইয়া ধূঁয়া বাবু চলিছেন সুখে॥

গোল গোল হাসি হাসি মুখখানি তার
ধূঁয়াবৃত; মেঘাবৃত চাঁদের আকার।
ছেলে হয়ে বুড়া সাজ ধূঁয়া উড়াইয়া
ছড়ি হাতে যায় শ্যাম বুক ফুলাইয়া।

দ্বিতীয় দশা।

ওই আসে শ্যামচাঁদ, চুরুটের গুণে
নবীন বয়সে তারে ধরিয়াছে ঘুণে।
হয় না হজম ভাল, নিত্য মাথা ধরে,
সকালে প্রত্যহ পেট ভুট ভাট করে;
তামাকের বিষে দেহ যায় শুকাইয়া,
এমন নধর দেহ গেছে পাকাইয়া;
তবু ছড়ি হাতে বাবু চুরুটটী মুখে,
না ভেবে নিজের দশা চলেছেন সুখে।

তৃতীয় দশা।

দেখ দেখ শ্যামচাঁদ অস্থি চর্ম্ম সার,
আঁতে আঁত দাঁতে দাঁত, বিকৃত আকার।

মাথার ব্যাথাতে স্বস্তি নাহি রাত্রি দিনে,
শিরে হাত দিয়ে কাঁদে চুরুটের গুণে।
বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ প্রাপ্ত সবে ঘৃণা করে,
সতত অসুখী সদা, মরি মরি করে।
চুরুটে কাশের রোগ, ক্ষয় পেয়ে যায়,
তেমন সুন্দর কান্তি কোথায় মিলায়।

চতুর্থ দশা।

হাড্ডিসার শ্যামচাঁদ এইবারে ভূত,
চুরুটে খেয়েছে তারে অভাগার পূত।
কাটি কাটি পাদুখানি কাটি কাটি হাত,
অস্থির পঞ্জর পেটে নাহি তাহে আঁত।
হাড় মাঝে দাঁত পাটি অতি ভয়ঙ্কর,
এই কি সে শ্যামচাঁদ নধর সুন্দর।
দেখিলে শ্যামের রূপ তরাসে পলাই,
চুরুট তোমার গুণ বলি হারি যাই!

পঞ্চম দশা।

তামাকের ভক্ত শ্যাম, তামাক সেবায়
মরিল অকালে, তাই দেবতা তাহায়
দিল এই নব জন্ম, হাতগুলি তার
চুরুটেতে গড়া হলো, চুরুটের পা,
তামাক পাতায় গড়া দেখ সর্ব্ব গা,
নর জন্ম গিয়ে হলো তামাক জনম,
তেমনিত ফল হয় যেমন করম।

ধাঁধা।

গত জুলাই মাসের সচিত্র
ধাঁধার উত্তর।

কলিকা—তাস—কল—রকম—দোকান—মালাযপ—রিপু—র্ণ। পৃথিবী—রস—কলম—ত অবলম্বী—লো—কই—আছে।

কলিকাতা সকল রকম দোকান মালায় পরিপূর্ণ। পৃথিবীর সকল মতাবলম্বী লোকই আছে।

নূতন ধাঁধা।

১। একজন পয়সায় তিনটা করিয়া ১০০টা ডিম এক দোকানদারের নিকট হইতে, এবং পয়সায় ২টা করিয়া ১০০টা অন্য এক দোকানদারের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া পর দিন ২ পয়সায় ৫টা হিসাবে ডিমগুলি বিক্রয় করিল। তাহার কত লাভ বা লোকসান হইল বল দেখি?

অক্টোবর, ১৮৮৬।

পরলোক-গত
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

খার পাঠক পাঠিকাগণ! পূজার সময় সমুদায় বঙ্গদেশের লোক যখন আমোদ কোলাহলে মত্ত ছিল, তখন আমাদের দেশের একটী রত্ন আমরা হারাইয়াছি। আমরা গত দুই বৎসরের মধ্যে তোমাদিগকে কত দুঃখের সংবাদই দিলাম। যাঁহারা দেশের মুখশ্রী স্বরূপ ছিলেন, এরূপ এত লোক যে এত অল্প সময়ের মধ্যে হারাইব তাহা আমরা জানিতাম না। ইহাঁদের অকাল-মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশের যে কত ক্ষতি হইতেছে তাহা তোমাদিগকে বলিয়া জানাইতে পারি না।

আজ যাহাঁর মৃত্যু সংবাদ লইয়া তোমাদিগের নিকট উপস্থিত হইতেছি তাঁহার নাম অনেকে শুনিয়া থাকিবে। ইহাঁর নাম রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। ইহাঁর প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস তোমরা অনেকে পড়িয়া থাকিবে; অথবা ইহাঁর রচিত "মিত্র বিলাপ" নামক কবিতা পুস্তকও তোমরা পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থে তোমরা তাহাঁর যে পরিচয় পাইয়াছ, তাহা অতি সামান্য। তাঁহার যে অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি ও সদগুণ ছিল তাহার অল্পই ঐ সকল গ্রন্থে প্রকাশ পাইয়াছে। বলিতে কি তাঁহার যে কত বিদ্যা বুদ্ধি ছিল, তাহা দেশের অনেক বড় বড় লোকেও জানিতেন না। হইার কারণ এই, তিনি আপনার গুণ সকল বিনয়ের দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতেন। কত লোক দেখিতে পাই, যাহারা একগুণ থাকিলে দশগুণ দেখায়; যে বিদ্যা নিজের নাই, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করে; মান সম্ভ্রম লাভ করিবার জন্য কত কৌশল কত ফন্দি করে; পদস্থ লোকদিগের সহিত মিশে ও তাঁহাদের তোষামোদ করে; রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি বালকের ন্যায় সরল স্বভাব ও বিনীত ছিলেন, সামান্য লোকের ন্যায় বেড়াইতেন, তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত না যে তিনি এত বড় লোক।

অনুমান ১৮৪৬ সালে নদীয়া জেলার একটী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ৮ বৎসর বয়সের সময় রাজকৃষ্ণের পিতৃবিয়োগ হয়, তদবধি তাঁহার ভ্রাতা, ইস্কুল সমূহের সুবিখ্যাত ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, তাঁহার অভিভাবক ছিলেন। বালককাল হইতে রাজকৃষ্ণ পাঠে অতিশয় মনোযোগী ছিলেন। ধীর শান্ত স্বভাব, ও পাঠে মনোযোগী হওয়াতে তিনি সকলের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। তিনি যখন

বিচ্ছেদ দুঃখে নিমগ্ন করিয়া ও বঙ্গভূমিকে ক্ষতি গ্রস্থ করিয়া ৪১ বৎসর মাত্র বয়সে ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। এ ক্ষতির আর ত্বরায় পূরণ হইবে না।

ঢাকাই মস্‌লিন।

আমরা গত দুইবারে এই মস্‌লিন সম্বন্ধে সূতা কাটা হইতে তাঁতে কাপড় বুনা পর্য্যন্ত চিত্র সহিত দেখাইয়াছি। * এবারে অবশিষ্ট দুইটি চিত্র দেখান যাইতেছে :—

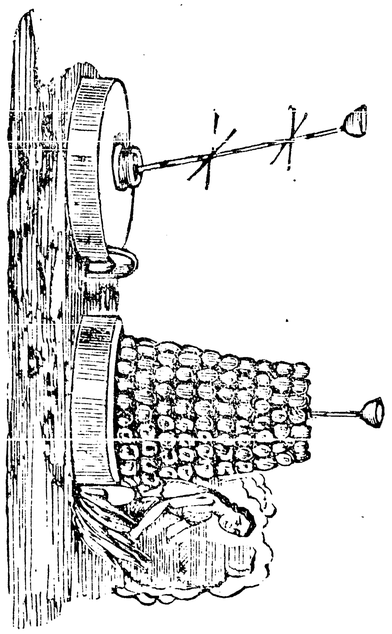

৭ম চিত্র।

৭ম চিত্র—পাশাপাশি দুইটি "ভাটি" দেখান হইয়াছে। বামদিকেরটি শুদ্ধ ভাটির চিত্র এবং ডাইনদিকেরটি ভাটিতে কাপড় সাজান হইলে কিরূপ দেখিতে হয় তাহার চিত্র, পাঁড়াগায়ে হয়ত অনেক ধোপার ভাটি দেখিয়া থাকিবেন সেইজন্য আমরা আর তাহার কথা বিশেষ করিয়া বলিলাম না। তবে এস্থলে বলা আবশ্যক যে, ঢাকাই মস্‌লিন যেরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র তদনুরূপ সতর্কতার সহিত এই কাপড় ধোয়া আবশ্যক। সুতরাং ধোপারা অন্যান্য কাপড় যেমন দুইএকবার মাত্র ভাটি করিয়া পাটে আছড়াইয়া পরিষ্কার করে মস্‌লিন বস্ত্র সেরূপ না করিয়া ক্রমাগত ১০।১২ বার ভাটি করা হয় এবং পাটে খুব অল্প পরিমাণেই আছড়ান হয়। আবুল ফজেল নামক কোন এক ইতিহাস লেখক বলিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে সোণারগাঁ বা সুবর্ণগ্রামের অন্তঃর্গত কাটারাসুন্দা নামক স্থানের জলই মস্‌লিন ধুইবার জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল। ইদানীং নারায়নদিয়া হইতে তেজগাঁ পর্য্যন্ত সচরাচর কাপড় ধোয়া হইয়া থাকে। পুরাকালে ইংরেজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী সওদাগর-দিগের আমলে তেজগাঁয়ে অনেকগুলি কাপড় ধুই-বার আড্ডা ছিল কিন্তু সেই সমস্ত বিদেশীয় দিগের কুঠি নষ্ট হওয়া পর্য্যন্ত তেজগাঁয়ের অধিকাংশ স্থল জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

উপরে বলা গিয়াছে যে, মস্‌লিন্ বস্ত্র ১০।১২ বার ভাটিতে চড়ান আবশ্যক। প্রতি রাত্রে কাপড় ভাটি করিয়া পরদিন উহা ক্ষারজল মাখাইয়া রৌদ্রে শুখাইতে হয়। এইরূপে ১০।১২ দিন গত হইলে শেষ ভাটির পরে কাপড়গুলি পরি-ষ্কার জলে ধুইতে হয়। এই সময় জলের সহিত লেবুর রস মিশান বড় দরকার। তাহা হইলে কাপড়ের শ্বেত বর্ণের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয়। থান প্রতি একটি

* গত বারে ভ্রম বশতঃ ৫ম চিত্রের স্থলে ৬ষ্ঠ চিত্রটি এবং ৬ষ্ঠ চিত্রের স্থলে ৫ম চিত্রটি দেখান হইয়াছে।

করিয়া বড় লেবুর রস হইলেই চলে। শাদা কাপড়ের জন্য যেমন লেবু তেমনি কার্পাস ও মূগা (রেশম) মিশ্রিত কাপড় সমূহের জন্য লেবুর রস ও চিনি ব্যবহার করা হয়; কারণ, শুনা যায় চিনিতে রেশ-মের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে। জুলাই হইতে নবেম্বর এই কয়মাস মস্‌লিন ধুইবার উপযুক্ত সময়। যে কাপড় যত বার ভাটি করা হইবে তাহা সেই পরিমাণে শাদা ও পরিষ্কার হইবে এবং ধোপ দিবার খরচাও সেইমত বাড়িবে। এইজন্য ১০০ থান কাপড় ধুইতে ও পাট করিতে ৩০৲ টাকা

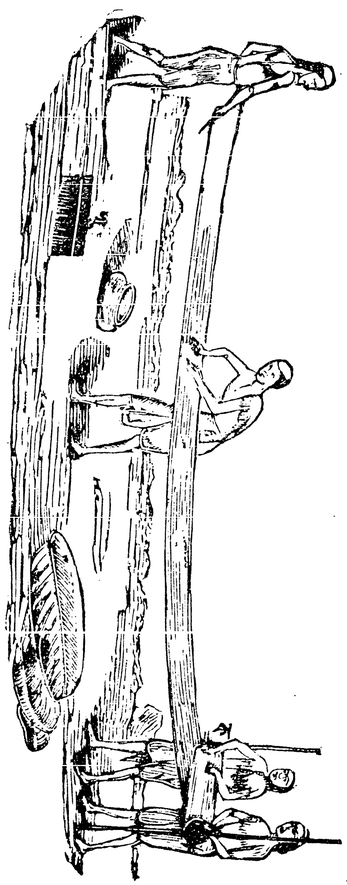

৮ম চিত্র।

হইতে কখন কখন ১৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত পড়তা পড়ে।

৮ম চিত্র—পাটে আছড়াইবার সময় মস্‌লিনের সূক্ষ্মতর সূতাগুলি অনেক সময় স্থানে স্থানে এলোমেলো হইয়া পড়ে। কাপড় ধোয়া হইলে সেই স্থানভ্রষ্ট সূতাগুলিকে কেমন করিয়া দোরস্ত করা হয় তাহাই এই চিত্রে দেখান হইয়াছে। একদিকে জমির উপরে দুটি খোঁটার সহিত সংলগ্ন একটি "নরদ" বা দণ্ডে দুইজন কাপড়ের থানটি গুটাইয়া ধরিয়া আছে অপর দিকে আরএকজন ঐ থানের খানিকটা বিস্তার করিয়াছে, মধ্যস্থলে চতুর্থ ব্যক্তি যেখানে যেখানে উহার সূতা হেলা-গুছা হইয়া গিয়াছে তাহা ঠিক করিয়া দিতেছে।

পাটে আছড়াইবার সময় অনেক সূতা ছিড়ি-য়াও নষ্ট হইয়া যায়। রিফুগারেরা সেই সূতার পরিবর্ত্তে নূতন সূতা লাগাইয়া দেয়। রিফুগারিতে ঢাকার মুসলমানেরা যেমন ওস্তাদ এমন প্রায় অপর কাহাকেও দেখা যায় না। একজন সুদক্ষ রিফুগার ২০ গজ লম্বা একটি সূক্ষ্ম মস্‌লিন থান হইতে একগাছি ছেঁড়া বা মোটা সূতা বাহির করিয়া তাহার স্থানে ঠিক সেইরূপ লম্বা আর একগাছি ভাল ও সূক্ষ্ম সূতা পরাইয়া দিতে পারে!! ঢাকায় এইরূপ অনেকঘর রিফুওয়ালা আছে। ইহাদের অনেকেই আফিন খায় এবং শুনা যায় নেশার ঝোঁকেই উহারা উত্তমরূপ কাজ করিতে পারে।

(ফুলের সাজি)

চতুর্থ অধ্যায়।

মনোরমাকে রাজপুরুষগণ যখন পথ দিয়া লইয়া যাইতে লাগিল, তখন সে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। নির্দ্দয় রাজকর্ম্মচারিগণ সেই অজ্ঞান অবস্থাতেই তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিল। ক্রমে যখন তাহার চেতনা হইল, তখন সে আপনার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিল। প্রকৃত ঘটনা একে একে তাহার মনে উদয় হইতে লাগিল এবং সে বুঝিল "সে কারাগারে বন্দিনী"। অশ্রুজলে তাহার বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরিতাপ ও ক্রন্দন করিয়া, মনোরমা কতক সুস্থির হইয়া, বিপদভঞ্জন হরিকে সকাতরে ডাকিতে ডাকিতে শীঘ্রই তৃণশয্যার উপর নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

নিদ্রার কি আশ্চর্য্য শক্তি! পুত্রশোকাতুরা জননী, পতিবিয়োগ-আকুলা সতী, এবং রুগ্ন শয্যায় পীড়িত ব্যক্তিও নিদ্রাভিভূত হইয়া সকল যাতনা ভুলিয়া যান। মনোরমা যতক্ষণ নিদ্রিতা ছিল ততক্ষণ সে তাহার সকল যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়াছিল।

মনোরমা জাগ্রত হইয়া দেখিল রজনী ঘোর অন্ধকারে দিক সকল আচ্ছন্ন করিয়াছে। কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল আমি স্বপ্ন দেখিতেছি না কি? আমি কি সত্য সত্যই কারাগারে বন্দিনী, অথবা আপন গৃহে শয়ন করিয়া স্বপ্ন দেখিতেছি। না, আমার এ স্বপ্ন নহে, এই যে আমার হস্ত "শৃঙ্খলাবদ্ধ" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মনোরমা শয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল—"এখন আর আমার উপায় নাই, হরি তোমার চরণমাত্র আমার ভরসা, কৃপা করিয়া একবার এই কারাগারের মধ্যে তোমার কন্যার দশা দেখ। তুমি সকলের অন্তর দেখিতে পাও, আমার যে কোন দোষ নাই তাহা তুমি বেশ জানিতেছ। ঠাকুর আমায় এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর। আমার পিতাকে রক্ষা কর, এবং তাঁহার মনে সান্ত্বনা প্রদান কর, তিনি কুশলে থাকিলে আমার অনেক ক্লেশের হ্রাস হয়।" এই কথা বলিতে বলিতে পিতার কথা মনে পড়িয়া তাহার নয়নজল প্রবলবেগে বহির্গত হইতে লাগিল। আর কথা সরিল না, নীরবে রোদন করিতে লাগিল।

শুক্ল পক্ষীয় সপ্তমী তিথির অন্ধকার ক্রমে হ্রাস হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে নয়ন তৃপ্তিকর চন্দ্রের উদয়ে দিক সকল আলোকিত হইল। গভীর রজনী,—জনমানবের সাড়া শব্দ নাই, ঝিল্লিদিগের ঝিঁ ঝিঁ শব্দে চতুর্দ্দিক পূর্ণ, বৃক্ষশাখায় জোনাকি পোকারা উড়িয়া এ ডাল ও ডাল করিতেছে, যেন শত শত মাণিক্য এক স্থানে একত্র হইয়াছে। মাঝে মাঝে কুকুরগুলা ঘেউ ঘেউ করিতেছে। আকাশে নক্ষত্রগণের প্রভা কমিয়া গেল, কেহ কেহ অদৃশ্য হইল। যে মনোরমা অন্য সময় গভীর রজনীতে নিদ্রাভঙ্গের পর আপনাদের গৃহের সম্মুখের বারাণ্ডায় বসিয়া চন্দ্র দর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিত; উন্মুক্ত বায়ু সুগন্ধ বহন করিয়া যে মনোরমার সেবা করিত আজ সে কারাগারে। মনোরমার কারাগৃহের গবাক্ষ দিয়া চন্দ্রালোক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। মনোরমা সেই আলোর সাহায্যে দেখিল কারাগারের দেয়ালগুলি, ঘরের কোণে একটা মাটির ভাঁড় ও একখানা পিতলের থাল, এবং তাহার বিছানাটী কেবল কতকগুলি বিচালিমাত্র।

মনোরমা জানালার কাছে বসিয়া চাঁদ দেখিতে লাগিল, দেখিল চাঁদখানি যেন বেগে ছুটিয়া যাইতেছে, যাইতে যাইতে চাঁদ মনোরমাকে পরিহাস করিবার জন্যই যেন কখনও বা মেঘের ভিতর লুকাইতেছে, আবার মেঘের আর এক দিক দিয়া মুখ বাড়াইতেছে। তৎসঙ্গে সঙ্গে মনোরমাও কখন দুঃখিত ও কখন উল্লাসিত হইতে লাগিল। সে বাল্যকাল হইতে চাঁদ দেখিতে ভালবাসিত সেই জন্য চাঁদ দেখিতে পাইয়া তাহার কারাক্লেশের অর্দ্ধেক বিস্মৃত হইয়া গেল। সে আপনাপনি কহিল "সুধাকর! আমি যেমন তোমায় ভালবাসি তুমিও কি আমায় সেইরূপ ভালবাস। তোমার ভালবাসা আমি বুঝিতেছি, না হইলে এই নির্জ্জন কারাগারে আসিয়া তুমি আমায় এত সুখী করিতে না। তোমায় আজ এত মলিন দেখিতেছি কেন, তুমিও কি আমার দুঃখ দেখিয়া, আমায় বন্দিনী দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছ? আমি যে এই দশায় পড়িয়া এইরূপ ভাবে তোমায় দেখিব তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। তুমি কি বলিতে পার আমার পিতা এখন কোথায় আছেন; তিনি নিদ্রিত না জাগ্রত? তিনিও কি আমার ন্যায় বিলাপ করিতেছেন? ইচ্ছা হইতেছে এখন তাঁহাকে একবার দেখি। চাঁদ! আমার পিতাকে একবার বল আমি তাঁহার জন্য কত ব্যাকুলিত হইয়াছি।"

মনোরমা এইরূপ বলিতে বলিতে হঠাৎ একটী সুন্দর গন্ধ পাইল। একি কোথা হইতে এ গন্ধ আসিতেছে। অনেকক্ষণ পরে সে দেখিল সকালে বাড়ীতে সে যে যুঁইফুল গুলি তুলিয়া কাপড়ের অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, এ তাহারই গন্ধ। মনোরমার কাছে আজ জড়বস্তুগুলি যেন চেতন হইল। তাহারা যেন শুনিতে পায়, সে এইভাবে কথা কহিল, বলিল,—"তোমরা এখন আমার সঙ্গে রহিয়াছ। তোমরাত কোন দোষ কর নি যে কারাগারে আসিবে। তবে কি তোমরা আমায় এত ভালবাস, যে আমার সহিত কারাবাস যাতনা ভোগ করিতেছ। হায় যখন আমি আজ সকালে এই ফুলগুলি তুলিয়াছিলাম তখন কে ভাবিয়াছিল যে অদ্য রাত্রে আমার এই দশা ঘটিবে! যখন রাজকুমারী হেমলতার জন্য মনের মত ফুল দিয়া সাজি সাজাইয়াছিলাম তখন কে মনে করিয়াছিল আজ আমার হস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবে। বাবা যে সর্ব্বদা বলিতেন পৃথিবীর সমস্তই অলীক ও ক্ষণস্থায়ী, কেবল ঈশ্বরই সত্য, তাহা ঠিক কথা, তখন কথাটা বুঝিতে পারিতাম না—এখন বেশ বুঝিতেছি।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আবার সে কাঁদিতে লাগিল। খানিকক্ষণ বালিকাসুলভ ক্রন্দন করিয়া কতকটা স্থির হইল। সে বাল্যকাল হইতে পিতার কাছে শিখিয়াছিল, যে বিপদে পড়িলে হরিকে ডাকিতে হয়, তাহা হইলে হরি বিপদ ভঞ্জন করিয়া দেন। তাই আজ মনোরমা ক্ষণে ক্ষণে কেবল ঈশ্বরকেই ডাকিতে লাগিল। কত কি বলিয়া ডাকিল তাহার ঠিকানাও নাই—নিয়মও নাই কেবল সরলভাবে বালক ধ্রুবের মত হরিকে ডাকিল। কখনও বা পিতার কথা ভাবিয়া নয়ন জলে আপনার বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিল।

এই সময়ে একখানি কাল মেঘে চাঁদটা ঢাকিয়া ফেলিল। মনোরমা আর কিছুই দেখিতে পাইল না। তাহার যে টুকু আনন্দের ভাব

উদিত হইয়াছিল তাহাও নিভিয়া গেল। সে ভাবিল চাঁদ যেমন মেঘের নীচে চিরদিন ঢাকিয়া থাকিবে না নির্দ্দোষীর প্রতি মিথ্যা অপবাদও সেইরূপ অধিক দিন থাকিবে না। দয়াময় হরি অসত্যের আঁধারে সত্যকে আবৃত রাখেন না, পিতার এই কথাটাও ঠিক। আমি যে নির্দ্দোষী নিশ্চয়ই একদিন না একদিন তাহা প্রকাশ হইবে এই চিন্তায় সে মনে বল পাইল।

এইরূপ বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে করিতে মনোরমা আবার ঘুমাইয়া পড়িল, আহা তাহার ক্ষুদ্র প্রাণে কত সহ্য হইবে! জগদীশ্বর আর তাহার কষ্ট দেখিতে পারিলেন না। দুঃখহারিণী নিদ্রাকে তাই বালিকার সান্ত্বনার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। মনোরমা প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বে একস্বপ্ন দেখিল যে, সে যেন কোন অভিনব ও রম্য উদ্যানে চাঁদের আলোকে বেড়াইতেছে। বাগানের শোভার কথা বর্ণনা করা যায় না, মনোরমাও এত উজ্জ্বল চাঁদও দেখে নাই। তাহার পিতা সেই বাগানে বেড়াইতেছেন। সে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে—পিতার চরণে পড়িল। পিতা তাহাকে আদর করিয়া তুলিলেন, আর অমনি ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া দেখে নয়নজলে গণ্ডস্থল প্লাবিত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত—

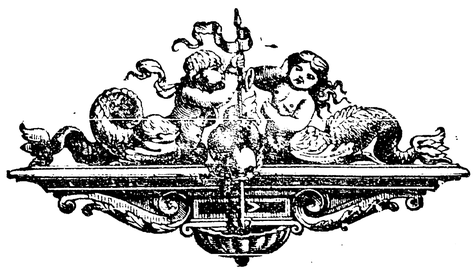

ধ্রুবোপাখ্যান।

অতি প্রাচীন কালে এ দেশে উত্তান পাদ নামে এক রাজা ছিলেন। সুনীতি ও সুরুচি নামে তাঁহার দুই রাণী ছিল। বহু বিবাহের জঘন্য প্রথা এখনও এদেশে প্রচলিত আছে। সুনীতি অতি ধর্ম্ম পরায়ণা, পতিব্রতা, ক্ষমাবতী, বিনয়ী, ও সকল গুণবিশিষ্টা; স্ত্রীলোকের যত গুণ থাকিতে হয় সুনীতির তাহা ছিল। সুরুচি অহঙ্কৃত, হিংসুক, উদ্ধত স্বভাব, রাগী, কর্কশ ভাষিনী এবং অভিমানিনী ছিলেন। সুরুচি সুনীতিকে ভাল বাসিতেন না ও তাঁহাকে অতিশয় হিংসা করিতেন;—ও সর্ব্বদাই সুনীতির নামে রাজার কাছে দোষ গাইতেন। কিছুদিন পরে অল্প বুদ্ধি রাজা সুরুচির বশীভূত হইয়া সুনীতিকে অরণ্যে পাঠাইলেন। ইতিপূর্ব্বে নরপতি উত্তান পাদের মহিষী সুরুচির গর্ভে উত্তম ও সুনীতির গর্ভে ধ্রুব নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। সুনীতি সেই প্রাণ ধন ধ্রুবকে দেখিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া অরণ্য মধ্যে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। যখন সুনীতি দুঃখ চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন, তখন ধ্রুব আসিয়া মা, মা, বলিয়া কোলে বসিয়া আধ আধ বাক্যে খেলিবার ঘটনা গুলির পরিচয় দিতেন; সুনীতি বালকের আধ আধ বচনে সকল দুঃখ ভুলিয়া তাহাকে কোলে লইতেন। ধ্রুব পাঁচ বৎসরের হইল। একদিন ধ্রুব ঋষি-কুমারদের সহিত খেলা করিতেছেন এমন সময় একটী বালক বলিল, ভাই ধ্রুব! তুমি উলঙ্গ হইয়া খেলা করিতে আসিয়াছ, আমরা তোমায়

লইয়া খেলিব না; কাপড় পরিয়া এস তবে তুমি খেলিতে পাইবে। তখন বালক বিষণ্ণ বদনে দুঃখিনী জননীর নিকট গিয়া কহিল;—"মা! আমার কাপড় নাই বলিয়া কুমারগণ আমার সহিত খেলা করিবে না, আমার কাপড় দেও।"

সুনীতি আপনার কাপড় হইতে একটু ছিঁড়িয়া দিলেন, সেই কাপড় লইয়া ধ্রুব মাথায় বাঁধিয়া খেলিবার স্থলে গেলেন। ঋষিকুমারগণ দেখিবামাত্র হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, বোকা ছেলে কাপড় কি মাথায় বাঁধে? তখন তাহাদের মধ্যে একজন বলিল এস ধ্রুব আমি তোমায় কাপড় পরাইয়া দি। এই বলিয়া সেই ছেড়া নেক্‌ড়া খানি পরাইতে গিয়া দেখিল সেখানি এত ছোট যে কোন মতে পরান যায় না। সে ধ্রুবকে বলিল, ধ্রুব ইহা অপেক্ষা বড় কাপড় লইয়া আইস। ধ্রুব ছুটিয়া গিয়া বলিল মা, আমায় বড় কাপড় দেও। দুঃখিনী মাতা নিজ কাপড়ের আর একটু ছিঁড়িয়া দিলেন। ধ্রুবও কাপড় লইয়া বালকদিগের নিকটে গেলেন। বালকেরা বলিল তুমি রাজার পুত্র হইয়া কাপড় পরিতে পাওনা; ধ্রুব বলিল ভাই আমার কি পিতা আছেন? আমি ত মা বই কিছুই জানি না। তাহারা বলিল মহারাজ উত্তান পাদ তোমার পিতা; চল তোমার পিতার কাছে যাই তাহা হইলে তিনি উত্তম বসন দিবেন। এই বলিয়া বালকগণ ধ্রুবকে সঙ্গে লইয়া রাজ বাটীতে গমন করিয়া দেখিলেন মহারাজ সুরুচির পুত্র উত্তমকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন। ধ্রুবের সুন্দর মুখ খানি দেখিবামাত্র রাজারও মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। তিনি মনে ভাবিলেন আমি অবিচারে যে শিশু সন্তান সহিত সুনীতিকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলাম এই সেই বালক। আমার অঙ্গ সৌষ্ঠব বালকের মধ্যে অনেক আছে। ইহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে এই সেই সুনীতির পুত্র। এই মনে ভাবিয়া মহারাজ ধ্রুবকে স্নেহ ভরে কোলে করিবার জন্য বাহু বিস্তার করিলেন। ধ্রুবও পিতার কোলে উঠিতে গেলেন। এমন সময়ে হিংসুক সুরুচি আসিয়া রাগভরে ধ্রুবকে বলিলেন; "অবোধ বালক তুমি অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত হইয়া এ বৃথা উচ্চ মনোরথ করিতেছ কেন? আমার উদরে তুমি জন্ম গ্রহণ না করিয়া তোমার এই বৃথা উচ্চ আশা করা তোমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। তুমি নিতান্তই অবোধ বলিয়া অতি দুর্লভ বিষয়ে আশা করিতেছ; তুমি কি জান না যে সুনীতির উদরে তোমার জন্ম। সত্য বটে তুমি রাজার পুত্র কিন্তু আমি ত তোমায় গর্ভে ধরি নাই। আমার পুত্রের ন্যায় তোমার এরূপ বৃথা আশা কেন।" বিমাতার এই প্রকার হৃদয়-ভেদী কর্কশ বাক্য শুনিয়া তাহার কোমল হৃদয়ে তীক্ষ্ণ শরের ন্যায় বিদ্ধ হইল। ধ্রুব তৎক্ষণাৎ অধোবদনে তথা হইতে প্রস্থান করিল। এদিকে সুনীতি পুত্রের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া অতিশয় চঞ্চলা হইলেন। এমন সময় ধ্রুবকে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতে দেখিয়া সুনীতি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কোলে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস আজ তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন? কেনই বা অভিমান ও রাগ ভরে আসিলে? কে তোমায় অপমান করিয়াছে? কে তোমায় অনাদর করিয়াছে? "তখন ধ্রুব অভিমানে ফুলিতে ফুলিতে যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমস্তই বর্ণনা করিল। অনন্তর ম্লানবদনা দুঃখিত-হৃদয়া সুনীতি উপদেশ বাক্যে পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন; "বাপধন! কাঁদিওনা এ পৃথিবীতে মানুষ নিজ কার্য্যের গুণে বড় হয়। যদি বিমাতার কথায় বড় ক্লেশ পাইয়া

থাক তবে পুণ্য লাভ করিবার জন্য যত্ন কর; পুণ্য লাভ করিলে সকল ফল লাভ করিবে।" ধ্রুব জিজ্ঞাসা করিলেন "মা! আমাদের দুঃখ কে নিবারণ করিবে;" সুরুচি বলিলেন—"বাছা! সর্ব্বদুঃখ হারী ভগবান আমাদের দুঃখ দূর করিবেন।" পুত্র জিজ্ঞাসা করিল "ভগবানকে কোথায় পাইব?" জননী বলিলেন "তিনি সর্ব্বত্রই আছেন। যেখানে গিয়া ডাক পাইবে।" এই কথা বলিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার মনে বড় ভয় হইল কি জানি অভিমানে বালক কি করিয়া বসে। এই মনে করিয়া জননী আবার বলিলেন "বাছা! তিনি অরণ্য মধ্যে থাকেন সেখানে কেহ যাইতে পারে না, সে স্থান মনুষ্যের অগম্য।" এই বলিয়া দুঃখিনী সুনীতি পুত্র কোলে করিয়া রজনীতে শয়ন করিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে সুনীতি নিদ্রাভিভূতা হইলেন। ধ্রুব সেই অবসরে উঠিলেন, উঠিয়া মাতার চরণ বন্দনা করিলেন ও দুঃখিনী মাতাকে না জাগাইয়া কুটীর হইতে নিবিড় বনে গমন করিলেন। অরণ্যে গিয়া ধ্রুব কোথায় দুঃখহারী পরমেশ্বর দেখা দেও, বলিয়া চীৎকার করিয়া আকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। এক একবার ঝড় উঠিতেছে আর ধ্রুব মনে করিতেছেন এই বুঝি আমার হরি। পুরাণে কথিত আছে বালক ধ্রুব সরল প্রাণে অরণ্য মধ্যে এইরূপ বলিতেছেন। হিংস্র জন্তুগণ তাঁহার কাছে আসিয়া তাহার সরলতা দেখিয়া তাহাদের স্বভাব ভুলিয়া কিছু বলিতেছে না। এদিকে সুনীতি নিদ্রাভঙ্গের পর তাঁহার প্রাণের ধ্রুব কাছে নাই দেখিয়া পাগলিনীর ন্যায় ইতস্ততঃ অন্বেষণ আরম্ভ করিলেন। ধ্রুব ধ্রুব করিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এদিকে ধ্রুব কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে নারদমুনি আসিয়া তাঁহার নিকট দেখা দিলেন। তিনি আসিবামাত্র ধ্রুব তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন, তিনি হস্ত উত্তোলন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বলিলেন "ধ্রুব আমরা এতদিন ধরিয়া তপস্যা করিলাম, আমরা যাঁহাকে পাইলাম না তুমি সামান্য বালক হইয়া তাঁহাকে কিরূপে পাইবে? বৎস! যাহা সিদ্ধ হইবার নয় তুমি সে আশা ত্যাগ কর; তোমার দুঃখিনী মাতার নিকট যাও।" ধ্রুব বলিলেন "প্রভু আমি হরিকে না পাইলে ত গৃহে যাইব না।"

নারদ বলিলেন "তুমি দ্বাদশ বৎসর তপস্যা কর তবে হরিকে পাইবে।" একদিন তপস্যা করিতে করিতে তাঁহার প্রাণের হরি তাহাকে দেখা দিলেন। বালকের এত আনন্দ হইল যে তিনি বাহ্য জ্ঞান রহিত হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তখন ঈশ্বর তাঁহাকে বলিলেন "বৎস ধ্রুব! তোমার প্রার্থনায় আমি পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে বরদান করিতে আসিয়াছি। এক্ষণে বর প্রার্থনা কর।" বালক দয়াময়ের এই কথা শুনিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া বলিলেন "প্রভু! আমি আর কিছুই চাই না আমার প্রার্থনায় তুমি যদি পরিতুষ্ট হইয়াছ তাহা হইলে আমি ইচ্ছানুসারে তোমার স্তব করিতে পারি ঈদৃশ বরদান কর। কারণ পণ্ডিতেরাও তোমার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই আর আমি সামান্য বালক হইয়া স্তব করিতে কি করিয়া সমর্থ হইব। হে পরমেশ্বর! আমি যাহাতে তোমার ভক্ত হইতে পারি ও তোমার শ্রীচরণ পূজা করিতে পারি এইরূপ বর প্রদান কর।" দয়াময় ঈশ্বর সদয় হইয়া বলিলেন "বৎস তুমি নয়ন খুলিয়া আমায় বাহিরেও দেখ।" তিনি বলিলেন "না প্রভু আমার ভয় হইতেছে চক্ষু খুলিলে আমি আর তোমায় দেখিতে পাইব না। আমি অনেক

দুঃখে তোমায় পাইয়াছি আর ছাড়িতে পারিব না।" হরি যখন দেখিলেন বালক কিছুতেই চক্ষু খুলিল নাতখন তিনি আপনার রূপ লুকাইলেন। ধ্রুব চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া প্রভো কোথায় গেলে বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পরে নয়ন খুলিয়া দেখেন বাহিরেও হরি বিরাজমান।—

দয়াময় হরি বলিলেন "ধ্রুব তুমি কি চাও", ধ্রুব বলিলেন "প্রভো আমি আর কিছুই চাই না, আমি যখন মনে করিব তখন যেন তোমায় দেখিতে পাই।" ভক্ত বৎসল হরি তথাস্তু বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। ধ্রুব আবার কিছুক্ষণ পরে তাঁহার স্মরণ করিলেন। তিনি আবির্ভাব হইয়া বলিলেন বৎস, "আমায় আবার কেন ডাকিলে?" তিনি বলিলেন "আমি যে মার নিকট যাইতেছি মা যখন জিজ্ঞাসা করিবেন 'কৈ বাছা কি পাইয়াছ' আমি তখন কি বলিব? আমার মাকে তোমার দেখা দিতে হইবে।" তিনি কহিলেন "বাছা! তুমি কঠোর তপস্যা করিয়া আমায় পাইয়াছ, সুনীতি আমায় কিছুই সাধনা করেন নাই। আমি কি করিয়া তাঁহাকে দেখা দিব!" ধ্রুব বলিলেন "না প্রভু তাহা কখনই হইবে না, আমার মাকে দেখা দিতে হইবে।" তিনি তথাস্তু বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। ধ্রুব প্রথমেই রাজবাটীতে গমন করিলেন, তথায় গিয়া প্রথমে বিমাতার চরণে প্রণাম করিলেন; সুরুচি তাঁহাকে দেখিবামাত্র কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার দোষ মনে করিয়া ধ্রুবের মুখচুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপ ধ্রুব! আমি নিতান্ত পাপীয়সী ও নিষ্ঠুরা, আমি তোমার কোমল হৃদয়ে অনেক কষ্ট দিয়াছি। ধ্রুব বলিলেন মা তোমার কিছুই দোষ নাই, তোমার জন্যই আমি হরি পাইয়াছি।

ধ্রুব পিতার চরণে প্রণাম করিলেন, মহারাজ বিলাপ করিয়া কহিলেন ধ্রুব! হায় আমি কি পাপিষ্ঠ! হায় কি নরাধম! কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা শান্ত হইয়া সুনীতিকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। সুনীতি রাজসদনে আসিয়া পাগলিনী প্রায় হইয়া কহিলেন আমার হারানধন ধ্রুব কোথায়! আয় বাপ কোলে আয়! মা বলিয়া ডেকে আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর। সুনীতি পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন তবে বাছা তোমার দয়াময় হরিকে দেখাও। ধ্রুব ভগবানের স্তব করিবামাত্র মাতারও জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া গেল। তিনিও সেই দয়াময় হরিকে অন্তরে দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন।

সতীশ সকলের অপ্রিয় কেন?

সতীশের বাপ মা বড়লোক, সতীশ তাঁহাদের একমাত্র সন্তান। কিন্তু বড় মানুষের ঘরে একটী মাত্র ছেলে থাকিলে তাহার যেরূপ আদর হয় সতীশ সেরূপ আদুরে ছেলে ছিলেন না। পিতা মাতা যে ছেলেকে আদর করেন না, অন্যলোকে স্বভাবতঃই তাহাকে যত্ন করে না, সুতরাং সতীশ সকলেরই অপ্রিয়। বড়মানুষের ঘরে খাইবার অভাব নাই, পরিবার অভাব

নাই, দাস দাসীর অভাব নাই। সতীশ যখন যাহা চাহিতেন তখনই তাহা পাইতে পারিতেন। কিন্তু সতীশের একটী রোগ ছিল, তিনি খাওয়া পরাতে বড় একটা মন দিতে পার্‌তেন না, অন্যান্য বড়লোকের ছেলেদের ন্যায় দাস দাসীকে কর্কশ কথা কহিতে জানিতেন না, সাজ গোজ করিয়া বড় মানুষের ন্যায় চলিতে ফিরিতে ভাল বাসিতেন না। সতীশের মা সতীশকে ভাল ভাল খাবার দিতেন, সতীশ আপনি অল্প কিছু খাইয়া পাড়ার গরিব ছেলেদের জন্য অবশিষ্ট লইয়া যাইতেন।

সতীশের মা সতীশকে নানা প্রকার বহুমূল্য পোষাক কিনিয়া দিতেন, সতীশ সামান্য ধুতি চাদর জামা পরিয়া বেড়াইতেন এবং কখনো কখনো সেই সামান্য ধুতি জামাও রাস্তার গরিব বালককে দিয়া চাদর পরিয়া ঘরে আসিতেন।

সতীশের মা কাছে বসিয়া এটা খা, ওটা খা, আর একটু দিই ইত্যাদি স্নেহের কথায় সতীশকে ভাল ভাল সামগ্রী খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেন, সতীশ এর একটু তার একটু মুখে দিয়া তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিতেন। সতীশের মা চটে লাল। তিনি কখনো রাগ করিয়া সতীশকে গালাগালি করিতেন, সতীশ নীরবে চলিয়া যাইতেন। সতীশের মা যদি কখনো দুঃখ করিয়া বলিতেন "হারে হতভাগা, তোর এমন দশা কেন হলো, তুই কারুর চাকুরী করিস্‌নে, কোন ভাবনা নাই চিন্তা নাই, তবে কেন দুটী খাইবার সময় অমন চঞ্চল হয়ে চলে যাস্‌?" সতীশ প্রায়ই মাতার কথায় কোন উত্তর করিতেন না, তবে মাতার ক্লেশ নিবারণের জন্য বলিতেন, "মা, তোমরা ঘরে থাক, কোথায় কি হইতেছে কোন সংবাদ রাখ না, আমরা দশ যায়গায় যাই, লোকের দুঃখ দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া প্রাণে বড় ক্লেশ পাই। অনেক দূরে যাইতে হইবে না, আমাদের পাড়ার নবীনদের কি কষ্টেই দিন যাইতেছে! নবীন, গোপাল দুইটী ছেলেকে লইয়া নবীনের মা বেচারী কত দুঃখেই দিন কাটাইতেছেন। মা, আমি প্রায়ই দেখি তাঁদের দুবেলা সমানে দুটী ভাত জোটে না। হায়! লোকের শুধু দুটী ভাত জোটে না আর আমরা কত ভাল ভাল খাবার ফেলিয়া ছড়িয়া নষ্ট করি।" এইরূপ বলিতে বলিতে সতীশের মুখ লাল হইত ও চক্ষু জলে পূর্ণ হইত। সতীশের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়াও কিন্তু সতীশের মা সুখী হইতেন না। বালক সতীশের আর একটী দোষ ছিল, তিনি মাছ মাংস খাইতে চাহিতেন না। সতীশের বাবা নিজে মাছ মাংস খাইতে ভাল বাসিতেন। এমন কি অন্যে না খাইলে তাহাকে নানা উপদেশ দিয়া খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেন। তিনি ভাবিলেন, সতীশ আজ কালকার নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী বাবুদের কথা শুনিয়াই বা এইরূপ করে। তিনি সতীশকে নানা প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, অধিক কি প্রহার করিয়া দেখিলেন, কিছুতেই সতীশের মত ফিরাইতে পারিলেন না। অবশেষে যখন মিষ্টকথায় সতীশের বাবা সতীশের মৎস্য মাংসের প্রতি ঘৃণার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, সতীশ তখন মুখ খানি মলিন করিয়া বলিলেন, "মাছ মাংস খাইতে আমার ক্লেশ হয়, প্রাণের মধ্যে যেন কেমন করে, মাছ মাংস খাইয়া কখনও আমার সুখ হয় না।"

সতীশের বাবা সতীশকে বড়লোকের ছেলেদের সঙ্গে মিশিতে বলিতেন, সতীশ পাড়ার যত সব গরিবলোক, "ছোটলোকের" ছেলেদের

সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের নানা উপকার করিতেন। সতীশের এইরূপ স্বভাব দেখিয়া দিন দিনই তাঁহার বাপ মা বিরক্ত হইতে লাগিলেন, বংশের কলঙ্ক স্বরূপ মনে করিয়া সতীশের বাবা সতীশের বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ ও উদাসীন হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা সতীশকে যে ভাবে মানুষ করিবেন ভাবিয়াছিলেন সতীশ সেরূপ হইতে পারিল না, সতীশের প্রকৃতিই সেরূপ নহে। সতীশের চলন ফেরন, সাজগোজ সকলই সামান্য লোকের ন্যায়। পাড়ার মধ্যে সতীশের বাবা ধনে মানে সকলের চেয়ে বড়লোক, সুতরাং সতীশের এইরূপ ব্যবহারে পাড়ার স্ত্রীলোক পুরুষ সকলেই সতীশের প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হায়রে, সতীশ ছোঁড়াটা একেবারে বয়ে গেল।" ক্রমে সতীশের যত বয়স বাড়িতে লাগিল তত আরো অনেক দোষ বাহির হইতে লাগিল। খুব ভোরে উঠিয়া সতীশের একটু বেড়াইবার অভ্যাস ছিল, স্কুলের ছুটীর পরে কিছু খাইয়া ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিবার নিয়ম ছিল। পাড়ার কুড়ে ছেলেদিগকে সতীশ ভোরে যাইয়া জাগাইতেন এবং সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে যাইতেন। স্কুলের পরে তাস ইত্যাদি কুড়ে খেলায় যে সকল বালক সময় নষ্ট করিত সতীশ তাহাদিগকে লইয়া দৌড়াদৌড়ি খেলিতেন। সতীশের এইরূপ আচরণে কিন্তু পাড়ার লোক চটিয়া উঠিল। "সতীশটা নিজে বয়ে গেছে, পাড়ার ছেলে গুলিরও পরকাল খাইবে" এইরূপ অপবাদ দিয়া পাড়ার অভিভাবকগণ ছেলেদিগকে সতীশের সঙ্গে মিশিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। এইরূপে কি পিতা মাতা, কি প্রতিবাসিগণ কাহারো নিকটে সতীশের আদর নাই। কেবল একজন লোক ছিলেন যাঁহার নিকটে সতীশের অনেক আবদার খাটিত, কেবল একটী স্থান ছিল যেখানে সতীশের অনেক আদর ছিল। সে লোকটী সতীশের স্কুলের মাষ্টার, সে স্থানটী সতীশের স্কুল। নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে যাইয়াই সতীশ স্কুলে উপস্থিত হইতেন। স্কুল বসিবার পূর্ব্বে ছেলেরা প্রায়ই স্কুল কমপাউণ্ডের চারি দিকে খেলা করে। এই খেলায় অনেক সময়ে রক্তপাতও হইয়া থাকে। কিন্তু সতীশের কাছে কখনো অন্যায় হইবার যো ছিল না, সবল দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিবে ইহা সতীশ কখনো সহ্য করিতে পারিতেন না। এজন্য অনেক সময়ে সতীশকে দুর্ব্বল ছেলেদের পক্ষে মারামারি করিতে হইত। অত্যাচারী দুষ্ট ছেলেরা সর্ব্বদাই সতীশের দোষ খুঁজিয়া বেড়াইত, এবং অকারণেও শিক্ষকের নিকটে সতীশকে অপদস্থ করিতে ছাড়িত না। দুষ্ট ছেলেদের স্বভাব এত নীচ যে, তাহারা ক্লাশে বসিয়া এক জন অন্যকে চিম্‌টি কাটিতেছে, আর ছাইমাটি লইয়া সর্ব্বদা ঝগড়া করিয়া শিক্ষককে অস্থির করিয়া তুলিতেছে। অথচ দোষ করিয়া শিক্ষকের নিকটে স্বীকার করিবার সাহস নাই কাজেই একটী দোষ ঢাকিতে দশটী মিথ্যা কথা বলিয়া পার পাইবার চেষ্টা করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না। কিন্তু সতীশের স্বভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গঠিত। সত্য কথা বলাই সতীশের স্বভাব ছিল, দোষ করিয়া স্বীকার করাই তাঁর অভ্যাস ছিল, এবং সমপাঠী বালকগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করা তাঁহার আনন্দ ছিল। সমপাঠী বালকগণের মধ্যে অনেকেই, তিনি সত্যকথা কন বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই মাষ্টারের নিকটে সকল কথা বলিয়া ফেলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিল এবং অনেক সময়ে তাঁহার নামে

মিথ্যা অপবাদ দিত, কিন্তু তিনি কিছুই করিতেন না এবং সর্ব্বদা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া চলিতেন।

পূজার ছুটী হইল। সতীশের বাপ মা পশ্চিম বেড়াইতে যাইবেন, সতীশকেও কাজেই পিতা মাতার সঙ্গে যাইতে হইল। পূজার সময়ে হাবড়ার ষ্টেসনে বড় ভিড়। টিকেট মাষ্টারের বাক্সের সম্মুখে গায় গায় ঘেঁসাঘেঁসি হইয়া লোক দাঁড়াইয়াছে, জোর যার আমল তার। সবল লোক দুর্ব্বল লোককে পেছনে ঠেলিয়া ফেলিয়া আগে টিকেট লইতেছে। যাহাদের পয়সা আছে এবং ঘুশ দিতে বিবেকে বাধিতেছে না তাহারা আগে টিকেট পাইবার আশায় সম্মুখস্থ পাগ্‌ড়ীধারী চাপরাসী মহাশয়দিগকে দুই চারি পয়সা জলপানি দিয়া কাজ সারিয়া লইতেছে। সতীশদের টিকেট লইবার জন্য বাড়ীর গোমস্তা ভিড়ের মধ্যে গিয়াছে, সতীশ ষ্টেসনের ভিতরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছেন। টিকেট মাষ্টারের ডান দিকে চাপ্‌রাসী দুই জন দাঁড়াইয়া আছে, কোন ভিড় নাই, যাহারা চাপ্‌রাসী ভায়াদের খুসী করিতেছে তাহাদিগকেই টিকেট মাষ্টারের সম্মুখে সহজে যাইতে দিতেছে, বামদিকে বড় ভিড়। একজনের পরে আর একজনকে যাইতে হইতেছে, এদিকে রেল ছাড়িবারও সময় হইল। একটী স্ত্রীলোক, বোধ হয় তাহার সঙ্গে আর কেহ ছিল না, কোননগর ষ্টেসন পর্য্যন্ত টিকেট করিবে, অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বেচারী চাপরাসীদের নিকট দিয়া টিকেট মাষ্টারের নিকটে যাইতেছিল। চাপরাসীগণ বোধ হয় স্ত্রীলোকের নিকটে পয়সা চাহিয়া থকিবে। কিন্তু চাহিলে কি হইবে স্ত্রীলোকটী শুদ্ধ রেলভাড়ার পয়সা কয়েকগণ্ডা আচলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। স্ত্রীলোক চাপ্‌রাসীর নিকটে হাত জোড় করিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিল, চাপরাসীদের সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই, দুই তিন বার চাপরাসীগণ তাঁহাকে গলাধাক্কা দিয়া বাহিরে আনিল। সতীশ এতক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, আর সহ্য হইল না, তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে চলিয়া গেলেন, সতীশ চাপরাসীগণকে বলিলেন, "ইহাকে যাইতে দেও" চাপরাসীগণ হাসিতে হাসিতে বলিল "দেব না," সতীশ বিরক্ত হইয়াও গম্ভীরস্বরে বলিলেন, ভালচাও ত ছাড়িয়া দাও, অমনি চাপরাসীদের একজনে তাঁহার হাত ধরিবার উপক্রম করিল। সতীশ আত্মরক্ষার্থ তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইলেন ও সজোরে ঐ ব্যক্তির মুখে একটী ঘুষি মারিলেন। চাপরাসী বুঝিল, বালক বলিয়া যাহাকে উপহাস করিয়াছিল সে বালক সামান্য বালক নয়। "পুলিস" "পুলিস" রব উঠিল। মূহুর্ত্তের মধ্যে পুলিস সবইন্‌স্পেক্টর ষ্টেসন মাষ্টার প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। সতীশের বাবাও ষ্টেসনের ভিতরে ছিলেন, তিনিও আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সতীশকে ভিড়ের মধ্যে মিশাইয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিলেন, সতীশ বীরেরন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। সতীশের বাবা চাপরাসীদের অত্যাচার ও সতীশের প্রতি আক্রমণের কথা বলিয়া সতীশকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সতীশ ষ্টেসন মাষ্টারের নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। ষ্টেসন মাষ্টার ইংরাজ। সতীসের সত্য কথায় ও সাহসে খুসী হইয়া সতীশকে ধন্যবাদ দিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

এই সকল কারণেই সতীশের বাপমা সতীশের প্রতি বিরক্ত ছিলেন, সতীশের এইরূপ আচরণ দেখিয়াই সতীশের প্রতিবাসিবর্গ সতীশকে "দুরন্ত জেঠা ছেলে" ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি করিতেন। কিন্তু সতীশের শিক্ষক এই সকল গুণ দেখিয়াই সতীশকে ভাল বাসিতেন। সখার পাঠক পাঠিকাগণ! তোমরা সতীশের বিষয় কি বল?

মশা।

আমরা ছেলে বেলা মশার বাসা খুজিতে যাইতাম। ঢেকী গাছে মশা বাসা করে এই আমাদের বিশ্বাস ছিল। লাল রঙের এক প্রকার বড় পিপড়ে যেমন গাছের পাতা দিয়া বাসা প্রস্তুত করে, ঢেকী গাছে সেই রূপ অতি ক্ষুদ্র বাসা পাওয়া যায়। এ গুলি কিসের বাসা তাহা আমি আজিও জানিতে পারি নাই, কিন্তু আমার ছেলে বেলা এই সংস্কার ছিল যে এ গুলি মশার বাসা বই আর কিছুই নহে। বাস্তবিক এই সকল বাসার প্রায় প্রত্যেকটীতে এক একটী করিয়া মশা পাওয়া যায়।

যে সকল মশা আমাদের রক্ত খাইতে আইসে তাহারা সকলেই স্ত্রী মশা। পুরুষ মশা নিরীহ লোক; সে ফুলের মধু খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহাদের স্ত্রী পুরুষের মুখের গঠনেরও কতকটা তফাৎ আছে।

ডিম পাড়িবার সময় হইলে স্ত্রী মশা উপযুক্ত একটী জলাশয় খুজিয়া লয়। নির্জ্জন পুকুরগুলি এই কার্য্যের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট স্থান। কিন্তু তিন চারিদিন ধরিয়া ঝী যে জলের হাঁড়ি ঘরের কোণে রাখিয়া দিয়াছে, তাহার খোজ পাইলেও মশার মা নিতান্ত দুঃখিত হইবে না। একেবারে অনেক গুলি ডিম পাড়া হইবে। পেছনের দুই খানি পায়ের সাহায্যে ডিম গুলিকে একত্র করিয়া একটী ক্ষুদ্র নৌকার আকারে (১নং) সাজান হইবে; এই নৌকাটী জলে ছাড়িয়া দিলেই সে ভাসিতে থাকিবে। ডিমের সরু দিকটা উপরে থাকে,

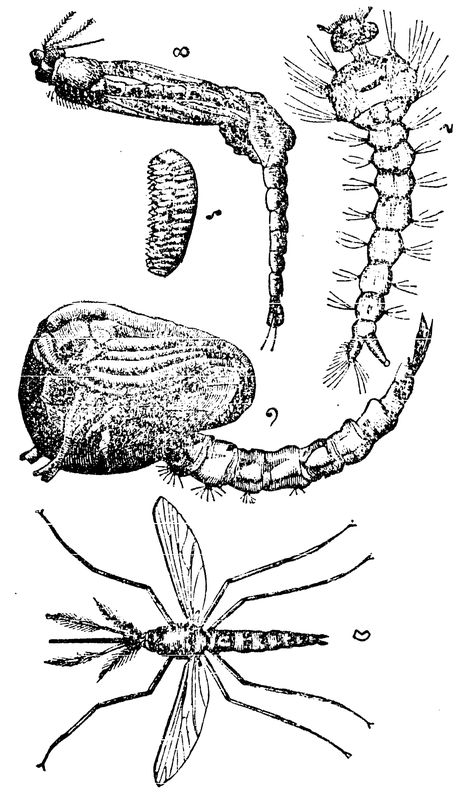

সুতরাং কিরূপে নৌকার আকার হয় তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। উপযুক্ত সময় হইলেই ডিম ফুটিয়া মশার ছানা বাহির হয়। এই সময়ে এ গুলিকে দেখিলে কেহই মনে করিতে পারে না যে, ইহারাই কালে মশা হইয়া মানুষ খাইতে আসিবে। তোমরা নিশ্চয়ই গরমির দিনে স্থির জলে মশার ছানা গুলিকে তিড়িং তিড়িং করিয়া নাচিতে দেখিয়াছ; কিন্তু তাহাদিগকে চিনিতে

পার নাই। ছবিতে যে কতকটা শুঁয়ো পোকার ন্যায় একটা চেহারা (২নং) আঁকা হইয়াছে,তাহাই মশার ছানা। ডিম হইতে বাহির হইয়া ইহারা জলে খেলা করিতে থাকে। ঝী অনেক সময় না দেখিয়া খাবার জলের সহিত গেলাসে করিয়া যে কতগুলি পোকা আনিয়া দেয় তাহা এই মশার ছানা। ইহাদের নিঃশ্বাস ফেলিবার যন্ত্র ল্যাজের কাছে। নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় ল্যাজের অগ্র-ভাগটী জলের উপরে ভাসাইয়া দিয়া ঝুলিতে থাকে। চোয়ালে এক প্রকার লোম আছে,সেই লোমগুলি কেমন করিয়া যেন জলের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত্ত প্রস্তুত করে। সেই আবর্ত্তে ঘুরিয়া নানা রকমের খাদ্যাখাদ্য আসিয়া মুখের ভিতর পড়ে। মশার ছানা এই উপায়ে জীবন ধারণ করে।

তিনবার চর্ম্ম পরিবর্ত্তনের পর ইহার আর এক প্রকারের আকার(৩নং)ধারণ করে,তাহাতে মশার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি মোটামুটি সকলই বর্ত্তমান থাকে। কিছুকাল পরে পূর্ণাবয়ব মশা(৪,৫নং)ইহার ভিতর হইতে বাহির হয়। খোলসটা জলের উপর ভাসিতে থাকে; মশা তাহারই উপর বসিয়া উড়িবার জন্য যথেষ্ট বল লাভের অপেক্ষা করে। অল্পক্ষণ রোদ বাতাস লাগিলেই তাহার হাত পা শক্ত হয়। তখন সে শূন্যে উড়িয়া অপরাপর সঙ্গীদের সহিত খেলা করে।

মশাগুলি বড় লোভী। গায় বসিবামাত্রই যদি তাহাকে তাড়াইয়া না দেও তবে সে আস্তে আস্তে শুড়টী চামড়ার ভিতর ঢুকাইয়া দিবে। রক্ত খাইতে খাইতে সে এতই আরাম পায় যে শেষে আর তাহার বাহ্যজ্ঞান থাকে না—আমরা এত খাইলে বোধ হয় খবরের কাগজ ওয়ালারা এত দিন আমাদের নাম ছাপিয়া দিত। যখন গায় বসে, তখন দেখিবে যে, তাহার শরীরটী ছুঁচের অগ্রভাগের ন্যায় সরু। ক্ষুধায় তাহার এই দশা হইয়াছে; কিন্তু কিছু কাল তাহাকে খাইতে দাও, দেখিবে শীঘ্রই সে ফুলিয়া উঠিবে, তাহার পেটটী লাল হইয়া আসিবে। এই সময়ে তাহার দুই পাশে আঙুল দিয়া চাপিয়া সেই স্থানের চামড়া টান করিয়া ধরিলেই সে আট্‌কিয়া পড়ে। শুঁড়টী ঢুকাইবার জন্য যে ফুটো করিতে হইয়াছিল চামড়া টান করিয়া ধরিলে সেই ফুটো সরু হইয়া যায়। সুতরাং শুঁড় আর বাহির হইতে পারে না। রাত্রিকালে মশারির ভিতর দুই একটী মশা যোগাড় যন্ত্র করিয়া প্রায়ই ঢুকিয়া যায়। সকাল বেলা আর তাহারা উদর লইয়া চলিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় অনেক মশাকে ধরিয়া টিপিয়া মারা গিয়াছে।

একটী গল্প বলিয়া শেষ করিতেছি। গল্পটী বোধ হয় সত্য নহে, কিন্তু ইহাতে মজা আছে। কতকগুলি আইরিস সাহেব একবার এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা কখনও মশা দেখেন নাই, সুতরাং প্রথমে মশারি কিনেন নাই। রাত্রিতে শুইয়াই বুঝিতে পারিলেন যে এদেশের কাণ্ড কারখানা অন্য রকম। অনেক ধমকাইলেন, অনেক বার হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ভয় দেখাইলেন, দাঁত খিচাইলেন কিন্তু মশারা কোন মতেই ভয় পাইল না। অবশেষে লেপদ্বারা সর্ব্ব শরীর ঢাকিয়া কিয়ৎ কালের জন্য নিরাপদ হইলেন। কিছুকাল পরে একজন লেপের এক কোণ সরাইয়া দেখিলেন যে ঘরের ভিতর একটা জোনাকী পোকা আসিয়াছে। দেখিয়াই তিনি "চ্যাঁচাইয়া উঠিলেন" ওরে আর রক্ষা নাই। লেপ মুড়ি দিয়া কি করিবে? ঐ দেখ জানোয়ার গুলির একটা লণ্ঠন লইয়া আমাদিগকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে!"

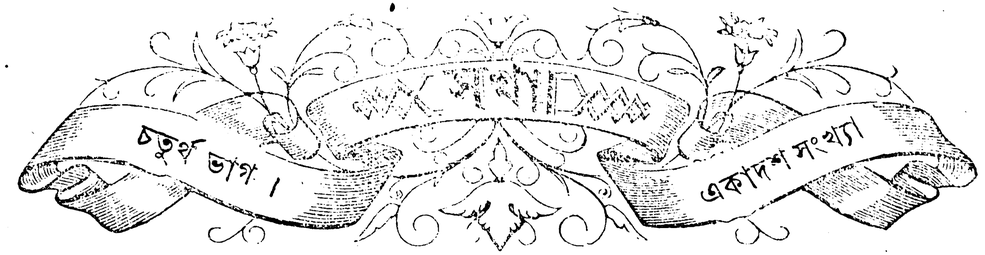

নবেম্বর, ১৮৮৬।

কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র।

নেক নিষ্ঠুর বালক বালিকা পিতামাতার মনে কষ্ট দিতে ছাড়ে না। পিতামাতার মত স্নেহ জগতে আর কে করে? যাঁহাদের স্নেহ ভিন্ন অসহায় শিশুকালে আমাদের বাঁচিবার কোন উপায়ই ছিল না কত অকৃতজ্ঞ সন্তান অবাধ্য আচরণে ও কটু কথায় সেই পিতামাতার স্নেহময় প্রাণ ভাঙ্গিয়া দেয়! নিজের একটু স্বার্থ ও সুখের ইচ্ছাকে বিসর্জ্জন দিলে তাঁহাদের ক্লেশের ভার যদি একটু লঘু হয় ও তাহা দ্বারা তাঁহাদের প্রাণে যদি একটুকু সুখ আনিয়া দিতে পারি তাহা অপেক্ষা সন্তানের আর সৌভাগ্য কি? কিন্তু পিতামাতা বাঁচিয়া থাকিতে এই কথা স্মরণ রাখিয়া সুসন্তানের কাজ কয় জনে করে? "আমার যতদূর সাধ্য পিতামাতার সেবা করিয়াছি, কোন অপ্রিয় আচরণ দ্বারা কোন দিন তাঁহাদের প্রাণে শেল বিদ্ধ করি নাই" যে পিতৃ-মাতৃ বৎসল সন্তান মৃত জনক জননীর কথা স্মরণ করিয়া এই কথা বলিতে পারেন, তিনি কি সৌভাগ্যবান! আমরা নিম্নে এক জন বৃদ্ধ ডাক্তারের জীবনের একটী ঘটনার কথা প্রকাশ করিতেছি। পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিয়া পিতৃমাতৃবৎসল সন্তান যে কি আনন্দ অনুভব করেন, ইহা পাঠ করিয়া সখার পাঠক পাঠিকা তাহার পরিচয় পাইবেন।

"বার বৎসর বয়সে একদিন বিকাল বেলা বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছি এমন সময় পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইল। দেখিলাম তিনি একটা পুঁটুলি লইয়া সহরের দিকে যাইতেছেন। আমাকে সেটা দেখাইয়া বাবা বলিলেন 'এইটা অমুক স্থানে লইয়া যাও।' আমি স্বভাবতই অলস-প্রকৃতি ছিলাম, সহজে কোন কাজে যাইতে চাহিতাম না; বিশেষতঃ সেদিন সকাল বেলা হইতে সারাদিন ক্ষেতে কাজ করিয়া বড়ই ক্ষুধার্ত্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সারাদিনের পরিশ্রমের পর কতক্ষণে বাড়ী পৌঁছিয়া হাত পা ধুইয়া একটুকু ঠাণ্ডা হইব ও আহারের পর পাড়ার আর পাঁচজন ছেলের সঙ্গে আমোদ করিব, উৎসুক হইয়া তাহারই দিকে চাহিয়াছিলাম। বাবা যে স্থানে যাইতে বলিয়াছিলেন তাহা দুই মাইল দূরে। সুতরাং সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর আগুন হইয়া বাড়ী যাইবার সময় বাবা এ নিষ্ঠুর আদেশ করিলেন দেখিয়া বড়ই বিরক্ত হইলাম। 'আমি এখন কোন মতেই পারিব না' অত্যন্ত বিরক্তির সহিত এই কথা বলিতে যাইতেছিলাম,

কিন্তু জানি না কেন হঠাৎ আমার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। আমি না গেলে বাবা আপনিই যাইবেন ইহা নিশ্চয় জানিতাম। বাবার দিকে একবার চাহিলাম, তাঁহার প্রশান্ত স্নেহময় মুখ দেখিয়া আমার কঠোর উত্তর মুখেই রহিয়া গেল, 'আচ্ছা বাবা, এখনিই যাইতেছি' বলিয়া প্রফুল্লমুখে পিতার হস্ত হইতে পুঁটুলি লইলাম। সারাদিনের পরিশ্রমের পর অবসন্ন শরীরে তাঁহার আদেশ পালন করিতে আমার এইরূপ আগ্রহ দেখিয়া স্নেহময় পিতা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, তিনি স্নেহপূর্ণ চক্ষে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'তুমি যে আমার কথামত কাজ করিতে যাইবে আমি তাহা পূর্ব্বেই জানিতাম, তুমি কোন দিনই আমার কথার অবাধ্য নও; আমি নিজেই যাইতেছিলাম কিন্তু শরীরটা যেন কেমন করিতেছে, তাই আর পারিয়া উঠিলাম না।'

"বাবা আমার সঙ্গে সঙ্গে সহর পর্য্যন্ত গেলেন ফিরিয়া যাইবার সময় আমার হাতে হাত রাখিয়া আবার বলিলেন 'তুমি চিরদিনই সুপুত্রের কাজ করিয়াছ, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

"বাবার কাজ সারিয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিলাম। বাড়ীতে আসিয়া বাহির বাড়ীতে অনেক লোক একত্র হইয়াছে দেখিয়া, কি হইয়াছে জানিতে অগ্রসর হইলাম, যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। বাড়ী পৌঁছিয়াই হঠাৎ পড়িয়া গিয়া বাবার মৃত্যু হইয়াছে! যাঁহারা নিকটে ছিলেন তাঁহাদের নিকট শুনিলাম মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার কথা বলিতেছিলেন।

"আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি; কিন্তু সেই দিনের ঘটনা এখনও মনে উজ্জলরূপে অঙ্কিত রহিয়াছে। পিতার এই শেষ কথা এখনও কাণে বাজিতেছে। সেই সময়ে হঠাৎ যদি আমার সুবুদ্ধির উদয় না হইত তাহা হইলে আজ কি ভয়ানক অনুতাপে হৃদয় পূর্ণ হইত। ঈশ্বর-প্রসাদে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে পিতার আদেশ পালন করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রাণে সুখের সঞ্চার করিতে পারিয়াছি, ইহা যখন স্মরণ করি, তখন হইতে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার উদয় হয় এবং আনন্দে পূর্ণ হইয়া তাঁহাকে শত সহস্রবার ধন্যবাদ দি।" ভালবাসার সহিত যে কার্য্য করা যায় তাহার ফল বৃথায় যায় না।

আমার অবাধ্যতায় মৃত জনক-জননী না জানি কত ক্লেশ পাইয়াছেন একথা ভাবিয়া যাহাকে অনুতাপ করিতে হয় তাহার মত দুর্ভাগ্য কে?

তাই বলি পাঠক পাঠিকা! পিতামাতা যে আদেশ করেন নিজের একটুকু সুখ ও আমোদের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও প্রাণে আনন্দ ও অনুরাগ লইয়া তাহা পালন করিতে প্রফুল্লমুখে ছুটিয়া যাইও। স্মরণ রাখিও, যে বালকবালিকা পিতামাতাকে অন্তরের সহিত ভালবাসে ও সেই অনুরাগ বাক্যে ও কার্য্যে প্রকাশ করিতে উৎসুক, ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন।

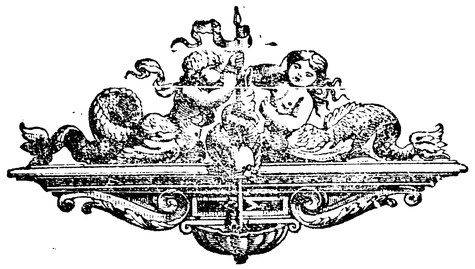

'তুমি চিরদিনই সুপুত্রের কাজ করিয়াছ'

মহাত্মা নেল্‌সনের গল্প।

পাঠক পাঠিকাগণের স্মরণ আছে আমরা ইতিপূর্ব্বে মহাত্মা নেল্‌সনের বাল্যকালের কয়েকটী গল্প বলিয়া দেখাইয়াছি যে, ঐ মহাপুরুষ বাল্যাবস্থাতেই স্বীয় ভাবী মাহাত্ম্যের চিহ্ন অনেক দেখাইয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে আরও দুই চারিটী কথা লিখিয়া তোমাদিগকে দেখাইব যে, একটীমাত্র গুণেই তিনি এত খ্যাতি লাভ করিয়া জগতে অমর হইয়া গিয়াছেন। তোমাদেরও মধ্যে এই বাল্যকাল হইতে যিনি সেই গুণটীমাত্র লাভ ও বর্দ্ধন করিয়া সেই নিয়মের অনুসারে নিশ্চয়ই সব সময়ে কাজ করিতে পারিবেন, তিনিও সেই বীরচূড়ামণি নেল্‌সনের মত আপনার জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়া জীবন সার্থক করিবেন সন্দেহ নাই।

আমেরিকার সঙ্গে ইংলণ্ডের যে মহাসমর হয়, তাহাতে কত লোক বিস্তর ধনোপার্জ্জন করিয়া বড়মানুষ হইয়াছিলেন। কিন্তু নেল্‌সন যে গরিব সেই গরিবই ছিলেন। সেই বিষয়ে কিন্তু তাঁহার নিজের মত বড় চমৎকার ছিল। তিনি বলিতেন—"আমি দরিদ্র আছি সত্য, এত বড় যুদ্ধের পরেও ধনী হইতে পারিলাম না বটে, কিন্তু এই যুদ্ধ উপলক্ষে আমার চরিত্রে এক বিন্দুও কলঙ্ক পড়ে নাই। আমার চিরকাল বিশ্বাস যে প্রকৃত পবিত্র জীবনে উপার্জ্জিত যে যশ, তাহা ধনরাশি অপেক্ষা অনেক মূল্যবান।" বীর-যুবক বাল্যকালে যে দৃঢ়তার সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন চিরদিনই সেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা (যাহা ঠিক উচিত বলিয়া বুঝিব তাহাই করিব, যা ঘটে ঘটুক) দেখাইয়া গিয়াছেন।

নেল্‌সন যখন বোরিয়াস্ নামক জাহাজের কাপ্তেন (অর্থাৎ সর্ব্বোপরি কর্ত্তা) হইয়া আমেরিকা যান, তখন এক আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল। আণ্টিগোয়া নামক এক বন্দরে গিয়া দেখিলেন যে, একখানা জাহাজের মাস্তলে একটা চওড়া নিশান উড়িতেছে। চওড়া নিশান কিসের চিহ্ন জান?—সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার চিহ্ন। সেই বন্দরে যতগুলি জাহাজ ছিল, তাহাদের কোনটীর কাপ্তেনই নেল্‌সনের অপেক্ষা ক্ষমতায় উচ্চ নহেন, বরং সকলেই তাঁহার নিম্নে। তাঁহার উপরে কেবল প্রধান নৌ-সেনাপতি সার রিচার্ড হীউস্, তিনিও সেখানে থাকিতেন না। সুতরাং হিসাব মত সে বন্দরে নেল্‌সনেরই ক্ষমতা সর্ব্বোপরি। অথচ আর একখানি জাহাজে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার চিহ্ন চওড়া নিশান দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইলেন এবং ব্যাপার কি জানিবার জন্য "কম্যাণ্ডার-ইন্-চীফ্" বা প্রধান নৌ-সেনাপতি সার রিচার্ডকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। তিনি উত্তরে লিখিলেন যে, ঐ স্থানের শাসনকর্ত্তা মাউট্রে সাহেবের অধীন হইয়া তাঁহাকে চলিতে হইবে। এবং ঐ বন্দরে মাউট্রে সাহেবের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতা অধিক থাকার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে যে কোন জাহাজে ইচ্ছা, চওড়া নিশান উড়াইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

নেল্‌সন তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন যে, মাউট্রে সাহেবের ঐ নিশান উড়াইবার কোন ক্ষমতা নাই, এবং তাঁহার উপর হুকুম চালাইবার কোন অধিকার নাই। এমন কি তোমরাও স্পষ্ট বুঝিতেছ যে, যখন ঐ বন্দরে নেল্‌সন সকল কাপ্তেনেরই

উপরে, তখন ঐ স্থানীয় শাসনকর্ত্তার কোন অধিকার নাই যে, তাঁহার উপরে ক্ষমতা চালান; অথচ নেল্‌সনের উপরওয়ালা প্রধান সেনাপতি তাঁহাকে আদেশ করিলেন—মাউট্রেহুকুম শুনিতে হইবে। তিনি কি করেন? যে সে লোক হইলে হয়ত সে আদেশ অমান্য করিতে সাহসী হইত না। কিন্তু নেল্‌সন বেশ জানিতেন যে, তিনি নিজ কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ভিন্ন আর কাহারও অধীন হইবেন না। সুতরাং অসম সাহসের সহিত বন্দরে প্রবেশ করিবামাত্র ঐ জাহাজের কাপ্তেনকে তৎক্ষণাৎ চওড়া নিশানটা নামাইয়া ডক্‌ইয়ার্ডে (জাহাজ মেরামতের ও সব সামগ্রী রাখিবার স্থান) পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। সার রিচার্ড আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারীর অবাধ্যতায় ক্রুদ্ধ হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিলেন। কিন্তু পরে নেল্‌সনেরই জিৎ হইল। ঐ অন্যায় আদেশ পালন না করার জন্য তিনিই প্রশংসা পাইলেন।

আরও একটা গল্প বলি শুন। তখন ইংলণ্ডের বাণিজ্য আইনে লেখা ছিল যে, কোন বিদেশীয় জাহাজ বা মাহাজন আমেরিকার ইংরাজ ঔপনিবেশিক দ্বীপসমূহে ব্যবসায় চালাইতে পারিবেন না। আমেরিকায় ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ দেশ আগে ইংরাজদেরই ছিল, কিন্তু ঐ মহাসমরে তাহারা স্বাধীন আমেরিকান্ হয়। সুতরাং তাহারা হিসাবমত এখন "বিদেশীয়" হইয়াছে। কিন্তু তথাপি তাহাদের জাহাজ সকল পূর্ব্বের মত ইংরাজদিগের দ্বীপগুলিতে গিয়া বাণিজ্য করিত। নেল্‌সন দেখিলেন যে, তাহা আইন-বিরুদ্ধ কাজ হইতেছে। তিনি প্রধান নৌ-সেনাপতির নিকটে গিয়া সে কথা বলিলেন। প্রথমে তিনি উড়াইয়াই দিয়াছিলেন। কিন্তু নেল্‌সন ত আর ছেলে ভুলানতে ভুলিবার নন, তাঁহার নিকটেই আইন ছিল, খুলিয়া তখনি দেখাইয়া দিলেন যে, আমেরিকানদিগকে দূর করিয়া না দিলে কর্ত্তব্য করা হয় না, দোষ হয়।—সার রিচার্ড কি করেন?—অগত্যা বাধ্য হইয়া তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন।

তখন নেল্‌সন আসিয়া ঐ সকল দ্বীপের শাসনকর্ত্তাকে ঐ কথা বলিলেন। কিন্তু বালকবৎ কাপ্তেনকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি তাঁহাকে উপহাস করায়, সিংহশাবক অমনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"দেখুন, আমি বালক হইতে পারি, কিন্তু ইংলণ্ড মহাসাম্রাজ্যের কর্ণধার প্রধান মন্ত্রী পীট (যাঁহার বয়স এখন ২৫ বৎসর) তাঁহার অপেক্ষা আমার বয়স কম নহে। আর তিনি যেমন এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিতে পারেন আমিও তেমনি দক্ষতার সহিত একখানি রণতরীর অধ্যক্ষতা করিতে সমর্থ।" এই বলিয়া ২৬ বৎসরের যুবা ঐ বৃদ্ধের মুখ চুণ করিয়া দিলেন।

তারপর একটী দিন ধার্য্য হইল ও আজ্ঞা প্রচারিত হইল যে, ঐ দিনের পর যে আমেরিকান জাহাজ ইংলণ্ডীয় বন্দরে দেখা যাইবে তাহাই গ্রেপ্তার করা হইবে। দ্বীপবাসী সমস্ত লোক একবাক্যে তাঁহার বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি করিয়া উঠিল, শাসনকর্ত্তারাও সকলেই (একজন ছাড়া) তাঁহার বিপক্ষে দাঁড়াইল। মহা হুলস্থূল ব্যাপার। গতিক মন্দ দেখিয়া দুর্ব্বলচেতা ভীরু সার রিচার্ড চুপে চুপে নেল্‌সনকে পত্র লিখিলেন যে, সকলের মত লইয়া ও খুসী করিয়া যেন কার্য্য করা হয়। কিন্তু কর্ত্তব্য-পরায়ণ বীর নেল্‌সন অচল, অটল, হিমালয় পর্ব্বতের মত দৃঢ় হইয়া আপনার মতানুসারে স্বতেজে চলিতে লাগিলেন।

এদিকে প্রধান সেনাপতি সার রিচার্ড আপনার পত্র অগ্রাহ্য হইল দেখিয়া কড়া হুকুম বাহির

করিলেন যে, নেল্‌সন যেন আমেরিকান্ জাহাজ সকলের বিরুদ্ধে কোন কিছু না করেন। তাহারা পূর্ব্ববৎ বাণিজ্য করিতে পাইবে। তিনিই সকলের উপর ক্ষমতাশালী। তাঁহার এই প্রকাশ্য আদেশ অমান্য করিলে নেল্‌সনের যার পর নাই বিপদের সম্ভাবনা। এই আদেশ প্রচারিত হইলে শাসনকর্ত্তারাও খুব জোর পাইয়া তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া বিদ্রূপাদি করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কর্ত্তব্য-পরায়ণ বীরহৃদয় টলিবার নহে। তিনি এবারেও আপনার উপরওয়ালার স্পষ্ট আজ্ঞার বিপরীত কাজ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন। বলিলেন, "হয় আমার অধিনায়ক সার রিচার্ডকে অমান্য করিতে হইবে, না হয়ত আমার দেশের আইন অমান্য করিতে হইবে। আমি কখনই কর্ত্তব্য ত্যাগ করিতে পারিব না। যা হয়, হউক।" তাহার পর সার রিচার্ডকে বিনম্রভাবে লিখিলেন "আপনার আদেশ অমান্য করাই এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে। পরে সাক্ষাৎ হইলে বুঝাইয়া দিব যে আমি অতি ঠিক কাজ করিতেছি।" স্থূলদর্শী সার রিচার্ড কর্ত্তব্য-প্রিয় বীরের এই কথার মহত্ব কি বুঝিবে? প্রথমে রাগে অন্ধ হইয়া তাঁহাকে বিচারাধীনে আনিয়া শাস্তি দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, পরে বুঝিতে পারিয়া আবার নেল্‌সনকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন।

তারপর কি হইল শুনিবে? গায় কাঁটা দিতেছে। উক্ত নির্দ্ধারিত দিনের পরেও অনেক আমেরিকান জাহাজ ঐ বন্দরে ছিল তাহারা ধৃত ও বাজেয়াপ্ত হইল। অবশেষে নেল্‌সন স্বয়ং চারিখানি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আমেরিকান জাহাজ মাল বোঝাই শুদ্ধ দেখিতে পাইয়া ভদ্রতাপূর্ব্বক তখনি না ধরিয়া ৪৮ আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে বন্দর ত্যাগ করিয়া যাইবার আদেশ দিলেন। কিন্তু দুষ্ট কাপ্তেনেরা তাহা না শুনিয়া আবার বলিল যে, তাহারা আমেরিকান জাহাজ নয় তখন অগত্যা নেল্‌সন তাহাদের কয়েকজন নাবিকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া আমেরিকান ধার্য্য হওয়ায় চারি খানি জাহাজই আটক করিলেন। এই বার মহা প্রলয় উপস্থিত হইল। সমস্ত অধিবাসী, শাসন কর্ত্তারা, ব্যবসাদারেরা এবং বাণিজ্যাগারও (Custom House) সব এক বাক্যে তুমুল কোলাহল উত্থিত করিল। নেল্‌সনের নামে ৪,০০,০০০ চারি লক্ষ টাকা লোকসানের দাবী দিয়া মাহাজনেরা নালিশ করিল। সর্ব্বনাশ! কি উপায়? ভীরু সার রিচার্ড এবারেও তাঁহাকে সমর্থন করিলেন না, দূরে থাকিয়া কি হয় দেখিতে লাগিলেন। ভীম সাহসে নেল্‌সন আপনার পক্ষ সমর্থন করিলেন। এবং এমন স্বাধীন ও নির্ভীক হৃদয়ে শান্ত ও গম্ভীর ভাবে এবং এমন দৃঢ়তা ও দক্ষতার সহিত মকদ্দমা চালাইলেন যে তাঁহারই জয় লাভ হইল।

পৃথিবীতে চিরকালই কর্ত্তব্যপরায়ণ সত্যনিষ্ঠ লোকেরা এইরূপে জয়ী হইয়া আসিয়াছেন। কর্ত্তব্য ঈশ্বরের আদেশ। এই আদেশের উপরেই যিনি জীবনকে দাঁড় করাইতে পারেন তিনিই বীর, নির্ভয়, নিরাপদ ও জয়ী।

মুদ্রাযন্ত্র।

চীনেদের বড় বুদ্ধি। গ্রাম্য লোকদিগের অনেকে এখনও বিশ্বাস করে যে ষ্টীম্ এঞ্জিন্, টেলিগ্রাফ্ ইত্যাদি বড় বড় কল কারখানা সব চীনেদের তৈরী। বাস্তবিক চীনেদের সম্বন্ধে লোকের এরূপ বিশ্বাস হইবার কারণ আছে। পূর্ব্বকালে যখন অন্যান্য দেশের লোকেরা এসব বিষয়ের কিছু জানিত না, তখন চীনেরা অনেক রকম কল ও সঙ্কেত জানিত। তখন যাহা কিছু আশ্চর্য্য হইত, প্রায় সবই চীনেরা প্রস্তুত করিত। এইরূপেই চীনেদের এরূপ নাম হইল।

যে ছাপাখানা দ্বারা পৃথিবীর এত উপকার হইয়াছে, তাহারও প্রথম মতলবটা চীনেদেরই মাথায় খেলিয়াছিল। গল্প আছে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে চীন রাজমন্ত্রী ফুং তেও প্রথম ছাপিবার সংকেত আবিষ্কার করেন। অনেক হুকুম, ঘোষণাপত্র ইত্যাদি এত অধিকবার লিখিতে হইত এবং তাহাতে এত অধিক সময় লাগিত যে, তাহাতে রাজকার্য্য সুন্দররূপ চলিবার বড়ই ব্যাঘাত হইত। সুতরাং তিনি মনে করিলেন যে, ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় একটা বাহির করা আবশ্যক। তিনি দেখিলেন যে সেই সকল হুকুম কাঠে খোদাই করিয়া, তাহাতে কালী দিয়া তাহা হইতে ছাপ তুলিলেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এইরূপে তিনি মুদ্রাঙ্কণের মূলমন্ত্র আবিষ্কার করিলেন। সেই সময়ে পী চিং নামক একজন কর্ম্মকার বাস করিত। সে দেখিল যে মস্ত একটা হুকুম কাঠে খোদাই করার চাইতে আলাদা আলাদা অক্ষর খোদা থাকিলে সেইগুলি আবশ্যক মত একত্র করিয়া অতি সহজেই কাজ চালান যাইতে পারে। সে মাটির অক্ষর তৈরী করিয়া তাহাদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে পৃথক অক্ষর রাখিলে বেশ কাজের সুবিধা হয়। কিছুদিন পরে পী চিং মরিয়া গেল। তাহার ছেলেদের বুদ্ধি আর ত ততটা পাকা হয় নাই, সুতরাং তাহারা মনে করিল যে বাবা কি ছেলে খেলা নিয়াই জীবনটা কাটাইয়া গিয়াছেন! এই ভাবিয়া তাহারা পী চিঙের অক্ষরগুলি ফেলিয়া দিল। শীল মোহরের গোছ করিয়া কাঠ খোদাই করা ভিন্ন ছাপার কার্য্যের আর অধিক উন্নতি চীনেদের দ্বারা হইল না।

জর্ম্মণি দেশে গুটেন্‌বর্গ নামক একজন লোক ছিলেন; তিনিই প্রকৃত পক্ষে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার করেন। তিনিও প্রথমে খোদাই করা কাঠ হইতেই ছাপ তুলিতেন। ফষ্ট্ নামক এক ব্যক্তি গুটেন্‌বর্গের আবিষ্কারে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহার সহিত যোগ দিয়া এই কার্য্যে তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরেই গুটেন্‌বর্গ বুঝিতে পারিলেন যে হাতে ছাপ না তুলিয়া ছাপ তোলার জন্য কোনরূপ যন্ত্র থাকিলে বড়ই ভাল হয়। তিনি একটী যন্ত্রের কথা ভাবিয়া কনরেড্ সাম্প্যাক্ নামক একজন ছুতোরকে বলিলেন। সে তাঁহাকে এক কাঠের ছাপাখানা প্রস্তুত করিয়া দিল। এই ঘটনার দুই বৎসর পরে (১৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দে) কষ্টার নামক একজন লোক প্রথমে পৃথক অক্ষরের সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে প্রকৃত প্রস্তাবে মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হইল। সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারা বাইবেল গ্রন্থ ছাপিতে আরম্ভ করেন। এই প্রথম মুদ্রাঙ্কিত গ্রন্থ এখন অতি দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। অল্পদিন হইল নিউইয়র্ক নগরে (আমেরিকায়) ইহার একখণ্ড নিলামে বিক্রয় হইয়াছিল; তাহার মূল্য ১৮০০০৲ আঠার হাজার টাকা হইয়াছিল।

ইংরাজেরা জর্ম্মণদের নিকট হইতেই এই বিদ্যা লাভ করেন। উইলিয়ম ক্যাক্‌ষ্টন্ নামক একব্যক্তি কলোন্ নগরে আসিয়া ছাপার কাজ শিক্ষা করেন। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলে ইংলণ্ডের রাজা ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে একটী ছাপাখানা স্থাপন করিতে অনুমতি দেন। ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার এবি নামক গীর্জাতে সেই ছাপাখানা স্থাপিত হয়।

ইংলণ্ডে ক্যাক্‌ষ্টনের যে গৌরব, আমাদের দেশে মহাত্মা কেরীরও সেই গৌরব হওয়া উচিত। কেরী সাহেবই প্রথমে এদেশে ছাপাখানা আনয়ন করেন। তাঁহারই যত্নে প্রথম বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত হইল। শ্রীরামপুরে প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয়। তখনকার ছাপা এখন দেখিলে হয়ত তোমরা হাসিবে। আমি বহুকালের পুরাতন একখানি অভিধান দেখিয়াছি। তাহাতে বাঙ্গালা শব্দের ইংরাজি অর্থ লেখা আছে। অভিধানখানি ঠিক ওয়েব্‌ষ্টারের বড় ডিক্সনারির ন্যায় বড় হইবে। ইহার বাঙ্গালা অক্ষরগুলি দেখিতে হাতের লেখা অক্ষরের মত, কিন্তু বেশ পরিষ্কার। এখন অক্ষরের অনেক উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু এক কথা মনে রাখিও, কেরী সাহেবের নিকট আমরা এই সকলের জন্য ঋণী।

আজ কাল ছাপাখানার কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহা আমাদের দেশের দুই একটী প্রেস দেখিয়া বুঝিতে পারিবে না। নিম্নে প্রধান পাঁচটী ছাপার কলের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে—

১। ম্যারিনিনির কৃত। এই কল প্রতি ঘণ্টায় ১৫০০০ হইতে ২০,০০০ করিয়া ছাপে।

২। জুলিস্ ডেরীকৃত। এই কল প্রতি ঘণ্টায় ১৬০০০ হইতে ৩২০০০ করিয়া ছাপে।

৩। হো সাহেব কৃত। আমেরিকার তিনটী প্রধান খবরের কাগজ ছাপিতে এইরূপ তিনটী কল ব্যবহৃত হয়। এই কল খবরের কাগজ ছাপিয়া কাটিয়া আঠা দিয়া জুড়িয়া এবং ভাঁজ করিয়া দেয়। এবং এত কাজ করিয়াও ঘণ্টায় ২৫০০০ হিসাবে ছাপে।

৪। এলুজে কোম্পানির প্রেস। এই প্রেসে ঘণ্টায় ৩৫০০০ হইতে ৭০,০০০ করিয়া ছাপা হইতে পারে।

৫। স্কট্ রোটারি প্রেস। ইহাতে ঘণ্টায় ৩০,০০০ হিসাবে ৮ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট কাগজ ছাপা কাটা ও ভাঁজ করা হয়।

স্নেহলতার দয়া।

বৈশাখ মাস। দারুণ গ্রীষ্ম, রৌদ্রের তেজে চারিদিক যেন অগ্নিময় হইয়াছে; কাহারও ঘরের বাহির হইবার সাধ্য নাই। এমন সময় ঐ দেখ রাস্তায় একটী স্ত্রীলোক দুটি ছেলে সঙ্গে লইয়া চলিয়াছে। এত রৌদ্রে, এই দুই প্রহরের সময় ইহারা কোথায় যাইতেছে? আর সকলের মত ঘরে না থাকিয়া ইহারা এমন সময় কেন বাহির হইয়াছে? আবার চাহিয়া দেখ স্ত্রীলোকটীর মুখখানি নিতান্ত মলিন হইয়া গিয়াছে, চক্ষু দিয়া অনবরত জল পড়িতেছে। কেন, ইহাদের কি কোন বিপদ ঘটিয়াছে? হ্যাঁ, ইহাদিগের নিতান্তই বিপদ। কিছুদিন হইল ঐ স্ত্রীলোকটীর স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। ইহাদিগের অবস্থা বড় ভাল ছিল না। স্বামী যাহা উপার্জ্জন করিত তাহাতে কোন মতে দিন চলিয়া যাইত, তাহার মৃত্যু হওয়াতে ইহারা নিতান্ত বিপদে পড়িয়াছে। ইহাদিগের আর কেহ এমন নাই যে খাইতে পরিতে দেয়, বা অন্য প্রকারে সাহায্য করে।

এখন ঐ অনাথা স্ত্রী ভিক্ষা করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতেছে। কিন্তু ভিক্ষা সকল সময় মিলে না! কাল যাহা ভিক্ষা করিয়া পাইয়াছিল, তাহাতে অতি কষ্টে কাল এক বেলা চলিয়াছিল, কিন্তু রাত্রিতে তাহাদিগকে উপবাস করিতে হইয়াছে। নানা কষ্টে স্ত্রীলোকটীরও কঠিন ব্যারাম হইয়াছে, রোগ যাতনায় সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, ছট্ ফট্ করিয়া কাটাইয়াছে, প্রাতঃকালে তাহার একটু ঘুম আসিয়াছে, এমন সময় তাহার ছেলে দুটি জাগিয়া উঠিল। আগের দিন রাত্রিতে কিছু খায় নাই বলিয়া তাহারা যার পর নাই ক্ষুধিত হইয়াছিল। এখন উঠিয়া মাকে জাগাইয়া তুলিয়া খাবার চাহিতে লাগিল। অবোধ ছেলেরা জানিত না যে, ঘরে কিছুই খাবার নাই! তাহারা কেবল মাকেই জানে, তাহারা জানে মা থাকিলে আর খাবার ভাবনা নাই, তাই মাকে জাগাইয়া বলিতে লাগিল "মা বড় ক্ষিধে পেয়েছে, খেতে দে।" অনাথা স্ত্রীলোকের হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যখন এই কথা কাণে গেল—"মা বড় ক্ষিধে পেয়েছে, খেতে দে" তখন তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ছেলেদের মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ছেলেরা তাহা বুঝিল না, আরও আব্‌দার করিতে লাগিল,—"মা বড় ক্ষিধে পেয়েছে, খেতে দে।" তখন সেই অনাথা বিধবা আর অন্য উপায় না দেখিয়া ছেলেদুটীকে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষার জন্য বাহির হইল। রোগ যন্ত্রণায় তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, খানিক চলিয়া এক একবার বসিয়া পড়িতেছে, আবার খানিক চলিতেছে। এই ভাবে দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে, কিন্তু এই দুই প্রহর বেলা হইয়াছে, এখন পর্য্যন্ত কেহ দয়া করিয়া তাহাকে একমুষ্টি ভিক্ষা দেয় নাই, যাহা দ্বারা ছেলেদুটীকে একটু শান্ত করিতে পারে। রোগে, অনাহারে, পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া আর চলিতে না পারিয়া সেই অনাথা একটা বাড়ীর সম্মুখে বসিয়া পড়িল; এবং আর কোন উপায় না দেখিয়া হাতের উপর মাথাটী রাখিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিল। ছেলেরাও ক্ষুধার জ্বালায় ছট্ ফট্ করিতেছে! তাহারা কাঁদিতেছে আর বলিতেছে "মা খেতে দে" "মা খেতে দে।" যে বাড়ীর সম্মুখে সেই অনাথা স্ত্রীলোক বসিয়া পড়িয়াছিল, সে বাড়ীটী বেশ বড়। খানিক বসিয়া অনাথা স্ত্রীলোকটী ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিল। বাড়ীর কর্ত্তা আহারের পর গিয়া শুইয়াছেন, ভৃত্যেরা তাঁহাকে বাতাস করিতেছে; সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, বাবু এখন ঘুমাইবেন। বাবুর ছেলেও আহারের পর নীচের বসিবার ঘরে একটা সোফার উপর শুইয়া বিশ্রাম করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় সেই অনাথা স্ত্রীলোক কাতর স্বরে বলিল "মাগো দুটী ভিক্ষা পাই।" সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা চিৎকার করিয়া উঠিল "মা বড় ক্ষিধে পেয়েছে, খেতে দে"। বাবুরা আহার করিয়াছেন, এখন একটু নিদ্রা যাইবেন, এমন সময় বাহিরে কে চিৎকার করিয়া ঘুমের ব্যাঘাত করিতেছে? বাবুর ছেলে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন একজন স্ত্রীলোক ভিক্ষা চাহিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ হুকুম করিলেন, বাহির হইয়া যাও। ছেলে দুটি বড়ই কাঁদিতেছে, মায়ের প্রাণ সহ্য করিতে না পারিয়া অনাথা বিধবা আবার ভিক্ষা চাহিল; বাবুর আর সহ্য হইল না। তিনি চিৎকার করিয়া বলিলেন, বাহির হইয়া যাও। এই শব্দ বাড়ীর মধ্যে পৌঁছিল। বাবুর একটি মেয়ে ছিল, তাহার বয়স অধিক নহে, মেয়েটির নাম

স্নেহলতা। স্নেহলতা এই চিৎকার শুনিয়া দৌড়িয়া, বাহিরে আসিল, আসিয়া দেখিল, তাহার দাদা রাগে কাঁপিতেছেন, আর দেখিল এক অনাথা বিধবা মলিন বিষণ্ণ মুখে বাহির হইয়া যাইতেছে, তাহার চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছে। সঙ্গে দুটী ছোট ছেলে, তখনও বলিতেছে "মা বড় ক্ষিধে পেয়েছে।"

"মা বড় ক্ষিধে পেয়েছে" এই কথা যেন স্নেহলতার বুকে বিঁধিল। আর সে যাহা দেখিল তাহাতে তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে তাহার নিজের ছোট ছোট দুখানি হাত দিয়া তাহার দাদার হাত দুখানি ধরিল, ধরিয়া সজল নয়নে বলিল "দাদা ইহারা বড় দুঃখী, ওদের উপর কেন রাগ কর, তোমার পায়ে পড়ি উহাদিগকে তাড়াইয়া দিও না। ভগিনীর এই কথা শুনিয়া ছেলে বাবুর রাগটা যেন একটু কমিল, তিনি ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। তখন স্নেহলতা ঐ অনাথা স্ত্রীলোকটীকে ডাকিয়া ফিরাইল, এবং তাহাদিগকে একটা জায়গায় বসাইয়া দৌড়িয়া উপরে গেল। স্নেহলতা প্রকৃতই স্নেহলতা! স্নেহলতার অন্তর স্নেহ, ভালবাসা, দয়াতে পূর্ণ। পরের দুঃখ দেখিলে তাহার বুক ফাটিয়া যাইত; চক্ষের জল রাখিতে পারিত না। বাড়ীতে সকলের খাওয়া দাওয়া হইয়া গিয়াছে, কিন্তু স্নেহলতা তখন পর্য্যন্তও খায় নাই। স্নেহলতাদের বাড়ীর পাশে একজনদের, তারই বয়সের, একটি মেয়ের মৃত্যু হইয়াছিল, তাই সে সেই বাড়ীতে গিয়া সেই মেয়ের মার কাছে বসিয়াছিল। তাই তার আজ এখনও খাওয়া হয় নাই। স্নেহলতা উপরে গিয়া তাহার খাবার সমস্ত জিনিস আনিয়া সেই অনাথার হাতে দিল। অনাথার চক্ষের জল উছলিয়া উঠিল; স্নেহলতার এত দয়া দেখিয়া তাহার চক্ষের জল আরও অধিক পড়িতে লাগিল। স্নেহলতা আবার উপরে গেল। উপরে তাহার বাবার ঘরে যাইয়া তাঁহার নিকট বলিল, "বাবা বাহিরে একজন বড় দুঃখী স্ত্রীলোক দুটি ছোট ছেলে লইয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকে কিছু দিতে হইবে।" স্নেহলতা এমন ভাবে এই কথাগুলি বলিল যে তাহার পিতা তাহার দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন তাহার চক্ষু ছল ছল করিতেছে। তাহার মুখখানি সেই অনাথা বিধবার দুঃখ দেখিয়া মলিন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহাতে যেন তাহার সুন্দর মুখখানি আরও সুন্দর দেখাইতেছে। ইহাই প্রকৃত সৌন্দর্য্য! তাঁহার ছেলে যখন সেই অনাথাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য চিৎকার করিতেছিল তাহা তিনি শুনিয়াছিলেন, আর এখন স্নেহলতার দয়াও দেখিলেন; ছেলের নিষ্ঠুরতা ও মেয়ের দয়া দেখিয়া অনেক শিখিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ স্নেহলতার হাতে কয়েকটী টাকা দিয়া বলিলেন "মা এই লও, সেই অনাথাকে দিয়ে এস।" স্নেহলতা আহ্লাদে সেই টাকা লইয়া নীচে দৌড়িয়া গেল, এবং সেই অনাথার হাতে টাকা কয়েকটী দিল।

স্নেহলতা গৃহলক্ষ্মী। এই গৃহলক্ষ্মী যে গৃহে নাই, সে গৃহ ধন রত্নে পূর্ণ থাকিলেও শ্মশান। স্নেহলতার কাছে আজ তাহার পিতা ভ্রাতা যাহা শিখিলেন তাহা আর জন্মে ভুলিলেন না।

একবার ভাবিয়া দেখ দেখি কত অসহায়া অনাথা এই ভাবে দিনপাত করে! কেহবা সারাদিন পরে একমুঠা খাইতে পায়,—কেহবা তাহাও পায় না, অনাহারেই হয়ত দিনপাত করে। কতলোক দরিদ্রতার জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ করে। আমরা হয়ত নানাপ্রকার ভাল ভাল খাবার

জিনিস দিয়া প্রত্যহ আহার করিতেছি, আর একজন হয়ত কেবল একমুঠা ভাতও পাইতেছে না। দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যে দুই প্রহরের সময় বা দারুণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে, মুষ্টি ভিক্ষার জন্য কতজন দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে, আমরা তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছি না। আমরা নিজের সুখ স্বচ্ছন্দ লইয়াই ব্যস্ত, আমার প্রতিবাসী যে অনাহারে মরিতেছে, কত দুঃখীলোক যে একমুঠা ভাতের জন্য হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে, তাহা আমরা দেখিতেছি না।

সখার পাঠক পাঠিকা! দুঃখীকে কেমন করিয়া দয়া করিতে হয় তোমরা কি স্নেহলতার কাছে আজ তাহা শিখিবে? পাঠিকাগণ! তোমরা কি স্নেহলতার ন্যায় স্নেহময়ী হইবে?

নানা প্রসঙ্গ।

তোমাকে যদি কেহ লাঠি লইয়া মারিতে আইসে, তবে তুমি কি কর?—দৌড়াইয়া পলাও। আততায়ীর হাত এড়াইবার ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু অনেক জানোয়ার ইহা অপেক্ষা অন্যরূপ উপায় অবলম্বন করে।

অনেক জানোয়ার এইরূপ অবস্থায় পড়িলে মড়ার মত হইয়া পড়িয়া থাকে। এইরূপে অনেক সময় বিপদ হইতে রক্ষা পায়।

পীউইট্ পাখীর বাসার কাছে মানুষ গেলে পীউইট্ ভান করে যেন সে ভাল করিয়া উড়িতে পারে না। এরূপ পাখীকে ধরা সহজ মনে করিয়া অনেকেই তাহার পেছনে পেছনে যায়। এইরূপে পাখী তাহাকে ভুলাইয়া বাসা হইতে দূরে লইয়া যায়।

কেন্দ্রাইকে বিরক্ত করিলে সে শরীর গুটাইয়া গোলাকার হইয়া থাকে। ইহা হইতেই কেন্দ্রাই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত হেঁয়ালিটী উৎপন্ন হইয়াছে:—

"ছ'কুড়ি ছ'খানা পা,
রক্ত বরণ গা,
টোকা দিলে টাকাটী হয়
তাকে তুই খা।"

উট পক্ষীকে কুকুরেরা তাড়া করিলে যখন সে মনে করে যে আর ইহাদের হাত এড়ান গেল না তখন মাথাটী বালির নীচে গুঁজিয়া রাখে। অবশ্য ইহাতে বিপরীত ফলই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু উটপক্ষী প্রথমে মনে করে যে বড়ই নিরাপদ হইয়াছে।

এক প্রকারের পোকা আছে তাহারা নিজের বাড়ী ঘর সঙ্গে লইয়া বেড়ায়। কোনরূপ ভয় পাইলেই ঘরের ভিতর লুকাইয়া থাকে।

এক প্রকারের ফড়িং আছে, তাহার পাখা দুটী একত্র করিলে দেখিতে ঠিক গাছের পাতার মতন হয়। তখন আর তাহাদিগকে সহজে চিনিতে পারা যায় না। এইরূপে তাহারা ফড়িংখাদক পাখীদের হাত হইতে রক্ষা পায়।

গুগ্‌লিরা যখন নিতান্তই বেকায়দা দেখে তখন তাহারা মুখের কাছের দরজাটী বন্ধ করিয়া দেয়।

শম্বুকজাতীয় অনেক প্রকার জলজীব আছে, তাহারা যখন দেখে যে শত্রুর হাত হইতে বাঁচিবার আর অন্য উপায় নাই, তখন এক প্রকার কাল জিনিস পেটের ভিতর হইতে বাহির করিয়া দেয়। ইহাতে জলটা অনেক দূর পর্য্যন্ত এত কাল হইয়া যায় যে, আর তাহার ভিতর দিয়া কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই অবসরে সে পলাইয়া কোন নিরাপদ স্থানে যায়।

কচ্ছপগুলির কাণ্ড কারখানা সকলেই দেখিয়াছ, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার আবশ্যক দেখি না। এক প্রকারের কচ্ছপ আবার শুধু গলাটী আর হাতপাগুলি ভিতরে লইয়া গিয়াই সন্তুষ্ট হয় না। তাহার শরীরের আবরণটা কবাটের মত হইয়া সেই হাত পাগুলিকে ঢাকিয়া রাখে।

শেয়ালগুলি যে কতবার মরিয়া থাকে তাহা আর কি বলিব। এ বিষয়ে শেয়ালের সঙ্গে আর কেহ পারিবে না।

বুনোরোহিতের আঁইস বলিয়া এক প্রকার আঁইস অনেক জায়গায় বিক্রয় হয়; অনেকে তাহাতে আংটী প্রস্তুত করিয়া হাতে দেয়। বাস্তবিকই যে জঙ্গলে কোনরূপ রোহিত মাছ থাকে বা ঐগুলি যে মাছেরই আঁইস, তোমরা এরূপ মনে করিও না। ঐ সকল আঁইস এক প্রকার চতুষ্পদ জানোয়ারের। আমাদের দেশে এইরূপ জানোয়ার অতি অল্পই আছে; সুতরাং আমরা উহাদিগকে সচরাচর দেখিতে পাই না, দক্ষিণ আমেরিকায় এই জাতীয় অনেক জন্তু বাস করে। এই সকল জন্তুকে আর্ম্মেডিলো বলা হয়। আর্ম্মেডিলো অনেক প্রকারের হইয়া থাকে; অপর পার্শ্বে একটীর ছবি দেওয়া গেল।

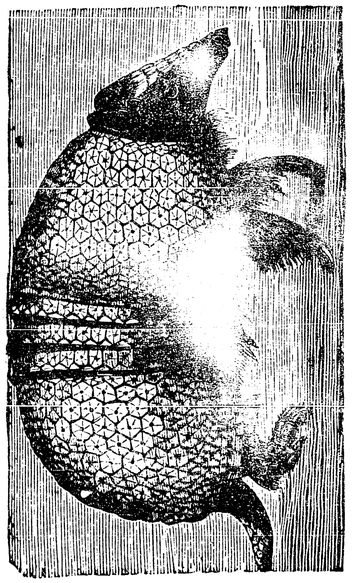

দক্ষিণ আমেরিকায় অনেক বাঁদর থাকে; তাহাদের জ্বালায় আর্ম্মেডিলো বড় ব্যতিব্যস্ত হয়। বাঁদরগুলি তাহাদিগকে প্রথমে খোঁচায়। যদি তাহারা গর্ত্তে প্রবেশ করে তবে লেজ ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া যারপর নাই বিড়ম্বনা করে। যে আর্ম্মেডিলোটীর ছবি দেওয়া হইল, কেবলমাত্র তাহারই নিকট বানরেরা কিঞ্চিৎ জব্দ থাকে। এই আর্ম্মেডিলোর নাম বল্ আর্ম্মেডিলো (Ball Armadillo)। বল আর্ম্মেডিলো উপায়ান্তর না দেখিলে হাত পা গুটাইয়া লেজ মাথা গুঁজিয়া পাছা সামনে টানিয়া লইয়া বেশ একটী নীরেট গোলাকার জিনিস হইয়া থাকে। অপর পৃষ্ঠার (ছবি দেখ।)

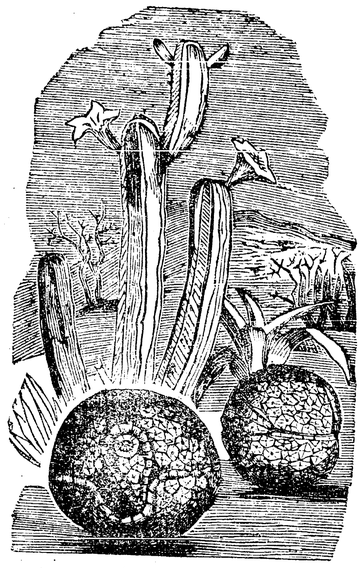

বাঁদরেরা আর তখন ধরিয়া টানিবার মত কোন জিনিস পান না; সুতরাং অপ্রতিভ হইয়া ঘরে ফিরিয়া যাইতে হয়।

ফুলের সাজি।

পঞ্চম অধ্যায়।

মনোরমার বিচার।

মনোরমা জাগিয়া দেখিল নিকটে দুই জন রাজপুরুষ দণ্ডায়মান। তাহারা মনোরমাকে তাহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য সঙ্কেত করিল, সেও কিছু না বলিয়া তাহাদের সঙ্গে চলিল। সে সময়ে তাহার প্রাণের ভিতর যে কি হইতেছিল তাহা কে বলিতে পারে? যদি কেহ কখন এমন অবস্থায় পড়িয়া থাকেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন, বলিতে পারিবেন না। তাহার কণ্ঠ তালু শুকাইয়া গেল, চরণ যেন চলে না, বুক ধড় ধড় করিতে লাগিল। রাজকর্ম্মচারীরা তাহাকে বিচার-মন্দিরে লইয়া গেল। হায়! মনোরমার কপালে এত দুঃখও ছিল।

বিচারপতি তাহাকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, সে প্রশ্নগুলির যথার্থ উত্তর প্রদান করিল। মনোরমা কাঁদিয়া ফেলিল; তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় আর কত সহ্য করিবে?

বিচারক বলিলেন "বাছা, কাঁদ আর যাহা কর, আমার বেশ বোধ হইতেছে, একাজ তুমি ভিন্ন আর কেহ করে নাই, আমাকে তুমি প্রতারণা করিতে পারিবে না, বরং নিজ দোষ সহজে স্বীকার কর।"

মনোরমা, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "না ধর্ম্ম অবতার! আমি ইহার কিছুই জানি না। আমি যাহা করি নাই কিরূপে তাহা করিয়াছি বলিয়া স্বীকার করিব!" বিচারপতি বলিলেন, "রাজ কুমারীর একটী দাসী তোমার হাতে সেই আংটী দেখিয়াছে, আর মিথ্যা কথা বলিও না!" তখন তাঁহার আজ্ঞায় নিকটস্থ ভৃত্যেরা মায়াকে তথায় উপস্থিত করিল।

আমরা বিচারের কথা পরিত্যাগ করিয়া রাজবাটীতে মায়া কি অবস্থায় ছিল তাহা পাঠক পাঠিকাকে জ্ঞাপন করিব।

রাজকুমারী হেমলতা মনোরমাকে মহামূল্য বস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহাকে দেন নাই এই

হিংসায় ও রাগে মায়া জ্বলিয়া উঠিল এবং যাহাতে মনোরমা কুমারীর চক্ষুঃশূল হয় তাহা করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইল। সে রাজ বাটীর চারি দিকে সকলের কাছে বলিয়া বেড়াইল—"আংটী আর কে নেবে, সেই হতভাগা চাষার মেয়েটারই এই কাজ, যখন সে রাজ কন্যার গৃহ হইতে নামিয়া আসিতেছিল আমি তার হাতে সেই হীরার আংটী দেখিয়াছি, সে যেই আমায় দেখিল অমনি চম্‌কিয়া উঠিল, এবং তাড়াতাড়ি আংটী-টাকে কাপড়ের ভিতর লুকাইয়া ফেলিল। আমি তখন জোর করিয়া তাহার কাপড় দেখিলাম না, ভাবিলাম রাণীমা আংটীটা উহাকে দিয়া থাকি-বেন; তিনি তাহাকে বড় ভাল বাসেন এবং ইহার আগেও অনেক জিনিস দিয়াছেন। আরও ভাবিলাম যদি সে ঐ আংটী চুরী করিয়া থাকে তাহা হইলে এখনি আংটীর খোঁজ পড়িবে, তখন আমি যাহা দেখিয়াছি বলিয়া দিব। ভাগ্যবলে আমি সে সময়ে ঘরে ছিলাম না, তাহা হইলে মেয়েটা হয়ত আমাকেই চোর বলিয়া ধরাইয়া দিত।" রাজপরিবারগণ মনে করিল মায়া যাহা বলিতেছে ইহাই ঠিক।

মায়া বিচারপতির পার্শ্বে সাক্ষীরূপে দণ্ডায়-মান হইল, বিচারক বলিলেন,—"মায়া! ঈশ্বর সকল স্থানে আছেন তাঁহার সমক্ষে সত্য করিয়া বল তুমি আংটীর বিষয় কি জান?"

মায়ার বুক কাঁপিয়া উঠিল এবং তাহার পা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল কিন্তু রাক্ষসী বিচারপতির কথায় বা নিজের বিবেকের কথায় কর্ণপাত করিল না—ভাবিল "যদি আমি সত্য বলি তবে আমার কাজটিত যাবেই, লাভের মধ্যে আমাকে কারাগারে বন্দিনী হইতে হইবে, তাহা হইবে না।" সে বলিল, "মনোরমা তোর মনে এত ছিল, আংটী আমি যে তোর হাতে দেখিয়াছি এখন অস্বীকার কর্‌ছিস কি করে?"

মনোরমা তাহার মিথ্যা কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল, সে মায়ার মত নহে যে তাহাকে ফিরা-ইয়া কটু বলিবে; অবিরল ধারে তাহার নয়ন হইতে অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"তুমি মিথ্যা বলিতেছ, তুমি কখন আমার হাতে আংটী দেখ নাই, কেন তুমি অকারণে আমার সর্ব্বনাশ করিতেছ, আমি ত তোমার কোন অনিষ্ট করি নাই।"

কিন্তু মায়ার মন কিছুতেই বিচলিত হইবার নয়, সে নিজের ইষ্ট অনিষ্ট খুব বুঝে। মায়া ক্রমাগত এক কথাই বলিল। বিচারপতি নানারূপে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না—মায়া বড় চতুর।

তখন বিচারপতি বলিলেন "মনোরমা তুমি নিশ্চয়ই দোষী, মায়া তোমার হাতে আংটী দেখি-য়াছে, এবং এই সমস্ত ঘটনাগুলি দেখিলে বোধ হয় তুমি ভিন্ন আর কেহ একাজ করে নাই, আংটী কোথায় রাখিয়াছ বল।"

মনোরমা তখনও সেই এক কথা বলিল,—বিচারক আজ্ঞা দিলেন, "যতক্ষণ না দোষ স্বীকার করিবে ততক্ষণ ইহাকে বেত্র প্রহার কর" কিন্তু কিছুতেই সত্য মিথ্যা হয় না। প্রহার খাইয়াও মনোরমা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, বলিল, "আমি কিছু জানি না, কিছু জানি না" হায়! কেহই তাহার কথা শুনিল না।

অবশেষে তাহাকে আবার কারাগারে পাঠান হইল। মনোরমার দশা দেখিলে আজ পাষা-ণও গলিয়া যায়, তাহার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে, পূর্ব্বের শ্রী কিছুই নাই, শরীর ক্ষত বিক্ষত

হইয়াছে এবং ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে। প্রহা-রের বেদনায় সে অস্থির হইল, সেদিন অনাহারেই কাটিয়া গেল এবং রাত্রে অনেকক্ষণ চক্ষু বুজিল না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষে হরিকে প্রাণের সকল জ্বালা নিবেদন করিল। পরে সে কতক শান্তি বোধ করিয়া নিদ্রাভিভূত হইল।

পরদিন আবার তাহাকে বিচার গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। বিচারপতি দেখিলেন বল প্রয়োগে কোন ফল হইল না, তিনি এখন মিষ্ট কথায় ও প্রতারণা বাক্যে মনোরমার মনের কথা জানিতে চেষ্টা করিলেন, বলিলেন, "তুমি জান চুরি করার শাস্তি প্রাণ দণ্ড, তোমায় এই দণ্ড পাইতে হইবে। কিন্তু এখনও যদি বল কোথায় আংটী রাখিয়াছ তাহা হইলে আমি তোমায় ছাড়িয়া দিব। কাল তোমায় যে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট হইবে, আর কিছুই দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে না, তোমার পিতাকেও ছাড়িয়া দিব, আবার সুখে বাড়ী ফিরিয়া যাইবে এখনও বল আংটী লইয়া কি করিয়াছ? মৃত্যু ও জীবন তোমার কথার উপর নির্ভর করিতেছে, দেখ আমি তোমার মঙ্গ-লের জন্যই বলিতেছি।"

মনোরমা একই কথা বলিল। বিচারপতি আশ্চর্য্য পিতৃভক্তি বুঝিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "দেখ মনোরমা তুমি যদি তোমার আপনার প্রাণের উপর যত্ন না কর, বৃদ্ধ পিতার কথা যেন তোমার মনে থাকে। তোমার পিতার শুভ্র-কেশযুক্ত মস্তক জল্লাদের অস্ত্রের দ্বারা দুই খণ্ড হইবে, তাহা কি দেখিতে ইচ্ছা কর? তোমার পিতার পরামর্শে তুমি তোমার দোষ স্বীকার করিতেছ না, তাহা কি আমি বুঝি নাই?"

মনোরমা এই কথা শুনিয়া ভয়ে মৃতপ্রায় হইল, সে জড়ের ন্যায় বিহ্বলের ন্যায় তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার মুখে কথা সরিল না।

কঠিন হৃদয় বিচারপতি তবুও বলিলেন, "স্বীকার কর, "হাঁ" এই সামান্য কথায় তোমার পিতার জীবন রক্ষা হইবে।"

তখন সে একবার ভাবিল "যদি একটা মিথ্যা কথা বলিলে পিতার প্রাণ রক্ষা হয় ক্ষতি কি, বলি, আমি আংটী লইয়াছিলাম বটে কিন্তু পথে আসিবার সময় হারাইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার মনের ভিতর হইতে তখনি কে বলিল 'না মনো-রমা মিথ্যা বলিও না সত্য বল যাহা হয় হইবে, মিথ্যার সমান পাপ নাই'; মনোরমা অন্তরে ঈশ্বরকে ডাকিয়া বলিল, দয়াময় হরি তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর আমাদিগকে হয় রাখ, নয় মার।"

মনোরমা কাতরস্বরে তখন বলিল "যদি আমি বলি আমি আংটী লইয়াছি তাহা হইলে আমার মিথ্যা বলা হইবে আমি আপনার প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য মিথ্যা বলিব না, কিন্তু যদি প্রাণ দণ্ড গ্রহণ করা হয় তবে যেন শুধু আমারই প্রাণ দণ্ড হয়, আমার বৃদ্ধ পিতাকে যেন কোন শাস্তি না দেওয়া হয়! বৃদ্ধ বলিয়া তাঁহার প্রতি দয়া করুন। আমি তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য অকা-তরে প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি।"

উপস্থিত ব্যক্তিগণ বালিকার কথা শুনিয়া গলিয়া গেল, কঠিন প্রাণ বিচারকেরও হৃদয় গলিল, তিনি আর কোন কথা কহিলেন না। ধন্য মনোরমা তোমার ঈশ্বর বিশ্বাস! ধন্য তোমার সত্যবাদিত্ব! ধন্য তোমার পিতৃভক্তি!

জানোয়ারের বুদ্ধি।

আবার পাঠক পাঠিকা! তোমাদিগকে গুটিকত জানোয়ারের বুদ্ধির গল্প শুনাইব। তোমরা জান হাতি বড় বুদ্ধিমান জন্তু। হাতির বুদ্ধির অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প শুনিতে পাওয়া যায়, তোমরাও অনেক গল্প শুনিয়া থাকিবে। আজ আর একটা শুন। দুই জন ইংরাজ একদেশে বাস করিতেন। তাহারা পরস্পরের বন্ধু। এই দুই জন ইংরাজের মধ্যে একজনের একটী হাতি ছিল। তিনি হাতিটীকে বড় ভাল বাসিতেন। একবার কোন কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে হয়। তখন তিনি তাঁহার বন্ধুর বাড়ীতে হাতিটীকে রাখিয়া যান। তাঁহার বন্ধুর স্ত্রীর হাতিটীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল, পাছে তত্বাবধানের ত্রুটিতে হাতিটী রোগা হইয়া যায়, মনে এই ভয় ছিল, এই জন্য তিনি সর্ব্বদা হাতিটী তদারক করিতেন। কিন্তু কিছুদিন বাদে দেখা গেল যে, হাতিটী রোগা হইয়া যাইতেছে। দেখিয়া বিবি বড় ভাবিত হইতে লাগিলেন। ভিতরের কথা এই, যে ঐ হাতির মাহুত বড় দুষ্ট লোক। সে প্রত্যহ হাতির খোরাকের দানা হইতে এক এক পুটুলি দানা লুকাইয়া রাখিত, এবং তাহা চুরি করিয়া বিক্রয় করিত। বিবি তাহা ধরিতে পারিতেন না বলিয়া কিছু বলিতে পারিতেন না, কিন্তু তাঁহার মনে মনে সন্দেহ থাকিয়া যাইত। একদিন হাতির আহারের সময় তিনি স্বয়ং আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু ঐ দুষ্ট মাহুত বিবি আসিবার পূর্ব্বেই এক পুটুলি দানা চুরি করিয়া নিজের বগলে রাখিয়াছিল; এবং একখানি কম্বলে আপনার সমুদায় শরীর ঢাকিয়া, সাধু সাজিয়া অনেক মিষ্ট কথা বলিতেছিল। মেম যখন তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন "তুই নিশ্চয় হাতির দানা চুরি করিস্ নতুবা হাতি রোগা হইতেছে কেন? সে ভদ্রলোক বিশ্বাস করিয়া আমার নিকটে হাতিটী রাখিয়া গিয়াছে, আমি হাতিটী রোগা করিয়া ফিরাইয়া দিব কি?" সেই দুষ্ট মাহুত মিষ্ট বচনে বলিল "মেম! আমি কি উহার আহারের দানা চুরি করিতে পারি; ও আমার বেটী, আমার মাণিক।" এই বলিয়া হাতিকে অনেক আদর করিতে লাগিল। দানার পুটুলিটী তখনও তাহার বগলে আছে। সে যখন দানা চুরি করে হাতি তখন দেখিয়াছিল, এবং সে যে পুটুলিটী বগলে লুকাইয়া রাখিয়াছে তাহাও হাতি জানিত। সুতরাং যখন সে কপট ভালবাসা দেখাইয়া অনেক আদরের কথা বলিতেছে, তখন হাতি খস্ করিয়া তাহার গলার কম্বলখানি কাড়িয়া লইল এবং বগল হইতে পুটুলিটী টানিয়া বিবির সমক্ষে ফেলিয়া দিল। কি বুদ্ধি!

ক্রমশঃ

ধাঁধা।

গত সেপ্টেম্বর মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। ৩৬ পয়সা লোকসান হইয়াছিল।

সখা

চতুর্থ ভাগ। দ্বাদশ সংখ্যা।

ডিসেম্বর, ১৮৮৬।

জানোয়ারের বুদ্ধি।

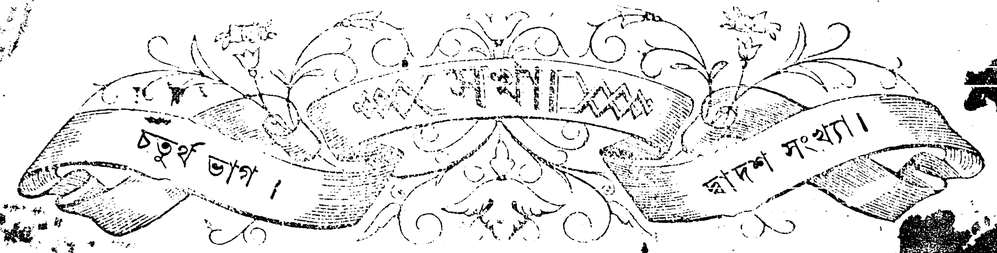

আর একটী হাতির বুদ্ধির কথা শোন। একটী হাতির একজন মাহুত ছিল। সে মাহুত সস্ত্রীক হাতির কাছেই থাকিত। মাহুতের স্ত্রী হাতিকে ভাল বাসিত, হাতিও তাহাকে ভাল[illegible]সিত। [illegible] মাহুত আপনার স্ত্রীর সহিত ঝগড়া করিয়া একদিন রাত্রে তাহাকে [illegible]রিয়া ফেলিল, এবং তাহার মৃত দেহ নিকটেই একস্থানে [illegible] রাখিল। [illegible] এক দিনের মধ্যেই আর একটী স্ত্রীলোককে বিবাহ করিবে [illegible]লিয়াই বোধ হয় পূর্ব্ব স্ত্রীকে [illegible]। যাহা হউক সে নূতন স্ত্রীকে আনিয়া হাতির সহিত প্রথমে পরিচয় করিয়া দিল। বলিল এই তোর স্বামিনী, তুই ইহার কথা মান্য করিস্। হাতি সেই হত্যা কাণ্ড [illegible]ক দেখিয়াছিল; সুতরাং সে যখন নবাগত স্ত্রীকে পরিচয় করিয়া দিতেছিল, তখন হাতি মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তখন কিছু বলিল না। পরে মাহুত যখন বাহিরে গেল, তখন হাতি সেই স্ত্রীলোককে একেলা পাইয়া তাহাকে শুঁড় দিয়া ধরিল ও টানিয়া লইয়া তাহার পূর্ব্ব স্ত্রীকে যেখানে গোর দেওয়া হইয়াছিল সেখানে লইয়া গেল, এবং দন্তের দ্বারায় গোর খুঁড়ি[illegible] লাগি[illegible] খুঁড়িয়া খুঁ[illegible] শরীরটী বাহির করিয়া সেই স্ত্রী[illegible] ফেলিয়া দিল। হাতির বাক্‌শক্তি থাকিলে হয়ত বলিত "দেখ্ নির্ব্বোধ স্ত্রীলোক, কিরূপ পুরুষকে বিবাহ করিয়াছিস্।"

তোমরা জান ইংরজেরা কুকুরকে বড় ভাল বাসে। সাধে কি এত ভালবাসে, কুকুরের মত প্রভুর উপকারী বন্ধু মানবের অতি অল্পই আছে। তবে একটী কুকুরের গল্প শুন। স্কট্‌লণ্ড দেশের নাম কি শুনিয়াছ, নিশ্চয়ই শুনিয়াছ, স্কট্‌লণ্ড দেশ ইংলণ্ডের উত্তরে। তোমরা ম্যাপ খুলিয়া দেখিবে। স্কট্‌লণ্ড দে[illegible]। সেখানকার মেষপালকদিগকে পাহাড়ের উপরে মেষ চরাইতে হয়। একবার স্কট্‌লণ্ডের একজন মেষপালক এক পাহাড়ের উ[illegible]ষ চরাইতে গিয়াছিল তাহার সঙ্গে একটী কুকুর ও তাহার একটী ৪ চারি বৎসরের ছেলে ছিল। সে ব্যক্তি মেষ চরাইতেছে, ছেলেটি কুকুরের সহিত খেলা করিতেছে এমন সময়ে হঠাৎ কুয়াসাতে দিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ইংলণ্ড স্কট্‌লণ্ড প্রভৃতি শীত প্রধানদেশে সময়ে সময়ে এইরূপ হঠাৎ কুয়াসা হইয়া থাকে। তখন আর পথ ঘাট দেখিতে পাওয়া যায় না। কুয়াসা কয়েক ঘণ্টা থাকে,

পরে কাটিয়া যায়। সেদিন্ কুয়াসা হইয়া একেবারে পাহাড় ছাইয়া ফেলিল। সে ব্যক্তি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কুকুরটীকে সঙ্গে করিয়া মেষ খুঁজিতে গেল। ছেলেটীকে একটী স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া গেল। মেষ খুঁজিয়া সংগ্রহ করিতে তাহার কিছুক্ষণ বিলম্ব হইল। আসিবার সময় কুয়াসা এত গাঢ় হইয়াছে যে, আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। ছেলেরও সাড়া শব্দ নাই। নাম ধরিয়া সেই ঘন কুয়াসার মধ্যে বার বার ডাকিতে লাগিল। উত্তর নাই, অবশেষে ভাবিল, বাড়ী ত নিকটে, যদি হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া বাড়ী গিয়া থাকে। তাড়াতাড়ি বাড়ীতে গিয়া দেখে সেখানেও নাই। তখন সর্ব্বনাশ! রাত্রি সমাগত, কোথায় অন্বেষণ করে। তাহার স্ত্রী আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। ক্রমে জানিতে পারিল কুকুরটীও পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসে নাই। দুশ্চিন্তায় ও মনের ক্লেশে রাত্রি পোহাইয়া গেল। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র শোকার্ত্ত পিতা আবার শিশুর অন্বেষণে বাহির হইল। পাহাড়ে পাহাড়ে, ঝোপে জঙ্গলে, গুহাতে খুঁজিয়া বেড়াইল; কোন স্থানে পুত্রের সন্ধান পাইল না। নিরাশ মনে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল; আসিয়া শুনিতে পাইল যে, কুকুর তাহার আহারের সময়ে যথাকালে কোথা হইতে আসিয়াছিল, নিজের খাবার খাইয়া চলিয়া গিয়াছে। সমস্ত দিন কুকুরটীর দেখা সাক্ষাৎ নাই, মেষপালক শিশু অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। আর এক রাত্রি দুঃসহ যাতনায় কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতে আবার সেই অনুসন্ধানে বাহির হইল। তাড়ি বিতাড়ি করিয়া খুঁজিতে লাগিল। কোন স্থানেই উদ্দেশ পাওয়া গেল না। আর একদিন কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিন প্রাতে মেষপালক মনে করিল যে, সে দিন আর বাহিরে যাইবে না, ঝুমুর খাইয়া কোথায় যায় দেখিতে হইবে। সে দিন প্রাতে কুকুর যথা সময়ে খাইতে আসিল, কিন্তু তাহার প্রভু দেখিল যে, সে সমুদয় খাবার না খাইয়া বড় একখান রুটি খণ্ড মুখে করিয়া লইয়া চলিয়াছে। তখন সে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। গিয়া দেখে শিশুটী পাহাড়ের অনেক শত হাত নীচে গড়াইয়া পড়িয়া এক গুহার মধ্যে আশ্রয় লইয়া আছে। সেখানে নিরাপদে এক পাথরের উপরে বসিয়া কুকুরের দত্ত রুটী খণ্ড খাইতেছে। তখন তাহার কি আনন্দ হইল! কুকুর! তোমার এই গুণ সকল মানুষের নাই!

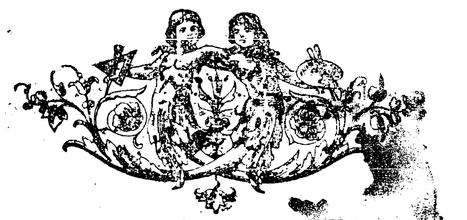

পরেশ ও তাহার পিতা।

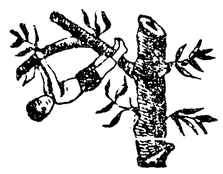

পরেশদের বাটীর সম্মুখস্থ বাগানটী নানাবিধ ফুলের গাছে সুসজ্জিত। মধ্যস্থলে খানিকটা গোলাকার খালি জমি; তাহাতে নূতন দুর্ব্বাঘাস সবুজ মখমলের ন্যায় শোভা পাইতেছে; দেখিলেই তাহার উপর শুইয়া পড়িতে ইচ্ছা করে। বাগানের পরেই দোতালা বাড়ী। তাহার আলিসা ও জানালার সম্মুখের কার্নিস সমস্ত ফুলের টব

দিয়া সাজান। বাহির দরজার উপরে যে জানালা, তাহার সম্মুখের টবটী চীনামাটি দ্বারা নির্ম্মিত ও অতি সুন্দররূপে চিত্রিত। ইহাতে একটী গোলাপ ফুলের গাছ। উহা যে সে গোলাপ নহে; উহার ফুল খুব বড় বড় এবং তাহার গন্ধ অতি চমৎকার। পরেশের বাপ অনেক মূল্য দিয়া এই গোলাপ গাছশুদ্ধ টবটী কিনিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেশের জন্মদিন উপলক্ষে তাহাকে উপহার দিয়াছিলেন। সুরেশ এই গাছটীকে অত্যন্ত যত্ন করিত; যখন ইহার কুঁড়ি ধরিত তখন সুরেশের কতই আহ্লাদ! কতদিনে ফুল ফুটিবে সুরেশের মন তাহার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিত। কয়েক দিন হইল গাছটীতে ছোট বড় প্রায় সাত আটটী কুঁড়ি ধরিয়াছে।

বৈশাখ মাস; বেলা প্রায় ছয়টা বাজে বাজে; বাগানের খালি জমির উপর বাটীর ছায়া পড়িয়াছে; পরেশের পিতা সেইখানে একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া পুস্তক পড়িতেছেন; সুরেশ গাছে দিবার জন্য নীচে জল আনিতে গিয়াছে;—এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ হইল, ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলা ভাঙ্গা টবের কুচি পরেশের পিতার পায়ের নিকট ছিট্‌কাইয়া পড়িল। পরেশের পিতা একটু চমকাইয়া উঠিয়া যে দিকে শব্দ হইল সেইদিকে চাহিবামাত্র দেখিলেন,—সুরেশের সাধের টবটী জানালা হইতে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

সুরেশের মা পার্শ্বের ঘরে জিনিস পত্র গুছাইতেছিলেন, তিনি সিঁড়ি হইতে, "হায়! হায়! কে সুরেশের টব ভাঙ্গিল? দেখত ঝি!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঝিকে ডাকিতে লাগিলেন। সুরেশ ছল ছল চক্ষে ভাঙ্গা টবের দিকে চাহিয়া পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

ঝি তাড়াতাড়ি উপরে গেল। পরেশের মা বলিলেন, "আমাদের বাগানের সমস্ত গাছ নষ্ট হইলেও আমার এত দুঃখ হইত না। আহা এমন সুন্দর টব! এমন সুন্দর ফুল ধরিতেছিল! সুরু আমার গাছটীকে কত যত্ন করিত! আহা! বাছা আমার গত শ্রাবণ মাসে জন্মদিন উপলক্ষে গাছটী পাইয়াছিল। এ নিশ্চয় দুরন্ত পরেশেরকর্ম্ম।"

এই সময়ে পরেশের পিতা ও সুরেশও উপরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ঝি বলিল, "যদি মা পরেশ টব ফেলিয়া থাকে, তবে দৈবাৎ ফেলিয়াছে। ওর দাঁড়াইবার দোষে টব পড়িয়া গিয়াছে; পরেশ ইচ্ছা করিয়া টব ফেলে নাই। কি বল, পরেশ?" এই বলিয়া সে পরেশের কাণে কাণে বলিল, "বল না, তা না হ'লে তোমার বাবা বড় রাগ করিবেন।"

পরেশের মা বলিলেন, "আমার বোধ হয় তাহাই হইবে। দেখো বাবা, আর কখনও এমন কাজ করিও না। আমি বুঝিয়াছি তোমার দাদার ও আমাদের মনে কষ্ট দিয়া তুমি দুঃখিত হইয়াছ। এস আমার কোলে এস।"

পরেশ বলিল, "না মা, তুমি আমাকে কোলে করিও না। আমি বড় দুষ্ট: আমি ইচ্ছা করিয়া টব ফেলিয়া দিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া পরেশের পিতা পরেশের কাছে গিয়া বলিলেন,—"বটে! তা কেন এমন কাজ করিলে?"

পরেশ লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া বলিল, "বাবা, তুমি কেমন চমকিয়া উঠ, তাই দেখিবার জন্য টব ফেলিয়াছিলাম। আমি বড় অন্যায় করিয়াছি। তুমি আমাকে মার; খুব মার।"

পরেশের পিতা পরেশকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "বাপু! তুমি অন্যায় কাজ করি-

য়াছ। কিন্তু তুমি শাস্তি পাইবার ভয় সত্ত্বেও সত্য কথা কহিয়াছ বলিয়া আমি জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম,—ইহা যদি চিরজীবন তোমার স্মরণ থাকে তাহা হইলে এ সমস্ত দোষ কাটিয়া যাইবে। দেখ ঝি! তুমি যদি পুনরায় কখনও ইহাকে এই রকমে মিথ্যা কথা কহিতে শিখাও, তাহা হইলে তোমাকে অন্যত্র চাকরির চেষ্টা দেখিতে হইবে।" এইরূপে সেদিনকার ব্যাপার চুকিয়া গেল।

পরেশের পিতার স্বভাব ছিল যে, তিনি সোজা সুজি 'এই কর,' ঝি 'অমুক কাজ করিও না' বলিয়া উপদেশ দিতেন না। কোন্ অবস্থায় কিরূপ কাজ করিতে হইবে তিনি কেবল তাহার আভাস দিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন। তাহার পর তুমি নিজে বুদ্ধি খাটাইয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লও। উপরের বর্ণিত ঘটনার কিছুদিন পরে পরেশের পিতার একবন্ধু পরেশকে হাতীর দাঁতের গুটিকতক সুন্দর খেলানাশুদ্ধ একটী বাক্স দিয়াছিলেন। তাহা পাইয়া পরেশের অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল। সে রাত্রি দিন ঐ সকল খেলানা লইয়া খেলা করিয়াও তৃপ্ত হইত না; এবং শয়নকালে খেলানা বাক্সটী মাথার বালিসের কাছে রাখিয়া ঘুমাইত।

একদিন পরেশের পিতা বলিলেন, "তুমি অন্য সকল খেলানার চেয়ে এইগুলিকে অধিক ভাল বাস, না?"

পরেশ বলিল, "হাঁ, বাবা।"

"আচ্ছা, সুরেশ যদি তোমার এই খেলানা বাক্সটী জানালা হইতে ফেলিয়া দিয়া সব ভাঙ্গিয়া দেয়, তাহা হইলে তোমার মনে কষ্ট হয় না কি?"

পরেশ অত্যন্ত কাতরভাবে পিতার দিকে চাহিয়া রহিল, কোন উত্তর করিল না।

পরেশের পিতা বলিতে লাগিলেন, "ভাল, তুমি গল্পে যে সকল বাজিকরের কথা শুনিয়াছ তাহাদের একজন যদি মন্ত্রের জোরে তোমার এই খেলানার বাক্সটীকে একটী গোলাপ গাছ শুদ্ধ সুন্দর চীনামাটির টব করিয়া দেয় এবং তোমাকে ঐ টবটী লইয়া তোমার দাদার ঘরের জানালায় রাখিতে দেয়, তাহা হইলে বোধ হয় তোমার খুব আনন্দ হয়?"

পরেশ কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "হাঁ বাবা, তাহা হইলে নিশ্চয় আমার অত্যন্ত আহ্লাদ হয়।"

পরেশের পিতা বলিলেন, "আমি বিশ্বাস করি যে তুমি এ কথা মনের সহিত বলিতেছ। কিন্তু কেবল সাধু ইচ্ছায় অসৎ কার্য্যের দোষ খণ্ডন হয় না। সৎকার্য্য করা চাই।"

এই বলিয়া তিনি দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার অভিপ্রায় কি, পরেশ ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কিন্তু সেদিন কেহ পরেশকে ঐ বাক্স লইয়া আর খেলা করিতে দেখে নাই। পরদিন প্রাতঃকালে পরেশের পিতা দেখিলেন পরেশ একটী বাগানে একটী গাছতলায় বসিয়া আছে। তিনি সেই দিক্ দিয়া যাইতে যাইতে পরেশকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাহার মুখের দিকে গম্ভীর ভাবে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"বাবা পরেশ, আমি বাহিরে বেড়াইতে যাইতেছি। তুমি আমার সঙ্গে আসিবে? ভাল কথা, তোমার খেলানার বাক্সটী অমনি হাতে করিয়া আনিও। আমি সেটী একজনকে দেখাইতে ইচ্ছা করি।" দৌড়াইয়া ঘরে গিয়া বাক্সটী লইয়া আসিল এবং পিতার সঙ্গে বেড়াইতে যাইবে এই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার সহিত বাটী হইতে বহির্গত হইল।

পথে যাইতে যাইতে পরেশ বলিল, "বাবা, এখনও আর সে রকম বাজিকর নাই?"

"কেন, তাহাতে কি?"

"তবে কেমন করিয়া আমার খেলার বাক্সটী গোলাপ গাছের টব হইবে?"

পরেশের পিতা বলিলেন, "বাবা যাহাদের ভাল কাজ করিবার আন্তরিক ইচ্ছা আছে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে দুইজন বাজিকর থাকে। একজন এইখানে" এই বলিয়া পরেশের পিতা পরেশের বক্ষস্থলে হাত দিলেন এবং তাহার পর তাহার কপালে হাত দিয়া বলিলেন, "আর একজন এইখানে থাকে।"

"বাবা, আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না।"

"বুঝিতে চেষ্টা কর। বিলম্ব হইলে ক্ষতি নাই।"

এইরূপে কথা কহিতে কহিতে তাঁহারা এক ফুলগাছ বিক্রেতার গৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং নানা প্রকারের গাছ দেখিতে দেখিতে একটী সুন্দর গোলাপ ফুলের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। পরেশের পিতা গাছটী দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "আহা! সুরেশ যে গাছটী ভাল বাসিত, এটী যে দেখিতেছি তাহার চেয়ে ভাল। এ গাছটীর দাম কত গা?" মালী বলিল, "আজ্ঞা, চারিটাকা।" পরেশের পিতা পকেট হইতে হাত তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "তবে আজি আর হইল না। আজি সঙ্গে অধিক টাকা নাই।"

তাহার পর পিতাপুত্রে সহরের মধ্যে একজন চীনাবাসনওয়ালার দোকানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে আসিয়া পরেশের পিতা দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি গত শ্রাবণ মাসে যেমন একটী ফুলের টব লইয়াছিলাম, সেরকম টব আর আছে?" এবং সম্মুখে সেইরূপ একটী টব দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "ইহার দাম কত?" দোকানদার বলিল, "দুই টাকা।" তাহার পর পরেশের পিতা দোকান হইতে বাহিরে আসিয়া পরেশকে বলিলেন, "তোমার দাদার আগামী জন্মদিনে তাহাকে আর একটী গোলাপফুলের টব কিনিয়া দেওয়া যাইবে। যদি তাহার এখনও কয়েকমাস বিলম্ব আছে, তাহাতে ক্ষতি নাই। গোলাপ ফুল ত দুই দিনে শুকাইয়া যায়, কিন্তু সত্যের সৌন্দর্য্য কখনও মলিন হয় না; আর যে প্রতিজ্ঞার কখনও ভঙ্গ হয় না, চীনাবাসনের অপেক্ষা তাহা অধিক মূল্যবান্।"

পরেশ এতক্ষণ মাথাহেঁট করিয়াছিল। পিতার শেষ কথা শুনিয়া সে মাথা তুলিয়া কথা কহিবার উপক্রম করিল; কিন্তু আনন্দে তাহার কথা সরিল না।

তাহার পর পরেশের পিতা একজন খেলানা বিক্রেতার দোকানে প্রবেশ করিয়া দোকানদারকে বলিলেন, "আমার কাছে তোমার যে টাকা পাওনা আছে অদ্য তাহা দিতে আসিয়াছি। আর এক কথা মনে পড়িল, গত বৎসর তোমার দোকান হইতে আমি যে একটী হাতীর দাঁতের বাক্স কিনিয়া ছিলাম তাহার অপেক্ষা আমার ছেলের এই খেলানার বাক্সটীর কাজ কত পরিষ্কার দেখ দেখি। পরেশ! বাক্সটী দেখাও ত, সকল জিনিসের দাম জানিয়া রাখা ভাল? কেননা এক সময় হয় ত তাহা বিক্রয় করিবার ইচ্ছা হইতে পারে। যদি আমার ছেলে মনে করে যে এই খেলানার বাক্সে তাহার আর দরকার নাই, তাহা হইলে কতদাম দিয়া তোমরা এটী কিনিতে পার?"

দোকানদার বলিল, "নয় টাকার অধিক দিতে পারি না আর যদি আপনার ছেলে দোকা-

নের এই সব সুন্দর খেলানার মধ্য হইতে কোন জিনিস পছন্দ করিয়া লন তবে সে ভিন্ন কথা।”

পরেশের পিতা বলিলেন, “তবে তোমরা নয় টাকায় এটী কিনিতে পার? আচ্ছা দেখ পরেশ, যদি কখনও তোমার এই খেলানার বাক্সে প্রয়োজন নাই বলিয়া মনে হয়, তবে তুমি ইহা তখনই বিক্রয় করিতে পার। আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই।”

পরেশের পিতা দোকানদারকে তাহার প্রাপ্য টাকা দিয়া চলিয়া আসিলে পরেশ কিন্তু একটু বিলম্বে দোকান হইতে বাহির হইয়া আসিল। এবং দৌড়িয়া পিতার নিকট আসিয়া আনন্দে হাততালি দিতে দিতে বলিল, “বাবা, এই দেখ এখন আমরা সেই গোলাপ গাছ ও সেই চীনামাটির টব কিনিতে পারিব।” এই বলিয়া পরেশ পকেট হইতে কতকগুলি টাকা বাহির করিল।

পরেশের পিতা রুমাল দিয়া চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন, “আমি কি ঠিক্ কথা বলি নাই? তুমি সেই দুইজন বাজিকরের দেখা পাইয়াছ!”

* * * *

সেদিন বাড়ী ফিরিবার পর গোলাপ গাছশুদ্ধ টবটি সুরেশের ঘরের জানালায় রাখিয়া পরেশ যখন মাকে ও সুরেশকে উহা দেখাইবার জন্য ডাকিতে গেল, তখন তাহার আনন্দের সীমা দেখে কে?

পরেশের পিতা বলিলেন, “পরেশের কর্ম্ম; উহার টাকাতেই ফুলের টব আসিয়াছে। পরেশ সৎকর্ম্ম দ্বারা অসৎকর্ম্মের দোষ খণ্ডন করিয়াছে।”

সমস্ত ঘটনা শুনিয়া পরেশের মা বলিলেন, “সে কি কথা? আহা! বাছা আমার যে সেই খেলানার বাক্সটী বড় ভালবাসিত। তুমি আজি বৈকালেই যত দাম লাগে দিয়া বাক্সটী কিনিয়া আনিও। আমি টাকা দিব।”

সুরেশ কহিল, “বাবা, মার কাছে আমার বার টাকা আছে। আমার সে টাকাতে কোন দরকার নাই। তুমি সেই টাকা দিয়া পরেশের বাক্স আনিয়া দিও।”

পিতা বলিলেন, “কি বল পরেশ? বাক্সটী কি ফিরাইয়া আনিব?”

“না বাবা, না। তা হ’লে আমার আহ্লাদ করিবার আর কি রহিল?” এই বলিয়া পরেশ পিতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন পরেশের পিতা তাঁহার স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—“দেখ আমি সন্তানদিগকে যে সকল শিক্ষা দিতে চাই তাহার মধ্যে স্বার্থত্যাগের সুখ ও পবিত্রতা সর্ব্বপ্রধান। চিরজীবন উহাদিগের এই শিক্ষা পাওয়া উচিত বলিয়া আমার বিশ্বাস। অতএব যাহাতে এই সুশিক্ষা নিস্ফল হইয়া যায় তাহা করিবার প্রয়োজন নাই।”

দীপশিখা।

এবারে আমরা দীপশিখা সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম; এখন সেই প্রতিজ্ঞা পালন করা যাইতেছে।

আমাদের কথাগুলি পরিষ্কার বুঝিতে হইলে একটী প্রদীপ জ্বালিয়া সামনে রাখ। প্রদীপের তেল পলিতার ভিতরদিয়া আস্তে আস্তে ঊর্দ্ধগামী হইতেছে। পলিতার মুখে তুমি আগুন লাগাইয়া দিয়াছ সুতরাং এই ঊর্দ্ধগামী তৈল ঐ আগুনের কাছে আসিয়াই গরমে বাষ্প হইয়া যাইতেছে। এই বাষ্প আগুন পাইলেই জ্বলিয়া উঠে। সেই জ্বলন্ত বাষ্পকেই আমরা প্রদীপের শিখা বলি।

এখন দেখা যাউক এই বাষ্প জ্বলিবার সময় ব্যাপারটা কিরূপ হয়। বাতাসে অম্লজান বায়ু আছে; আর তেলের বাষ্প অম্লজানের সহিত মিশিয়া জলীয় বাষ্প ও কার্ব্বণিক য়্যাসিড্ বায়ুর সৃষ্টি করে। তেলের বাষ্পে যে জলজান বায়ু আছে তাহা অম্লজানের সহিত মিশিয়া জল হয়, আর উহাতে যে অঙ্গারের ভাগ আছে তাহা অম্লজানের সহিত মিশিয়া কার্ব্বণিক য়্যাসিডের উৎপত্তি হয়।

প্রদীপের শিখার প্রতি বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলে দেখিবে যে, তাহার গোড়ার দিকের কতকটা অংশ অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল। এই স্থানের ভিতরে একটী দেশলায়ের কাঠি ঢুকাইয়া দাও। কাঠিটী যাই একটু পুড়িতে আরম্ভ হইল, অমনি তাহাকে লইয়া আইস। এখন দেখিবে যে কাঠির যে স্থান দীপের ঠিক মধ্যস্থলে ছিল, সে স্থান জ্বলে নাই। তাহাতে এই বুঝা যায় যে দীপের ভিতরটা ফাপা, অর্থাৎ সেখানে আগুন নাই। বিশেষ অনুধাবন করিলে দেখিতে পাইবে যে, দীপের অত্যুজ্জ্বল অংশের চারিধারে অতি ক্ষীণ আলোক বিশিষ্ট একটী আবরণ আছে। তবে দেখিতেছি দীপের তিনটী অঙ্গ হইল। এইরূপ তিন অঙ্গ কেন হইল বলি, শুন।

পলিতার অগ্রভাগ হইতে ক্রমশঃ তৈল বাষ্প হইয়া উঠিতেছে। প্রথমে বাষ্পের জলজানের ভাগটুকু বাতাসের অম্লজানের সহিত মিশে। তখন জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হইয়া উড়িয়া যায়, আর অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অঙ্গারের কণাগুলি পৃথক হইয়া পড়ে। এইরূপ মিশিবার সময় সেই স্থানটা এত গরম হয় যে, ঐ অঙ্গারের কণাগুলি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে থাকে। এইরূপে দীপের শিখার সৃষ্টি হয়। দীপের শিখার ভিতরে যে ফাঁপা জায়গাটুকু দেখিয়াছ, তাহা কি জান? পলিতার মুখ দিয়া ক্রমাগত তেলের বাষ্প উঠিয়া ঐ স্থানে একত্র হইয়াছে। বাতাসের অম্লজান ক্রমে ক্রমে ঐ বাষ্পের সহিত মিশিবে, কিন্তু এদিকে আবার নূতন বাষ্প আসিয়া জমিবে; সুতরাং ঐ স্থানটুকু ঐ রূপ ফাপাই থাকিবে। ঐ উজ্জ্বল অংশের চারিধারেও যে আবার একটী আবরণ আছে দেখিলে, সেখানে কি হইতেছে জান? যে অঙ্গারের কণা তাতিয়া ঐ উজ্জ্বল অংশের সৃষ্টি করিয়াছে, সেই অঙ্গার এইস্থানে আসিয়া বাতাসের অম্লজানের সহিত মিশিয়া কার্ব্বনিক য়্যাসিড্ হইতেছে। আমরা যে প্রদীপের শিখাকে উজ্জ্বল দেখি তাহার কারণ ঐ অঙ্গার-কণাগুলি। সে গুলি কঠিন জিনিস। কেবল মাত্র কঠিন জিনিসই তাতিয়া উজ্জ্বল হইতে পারে। অঙ্গার-কণা গুলি যখন অম্লজানের সহিত মিশিয়া কার্ব্বনিক য়্যাসিড হইল, তখন আর তাহারা কঠিন রহিল না; কার্ব্বনিক য়্যাসিড একটা বায়ু, তাহা কঠিন জিনিস নহে। এই জন্যই বাহিরের ঐ স্থানটুকু উজ্জ্বল নহে।

আমরা দেখিলাম যে তেলের বাষ্প অম্লজানের সহিত মিশিতে যাইয়াই দীপশিখার সৃষ্টি করে। কিন্তু এইরূপ মিশিতে হইলে যথেষ্ট উত্তাপের

প্রয়োজন। ফু দিলে প্রদীপ নিভিয়া যায় কেন জান? ফু দিয়া প্রদীপ জ্বালিবার পক্ষে আমরা ব্যাঘাত জন্মাই; কারণ তৈলের বাষ্প অম্লজানের সহিত মিশিবার সময় যে উত্তাপের সৃষ্টি হইয়াছিল, ফু দিয়া সেই উত্তাপটাকে আমরা তাড়াইয়া দিই। তখন আর পলিতার মুখ হইতে বাষ্প উঠিয়াও উত্তাপের অভাবে অম্লজানের সহিত মিশিতে পারে না; সুতরাং তখন দীপশিখারও সৃষ্টি হয় না। শিখার যে উত্তাপটুকু ছিল, তাহারই তেজে তৈল এতক্ষণ বাষ্প হইয়া আসিতেছিল। এখন শিখা নাই, কাজেই এখন আর তেলও বাষ্প হইতে পারিতেছে না। তবে আর দীপ জ্বলিবে কি করিয়া?

ক্রমশঃ

প্রকাশের পরিবর্ত্তন।

প্রকাশের একটী রোগ ছিল, তিনি বুঝুন আর না বুঝুন সকল কথাতেই উত্তর করিতেন, ছেলে মানুষ হইয়া বুড়োদের মুখে মুখে তর্ক করিতেন। প্রকাশ যখন ক্লাশে পড়িতে বসিতেন তখন শিক্ষক মহাশয়ের সকল প্রশ্নের উত্তরেই তিনি মাথা নাড়িয়া মাতুব্বরী করিতে যাইতেন, অন্যকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইত তাহাতেও তিনি উপযাচক হইয়া হাত দিতেন। বাড়ীতে যখন কোন ভদ্রলোক তাঁহার পিতার সহিত কথোপকথন করিতেছেন তিনি সেইস্থানে উপস্থিত হইতেন এবং বৃদ্ধদের কথার ভিতর কথা কহিয়া পিতার বিরাগভাজন হইতেন। প্রকাশের শুধু এই একটী রোগ থাকিলে আর ভাবনার বিষয় ছিল না, অনেক রোগে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল।

লোকে ভাল বলুক, লোকে ভাল বাসুক এই ইচ্ছা প্রকাশের মনে বড় প্রবল ছিল। ভাল কাজ না করিলে যে লোকে সুখ্যাতি করে না, মধুর স্বভাব না হইলে যে লোকে ভালবাসিতে পারে না, এ বিবেচনা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অথচ যখনই তাঁহার দোষ দেখাইয়া তাঁহার পিতা মাতা কি আত্মীয় স্বজনেরা তিরস্কার করিতেন তখনই তিনি অভিমানে মুখ ফুলাইয়া কাঁদিতেন, কখন বা মাতাকে দুঃখ করিয়া বলিতেন, "লোকে কেবল আমার দোষই দেখে!"

প্রকাশ বোকার মত অনেক কথা কহিতেন, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছিল তিনি বুদ্ধিমান ছেলের ন্যায় কথা কহিতে পারেন। এই ভুল বিশ্বাসে তাঁহার বড় অনিষ্ট হইয়াছিল, তিনি বৃথা অভিমানী হইয়া লোকের কথা গ্রাহ্য করিতেন না, কেহ কিছু ভাল বলিলেও তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেন না এবং কাহারও নিকটে কিছু শিখিতে যাইতে নিজকে অপমানিত মনে করিতেন।

প্রকাশের এই সকল দোষ দূর করিবার জন্য তাঁহার পিতা, মাতা, শিক্ষক মহাশয় প্রভৃতি অনেকেই নানা উপায়ে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রকাশের মনে বড়ই ঘৃণার উদয় হইল। তিনি মনে মনে তাঁহার দোষের আলোচনা

করিতে লাগিলেন। অন্য লোকে তাঁহার দোষ দেখিয়া যত না তিরস্কার করেন, তিনি নিজে তাঁহার দোষগুলি পরিষ্কার বুঝিয়া নিজকে তার চেয়ে অধিক তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তাঁহার দোষ দূর করিবার জন্য এতদিন লোকেরা তাঁহাকে কত উপদেশ দিয়াছে, পিতা মাতা কত তিরস্কার করিয়াছেন, অধিক কি প্রহার করিতে পর্য্যন্ত ছাড়েন নাই, কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিশেষ কোন উপকার হইল না। যখন তিনি নিজের দোষের বিষয়ে নিজে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ভাল হইবার ইচ্ছা আগুনের ন্যায় যখন তাঁহার প্রাণকে পোড়াইতে লাগিল, তখন একে একে এই কয়েকটী সত্য তিনি নিজের জীবনে লাভ করিলেন।

(১) নিতান্ত দরকার না হইলে বৃথা কথা কহিব না, এবং খুব ভাল করিয়া না বুঝিয়া কাহারও কোন কথার উত্তর দিব না।

(২) উপযুক্ত না হইয়া কখনও কিছু পাইবার আশা করিব না এবং কেহ দিলেও গ্রহণ করিব না।

(৩) লোকে নিন্দা করিলে রাগ না করিয়া এই বুঝিব যে, আমার ভিতরে এমন কোন দোষ আছে, যাহা দূর করা উচিত।

এই তিনটী চিন্তা সর্ব্বদাই প্রকাশের মনে থাকিত এবং সকল সময়েই তিনি এই অমূল্য সত্যগুলি জীবনে পালন করিতে চেষ্টা করিতেন।

একদিন প্রকাশ পিতার সহিত রেলের গাড়ীতে যাইতেছিলেন, গাড়ীর ভিতরে তাঁহার পিতার সহিত আর কয়েকটী ভদ্রলোকের নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা, তর্ক বিতর্ক হইতেছিল, প্রকাশ কোন কথা না বলিয়া তাঁহাদের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহাদের কথা শেষ হইলে তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রকাশকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ওহে বাবু তুমি যে কিছু বল না!" প্রকাশ একটু হাসিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। প্রকাশের বাবা প্রকাশের এই নূতন ভাব দেখিয়া অবাক হইলেন। সেই ভদ্রলোকটী কিন্তু প্রকাশকে একটী নিরেট বোকা ঠাওরাইলেন।

আগুন যেমন কাপড়ে বাঁধিয়া রাখা যায় না, মানুষের সৎগুণগুলিও তেমনি প্রাণের মধ্যে ঢাকা থাকে না; উপযুক্ত সময়ে বাহির হইয়া পড়ে। প্রকাশের হঠাৎ পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহার মা একদিন বলিলেন, "এতদিন পরে কার কথায় তোর এমন হইল?" প্রকাশ বিনীতভাবে বলিলেন, "মা, এখনও আমার কিছু হয় নাই, আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার সকল দোষ দূর করিয়া আপনাদিগকে সুখী করিতে পারি। আর আমার মনে বিশ্বাস হইতেছে, মা! পরমেশ্বর আমার প্রাণের ভিতরে আছেন, তিনি যদি আমার প্রাণের ভিতরে না থাকিতেন তবে আমার প্রাণে ভাল হইবার জন্য এইরূপ ইচ্ছা কে জন্মাইয়া দিল?"

উভয় সঙ্কট।

ঘোষেদের কুলের বাগানে
কুলগুলি পেকে যে রয়েছে!
কি মধুর নারিকেলি কুল!
মনে হলে মুখে জল আসে

"চারি দিকে রয়েছে প্রাচীর
কেমনেতে ঢুকিব সেখানে।
দুরন্ত কুকুর নাকি আছে,
তাই বড় ভয় হয় মনেণ"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে
বিপিন যেতেছে গৃহপানে।
পাঠশালে যাহা শিখিয়াছে
কিছু কিন্তু নাই তার মনে।

অবশেষে বাগানের কাছে
এসে দেখে, কেহ নাই সেথা।
পড়েছিল "চুরি করা পাপ,"
লোভে আজ ভুলিল সে কথা।

তাড়াতাড়ি ঘরে ছুটে গিয়ে
বইগুলি কোথা ফেলে দিল;
আনন্দেতে হইয়া অধীর
থ'লে নিয়ে বাহিরে চলিল।

পিছু পিছু ডাকিছেন মাতা;
সে ডাক কি যায় তার কাণে?
কুলের কি সুমিষ্ট আস্বাদ
তাই সুধু জাগিতেছে মনে।

এসে দেখে পূর্ব্বের মতন
গাছতলা, কেহ কোথা নাই।
মনে মনে ভাবিল বিপিন,
"এবে আমি কাহারে ডরাই।"

আস্তে আস্তে উঠিল প্রাচীরে,
নিঃশব্দেতে নাবিল বাগানে;
দুর্ দুর বুক কাঁপে তার,
চারিদিকে চাহিছে সঘনে।

ধীরে ধীরে গাছেতে উঠিল;
ডালে বসি চারিদিকে চায়;
মুখে কুল; কিন্তু মনে ভাবে
"কেহ যেন দেখিতে না পায়?"

এইরূপে ভয়ে ভয়ে তার
শান্ত যবে হইল উদর।
থ'লে পূরে নাবে গাছ হ'তে
আনন্দেতে প্রফুল্ল অন্তর।

মনে ভাবে "দেখিল না কেহ,
আজি মোর 'সৌভাগ্যের দিন';
(হায় মূর্খ! জান না কি আছে
একজন জেগে নিশিদিন।)

এত ভাবি অবোধ বালক
গাছ হ'তে নাবিতে নাবিতে—
সর্ব্বনাশ!—বাগানের পাশে
কুকুর যে পাইল দেখিতে।

কুকুর দেখিয়ে তারে গাছে,
প্রাণপণে ডাকিতে লাগিল।
আস্তে আস্তে কোনরূপ করি
গাছ হতে বিপিন নাবিল।

প্রাচীরেতে উঠিয়া সত্বর
পিছুদিকে নাবিতে সে যায়;—
কুকুরের ডাক শুনি মালি
হেন কালে আইল তথায়।

পাছে তার ডাকিছে কুকুর,
থ'লে হতে কুল পরে যায়,
মালি এসে হাত ধরে তার;
বিপিন ঠেকিল মহাদায়।

জিহ্বার শুনিয়ে কুমন্ত্রণা,
পরদ্রব্য লইতে এমন,
তোমরা কি চাওগো পড়িতে
এইরূপ বিপদে কখন?

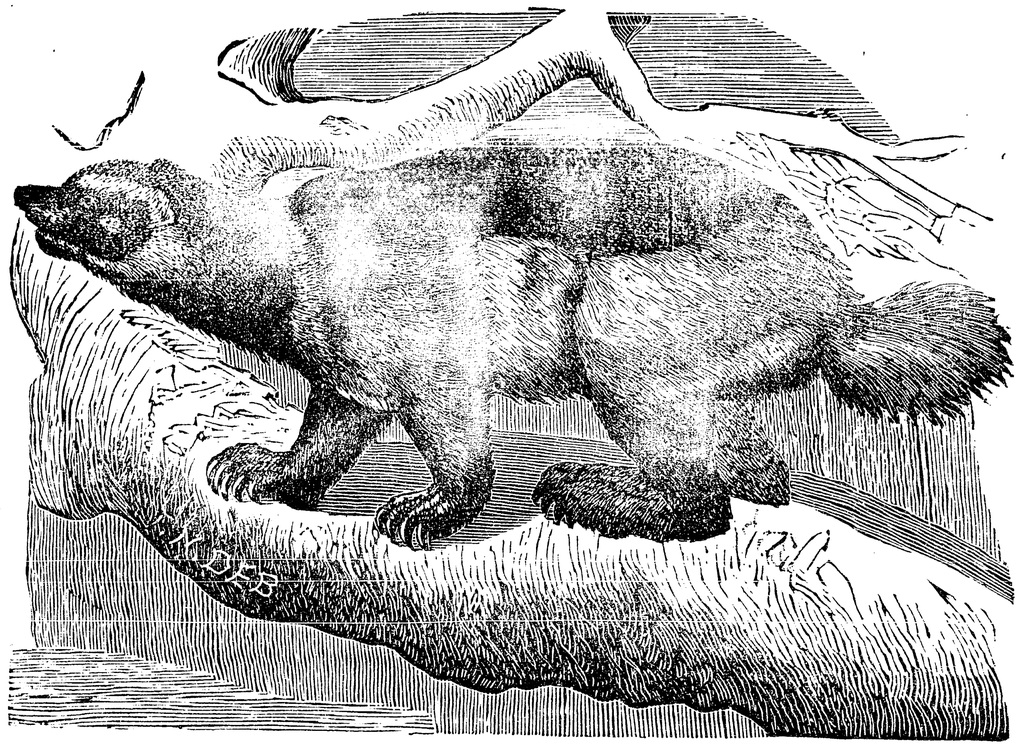

গ্লটন্।

উপরে যে জানোয়ারের ছবি দেখিতেছ তাহার বাড়ী আমাদের দেশে নয়। উত্তরের শীত-প্রধান দেশ সকলে ইহারা বাস করে; কাম্‌স্কট্‌কা উপদ্বীপে ইহারা খুব বেশী পরিমাণে থাকে। ঐ সকল শীতপ্রধান দেশে ভোদড় জাতীয় অনেক প্রকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু বাস করে; তাহারা নিশাচর বৃত্তি করিয়া জীবন ধারণ করে। তাহাদের জ্বালায় সেখানকার লোকেরা সর্ব্বদা বতিব্যস্ত থাকে। গৃহপালিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আহারীয় পশু-পক্ষীর প্রতি ইহাদের বড়ই অনুরাগ। এই কারণে ঐ সকল দেশের অধিবাসীদিগের সহিত ইহাদের শত্রুতা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। এর উপর আবার এই সকল পশুর চর্ম্ম অতিশয় মূল্যবান্। সুতরাং ইহাদিগকে বধ করিবার জন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বিত হয়। এরূপ অনেক লোক আছে যে, নানা প্রকার কৌশল করিয়া ঐ সকল জন্তু ধরাই তাহাদের ব্যবসায়। আমরা যে জন্তুর কথা কহিতেছি, সেও এই জাতীয়; কিন্তু তাহার স্বাভাবিক ধূর্ত্ততা এত বেশী যে, তাহাকে কেহই ধারতে পারে না।

গ্লটনের সম্বন্ধে পূর্ব্বকালে লোকের অনেক আশ্চর্য্য সংস্কার ছিল। তখনকার একটা পুস্তকে লেখা আছে যে, ঐ গ্লটন যদি কোন বড় জন্তুর মৃত শরীর দেখিতে পায় তবে অমনি উহাকে খাইতে আরম্ভ করে। খাইতে খাইতে যখন পেটটা ঢাকের মতন ফুলিয়া উঠে—আর তাহাতে জিনিস ধরে না—তখন গ্লটন খুব নিকট নিকট অবস্থিত দুইটী গাছের মধ্য দিয়া শরীরটাকে নিয়া যাইতে চেষ্টা করে। এইরূপ করাতে ভয়ানক চাপ পড়িয়া তাহার পেটের ভিতরের সব জিনিস বাহির হইয়া যায়। এইরূপে পেট খালি হইলে গ্লটন্ আবার আসিয়া খাইতে আরম্ভ করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আহার্য্য পদার্থ একেবারে ফুরাইয়া না যায়, ততক্ষণ এই উপায়ে ক্রমাগত ভক্ষণ এবং উদ্গীরণ চলিতে থাকে।

অনেকে বলিয়াছেন যে, গ্লটন্ কোন গাছে উঠিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে; নীচে কোন বড় জন্তু আসিলে অমনি তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে। এইরূপে হঠাৎ পড়াতে তেমন প্রকাণ্ড জানোয়ারটাও ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া যায় আর আত্মরক্ষা করিতে পারে না। গ্লটন্ এই অবস্থায় তাহাকে সহজেই মারিয়া ফেলিতে পারে। যাহা হউক আধুনিক অনেক পণ্ডিতের এই মত যে, গ্লটন্ গাছে উঠিতে তত পটু নহে; সুতরাং এই সকল গল্পকে গল্পের ভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে।

গ্লটন্ জানোয়ারটী আড়াই ফুটও লম্বা হইবে না, কিন্তু তাহার বুদ্ধি বড় বেশী। শিকারিরা অন্যান্য জন্তু ধরিবার জন্য যে ফাঁদ পাতে, গ্লটন্ অনায়াসে তাহার ভিতরের আধারটুকু খাইয়া যায়। ফাঁদে কোন ছোট জানোয়ার পড়িলে তাহাও উদরস্থ করে। গ্লটন্‌কে এপর্য্যন্ত খুব কম লোকেই ফাঁদ পাতিয়া ধরিতে পারিয়াছে। নিম্নে একজন শিকারীর লিখিত একটী গল্প অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

"একবার একটা বৃদ্ধ গ্লটন্ আমার মার্টেন্ (ভোদড় জাতীয় আর এক প্রকার ক্ষুদ্র জন্তু) ধরিবার ফাঁদ গুলির খোঁজ পাইল। আমি পোনের দিন পর একদিন ফাঁদগুলি দেখিতে যাইতাম, সে তার চাইতে ঘন ঘন আসিতে লাগিল। ইহাতে আমি বড়ই চটিয়া গিয়া মনে করিলাম যে, যেরূপেই হউক ইঁহার চৌর্য্যবৃত্তি বন্ধ করিতেই হইবে। এই ভাবিয়া আমি ভিন্ন ভিন্ন ছয় স্থানে ছয়টা মজবুত ফাঁদ প্রস্তুত করিলাম এবং তিনটা লোহার ফাঁদও সংগ্রহ করিলাম। তিন সপ্তাহ কাল চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। সে এই সকল ফাঁদের কাছেও গেল না, কিন্তু আমার মার্টেন ধরিবার ফাঁদগুলিকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহের সহিত ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল। যে সকল মার্টেন ফাঁদে পড়িত; সে গুলিকে এবং ফাঁদে যে সকল আধার দেওয়া হইত তাহাও খাইয়া ফেলিতে লাগিল। তখনকার দিনে বিষ খাওয়াইয়া মারার নিয়ম ছিল না, সুতরাং এর পর আমি বন্দুক পাতিয়া তাহাকে মারিতে চেষ্টা করিলাম। বন্দুকটীকে একটা ছোট পুকুরের ধারে একটা ঝোপের ভিতর রাখিয়া দিলাম, আধারটা এরূপভাবে রাখা হইল যে গ্লটন্ সেই পথে যাইবার সময় তাহা দেখিবেই। এর পর প্রথম যে দিন সেই স্থান দেখিতে গেলাম সে দিন দেখিলাম যে গ্লটন সেখানে আসিয়াছিল; কিন্তু আধারটাকে ছোঁয় নাই, কেবল শুঁকিয়াই চলিয়া গিয়াছে। ইহার পরের বারে আসিয়া প্রথমেই যে দড়ি দ্বারা বন্দুকের কলের সহিত আধারের সংযোগ ছিল সেই দড়িটীকে কাটিয়াছে, (কাটিয়াছে আবার বন্দুকের মুখের একটু পেছনে, যেন কাটিবার সময়ে হঠাৎ বন্দুক ছুটিয়া গেলেও গুলি গায় না লাগে) তার পর নিশ্চিন্ত মনে আধারটী লইয়া গিয়া পুকুরের ধারে বসিয়া খাইয়াছে। সেই

খানে গিয়া আমি দড়িগাছ পাইলাম। ইচ্ছাপূর্ব্বক এত বুদ্ধি খরচ করিয়াছে ইহা আমি কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না; কারণ ঐরূপ করিতে হইলে ঠিক মানুষের বুদ্ধির সমান বুদ্ধির আবশ্যক করে। সুতরাং আমি আবার কল পাতিয়া রাখিলাম। দড়িটী যেখানে ছিঁড়িয়াছিল সেইখানে বাঁধিয়া দিলাম। কিন্তু ক্রমাগত তিনবার অবিকল একই রকম ফল পাইলাম। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দড়িটী যে জায়গায় বাঁধিয়া দেওয়া গিয়াছে প্রত্যেকবার তাহার একটু পেছনে কাটিয়াছে,—কিজানি যদি ইহার মধ্যেও আমি তাহার বিনাশের জন্য কোনরূপ সন্ধান করিয়া রাখিয়া থাকি। এই সকল দেখিয়া আমি এই সিদ্ধান্ত করিলাম যে, এইরূপ বুদ্ধিমান্ জন্তুর বাঁচিয়া থাকাই উচিত।"

হঠাৎ মানুষের সহিত দেখা হইলে গ্লটন্ দুই পায়ের উপর বসিয়া এক হাতে চক্ষের উপর ছায়া দিয়া (আমরা অনেক দূরের জিনিস রৌদ্রের সময় দেখিতে হইলে যেমন করি) তাহাকে দেখে। এইরূপ করিয়া দুই তিন বার চাহিয়া দেখিয়া তার পর পলাইতে চেষ্টা করে।

বনলতা।

কালীকান্ত বাবুর পরিবারে সুখ নাই। প্রায় সাত আট বৎসর হইল তাঁহার একটী মাত্র ছেলে বিনয় কোথায় যে গিয়াছে কেহ জানে না; সেই অবধি কালীকান্ত বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী নিতান্ত মনোদুঃখে দিনপাত করিতেছেন। পরিবারের মধ্যে কালীকান্ত বাবু, তাঁহার স্ত্রী এবং একটি বার বৎসরের মেয়ে। বনলতা যখন ছোট ছিল তখন প্রায়ই মামার বাড়ীতে থাকিত, কারণ মার চেয়ে সে দিদিমাকে অধিক ভাল বাসিত। বনলতার যখন দুই বৎসর বয়স তখন সে একবার মামার বাড়ী যায়, এবং ক্রমাগত ৩।৪ বৎসর সেখানেই থাকে; এই ৩।৪ বৎসরের মধ্যে সে বিনয়কে একবারও দেখে নাই। তারপর যখন বাড়ী আসিল তখন বনলতা ৫।৬ বৎসরের হইয়াছে, বাড়ী আসিয়া আর সে বিনয়কে দেখিতে পায় নাই। বনলতা বাড়ী আসিলে কালীকান্ত বাবু ও তাঁহার স্ত্রী বনলতাকে কিছুই জানিতে দেন নাই। পাছে তাহার জীবন দুঃখময় হইয়া যায় এই আশঙ্কায় তাঁহারা আপনাদিগের মনোকষ্ট গোপন করিয়া রাখিতেন। তাহাকে কিছুই বুঝিতে দিতেন না।

পশ্চিমাঞ্চলে কোন স্থানে কালীকান্ত বাবু থাকিতেন। একটি ছোট পাহাড়ের উপর বাড়ীটী স্থাপিত, চারিদিকে সুন্দর বাগান, স্থানটি বড়ই সুন্দর। বনলতা বনে বনে বেড়াইতে বড়ই ভালবাসিত; কখনও ঝরণার কাছে, কখনও গাছের তলায়, কখনও লতাকুঞ্জে বসিয়া থাকিত। একদিন সকাল সকাল বনলতা বেড়াইতে বাহির হইল। অন্য অন্য দিন কেহ তাহার সঙ্গে যাইত, কিন্তু আজ সে একাকীই বাহির হইল। পাহাড়ের উপর একটি পথ অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে, বনলতা মনের আনন্দে ও উৎসাহে সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। ক্রমে বেলা অধিক হইল, সূর্য্যের প্রখর তাপে বনলতা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু তখনও তাহার বেড়াইবার সাধ কমে নাই; পথের ধারে একটি সুন্দর ঝোপের কাছে বসিয়া খানিক বিশ্রাম করিয়া আবার চলিতে লাগিল। কতদূর গিয়া একটি ছোট পথ দেখিতে পাইল, পথের দুপাশে বড় বড় গাছ রহিয়াছে, গাছে ফুল ফুটিয়াছে, ফল ধরিয়াছে, পাখী ডাকিতেছে; সেখানে কিছুমাত্র রৌদ্রের তেজ নাই। বনলতা তখন ভাবিল এই পথে যাই,—এ পথে রৌদ্রের তেজ নাই, চলিতেও বেশ সুবিধা হইবে, অধিক ক্লান্ত হইব না। এই ভাবিয়া সেই পথে চলিতে লাগিল। কতক দূর যাইয়া দেখিল পথটি ক্রমে ছোট হইতেছে এবং ক্রমে নিবীড় বনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে; তখন তাহার মনে একটু ভয় হইল, ভাবিল "এ পথ জানি না, ক্রমে গভীর বনের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম, যদি পথ হারাইয়া যাই, যদি আর ফিরিয়া যাইতে না পারি' তাহা হইলে

কি দশা হইবে?—যে পথে যাইতেছিলাম সেই পথে যাওয়াই ভাল ছিল। কিন্তু আবার ভাবিল যে এখন রৌদ্রের উত্তাপ অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, সে পথটি সহজ হইলেও সে পথে চলা বড় কষ্টকর, সে পথ অপেক্ষা এ পথ শতগুণে ভাল। কোথাও সুন্দর ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, কোথাও পাখী গান করিতেছে, কোথাও ঝরণার ঝর ঝর শব্দ হইতেছে, শীতল বাতাসে শরীর জুড়াইতেছে,—এই পথে যাই, না হয় আর খানিক যাইয়া ফিরিয়া আসিব।" বনলতা কখনও দাঁড়াইয়া পাখীর গান শোনে, কখনও অন্যমনস্ক হইয়া ঝরণার কাছে দাঁড়াইয়া থাকে, কোথাও পাহাড়ের উপরে একটি সুন্দর ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে,—তাহাই আনিতে পাহাড়ের উপর উঠে, কখনও নদীর স্রোতে কোথা হইতে ফুল ভাসিয়া আসিতেছে তাহাই দেখিবার জন্য নদীর তীর ধরিয়া চলিতে থাকে;—এইরূপে ক্রমে সে গভীর হইতে গভীরতর বনের মধ্যে আসিয়া পড়িল।

ক্রমে বেলা অবসান হইল, ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল দেখিয়া সে একটু চিন্তিত হইল। তখন বাড়ী ফিরিবার জন্য বড় ব্যগ্র হইল, কিন্তু গভীর বনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, ক্রমে অন্ধকার হইতেছে, এখন কোন পথে বাহির হইবে আর তাহা স্থির করিতে পারিল না, তখন সে অত্যন্ত ভীত হইল। ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হইতে লাগিল, আকাশ মেঘে ছাইয়া ফেলিল, ক্রমে ভয়ঙ্কর ঝড় উঠিল। অন্ধকারে বনের সিংস্র জন্তুগুলি বাহির হইল, তাহাদের গর্জ্জনে বনলতার প্রাণ কাঁপিতে লাগিল। তখন বিপদ বুঝিল; আগে না বুঝিয়া নির্ব্বোধের মত যে কাজ করিয়াছে তার জন্য আপনাকে কতই তিরস্কার করিল। বুঝিল নির্ব্বোধের মত কেবল সুখ সচ্ছন্দতা অন্বেষণ করিলে কেমন বিপদে পড়িতে হয়। তখন সেই অসহায়া বালিকা ব্যাকুল হইয়া জোড় হস্তে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগিল; ক্রমে যেন মনে একটু বল পাইল, যেন একটু সাহস হইল। তখন অতি কষ্টে একটু একটু চলিতে লাগিল। কতক দূর যাইয়া দূরে একটি আলো দেখিতে পাইল। তখন তাহার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইল, আশা ও আনন্দের উদয় হইল। আলোক লক্ষ্য করিয়া ক্রমাগত সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এবং দেখিল এক ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে। বনলতা কুটীরের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল, ভয়ে ভয়ে দ্বারে আঘাৎ করিতে লাগিল। তখন দ্বার খুলিয়া এক সন্ন্যাসী বাহির হইলেন। বাহিরে একাকী অসহায়া বালিকাকে দেখিয়া, তাহাকে কুটীর মধ্যে লইয়া গেলেন। সন্ন্যাসী বালিকাকে দেখিয়া যেন একটু চমকিত হইলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, এমন সময়ে এই হিংস্র জন্তু পূর্ণ নিবিড় বনের মধ্যে তুমি কেন আসিয়াছ? বালিকা তখন সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে বলিল। সন্ন্যাসী ধীর ভাবে সমস্ত শুনিলেন, তারপর বলিতে লাগিলেন "আজিকার ঘটনা তুমি কখনও ভুলিও না, ইহা হইতে তুমি যথেষ্ট উপদেশ পাইবে। আজিকার ঘটনার সহিত মানুষের জীবনের সুন্দর তুলনা করা যাইতে পারে। দেখ মানুষ যখন প্রথম সংসারে প্রবেশ করে, তখন তাহার হৃদয় আশা ও উৎসাহে পূর্ণ থাকে। সেই আশা ও উৎসাহ লইয়া সে সৎপথে চলিতে থাকে, তখন সৎপথে থাকিয়া যে সুখ পায়, তাহাতেই সে তৃপ্ত হয়। কিন্তু যখন সে সুখ তাহার আর যথেষ্ট মনে হয় না, তখন আরও সুখ স্বচ্ছন্দতা চায়, তখন সৎপথে থাকা তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়, সে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, সে আর চলিতে পারে না। সৎপথে চলিতে হইলে অনেক সময় সুখসচ্ছন্দতা ভোগের বাসনা পরিত্যাগ করিতে হয়;—কিন্তু তাহা সে পারে না; ক্রমে সৎপথ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। মানুষ যখন কেবলমাত্র সুখ স্বচ্ছন্দতা অন্বেষণ করে, এবং তাহাই পাইবার জন্য ব্যগ্র হয়, তখন হইতে তাহার সর্ব্বনাশ হইতে থাকে, ক্রমে সুখের আশায় সে নানাপ্রকার প্রলোভনে পড়িয়া অসৎপথ অবলম্বন করে। কিন্তু এপথে আপাততঃ সুখ থাকিলেও পরিণামে কেবল দুঃখ। সুতরাং অল্পদিন পরেই তাহার মন অসুখ ও অশান্তিতে পূর্ণ হইয়া যায়। তখন মানুষ বিপদ বুঝিতে পারে, সৎপথ পরিত্যাগ করিয়া অসৎপথে আসিয়া নিজের

যে সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহা তখন বুঝিতে পারে, তখন মনে চিন্তা উপস্থিত, তখন শত চেষ্টায়াও ফিরিবার পথ সহজ খুঁজিয়া পায় না। পথ হারাইয়া দিন দিন আরও কুকার্য্যে রত হয়, এবং তাহাদ্বারা আপনাকে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ক্রমে যখন জীবন ফুরাইয়া আসে,—যখন উৎসাহ উদ্যম আর থাকে না, যখন চক্ষু নিস্তেজ হইয়া যায়,—চারিদিক অন্ধকার বলিয়া বোধ হয়, যখন আর চলিবার শক্তি থাকে না,—তখন আর এ সামান্য সুখে মানুষকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে না। কিন্তু যাহাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে তাহারা এরূপ বিপদে পতিত হইয়াও নিরাশ হয় না। লক্ষ লক্ষ বিপদের মধ্যেও যে পরমেশ্বরকে স্মরণ করে,—যে তাঁহার উপর নির্ভর করে—সে নিশ্চয়ই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হয়; বিপথ হইতে পুনরায় সৎপথে আসিতে পারে। একথা কখনও ভুলিও না।"বুদ্ধিমতী বালিকা একাগ্র হইয়া সমস্ত শুনিল, উপদেশ হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিল। তখন সন্ন্যাসী বলিলেন—"আজ এই খানেই থাক, কাল তোমাকে গৃহে রাখিয়া আসিব।"

পরদিন পাড়ার লোকে দেখিল কালীকান্ত বাবুর বাড়ী মহা উৎসব হইতেছে। তাঁহাদের মুখে দুঃখের কালিমা আর নাই, আজ তাঁহারা আনন্দে ভাসিতেছেন। পাঠক পাঠিকা এত আনন্দ উৎসব কেন?—আজ এতদিন পরে কালীকান্ত বাবু নিরুদ্দেশ পুত্রকে পাইয়াছেন; তাই এত উৎসব। সেই সন্ন্যাসীই বিনয়কান্ত।

প্রতিবেশীরা কালীকান্ত বাবুর সুখে সুখী হইল। পিতামাতা পুত্র কন্যা পাইয়া সুখী হইলেন। বনলতা বিনয়কে পাইয়া সুখী হইল। ভাই বোনে একত্র হইয়া নানা সৎকাজে জীবন উৎসর্গ করিল।

পাঠক পাঠিকা! তোমরাও কি বিনয় ও বনলতার ন্যায় ভাই বোনে মিলিয়া সৎকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবে?

বর্ষশেষ।

দিন আসে দিন চলে যায়,
বর্ষ পিছে বরষ মিলায়।

তিলে তিলে পলে পলে দণ্ড চলি গেল,
দণ্ডে দণ্ডে প্রহর চলে যায়,
প্রহরে প্রহরে ওই দিন চলে গেল,
দিনে দিনে মাস গেল হায়!
মাসে মাসে ওই কত বর্ষ চলে গেল,
বরষে বরষে যুগ যায়,
একে একে ধীরে ধীরে সকলই মিশাল,
কালের সে আঁধার বেলায়।
কত গ্রীষ্ম কত বর্ষা কত চলি গেল
এল শীত বসন্ত ধরায়,
কত রবি, কত শশী, আকাশে উদিল;
কত এল যে গেল কোথায়!
—একজনও ফিরিল না হায়!—
ফিরিয়া চাহিয়া দেখি অতীতের পানে,
পুনঃ এক বর্ষ চলে গেল,
আশায় চাহিয়া কত কিবা যে করি মনে,
কিছু হায় কিছুই না হল।
কত যে ফিরাব করি মনে,
কিছুইত ফিরিল না হায়,
গেল যাহা হেলায় খেলায়
আর নাহি এল পুনরায়!

দিন এল দিন চলে গেল
বর্ষপিছে বরষ মিশাল।